ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com
প্রথম বর্ষ ◻ একাদশ সংখ্যা ◻ মার্চ ২০১৩ ◻ ৩০ টাকা

Subscribe Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

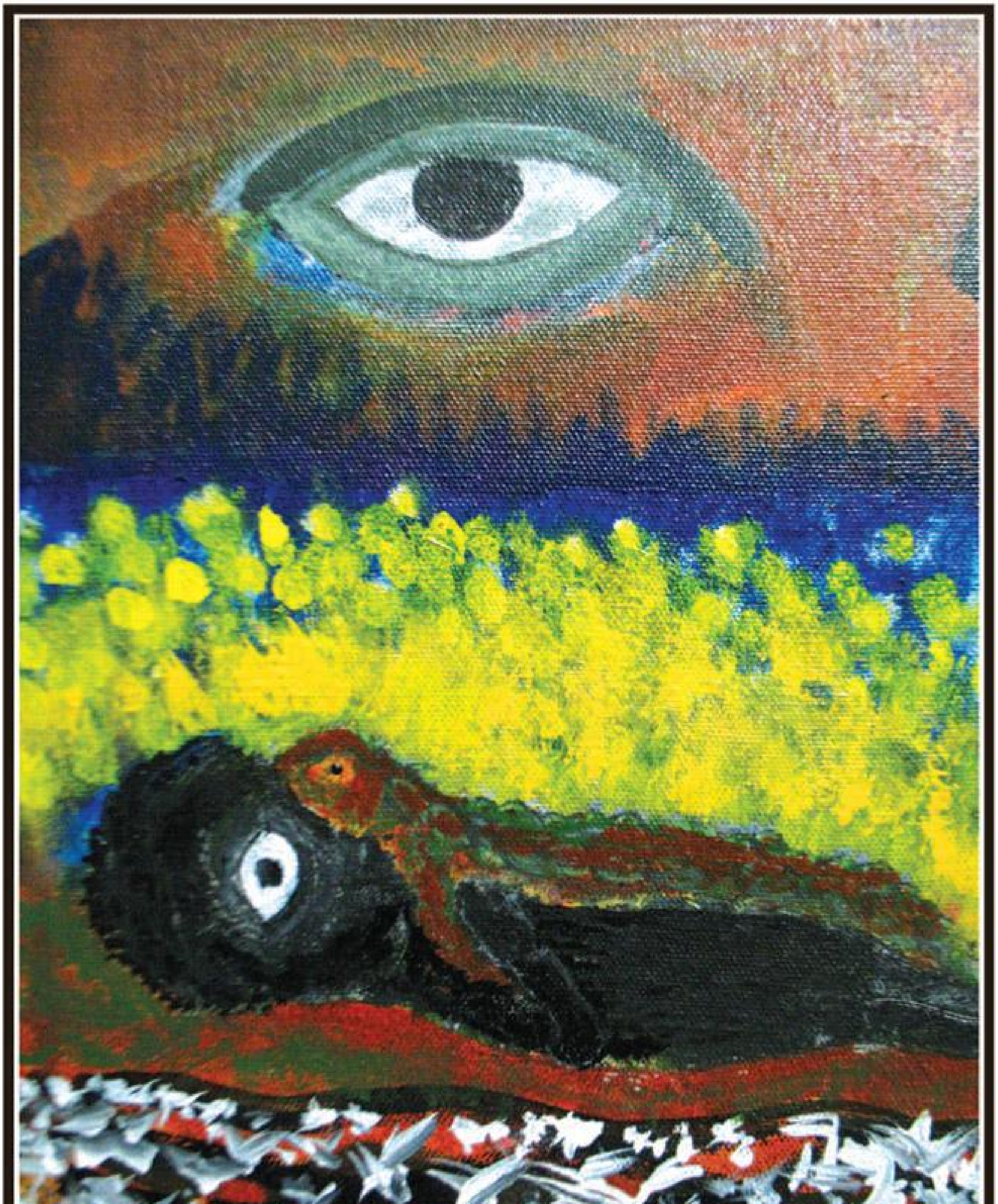

ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক। ১৮"×২৪" (একাংশ)। শিল্পী: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

ছেলেবেলা

- ✓ বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের ‘ছেলেবেলা’ উপহার দিতে পারেন।
- ✓ একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ ‘ছেলেবেলা’ পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- ✓ চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- ✓ **অনলাইনও গ্রাহক হতে পারেন। লগ অন করুন: www.swarnakshar.in**
- ✓ যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Subscribe online: www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ ফ্যাক্স: ২২৮৭ ৬৪৪৮ ই-মেল: chhelebela@swarnakshar.in

প্রতি মাসের
ছেলেবেলা
পত্রিকাস্টলে বা
সংবাদপত্র-বিক্রেতার
কাছেও পাওয়া যাবে।

www.ekashtipathar.com

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতায়ও সর্বত্র পাবেন

পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে
আগে থেকেই বলে রাখুন।

প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

এক বছরের গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.

29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

বহু ছেলেমেয়ে 'কর্মক্ষেত্র' পড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্তত চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ের
কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।
যারা 'কর্মক্ষেত্র'-র সহায়তায়
কাজ পেয়েছিল। ওদেরকে আমিই
'কর্মক্ষেত্র'-র গ্রাহক করে দিয়েছিলাম।
'কর্মক্ষেত্র' প্রথম থেকেই ছোটখাটো
ব্যবসার এক আশ্চর্য নির্দেশিকা দিয়ে
আসছেন, যা অনুসরণ করলে যুবাপ্রজন্ম
বাঁচবার ও বাঁচাবার পথের সন্ধান পাবে।
টুথপেস্ট বানাবেন, না হাওয়াই চপ্পলের
ফিতে? মেশিনে পোট্যাটো চিপস বানিয়ে
বেচবেন, না ভিনিগার তৈরি করবেন?
'কর্মক্ষেত্র' এত বছরে, এরকম অন্তত
এক হাজার অল্প পুঁজির ব্যবসার হদিশ
দিয়েছে। ওই সব ব্যবসায় নেমে
কয়েক হাজার মানুষই স্বাবলম্বী হয়েছেন।
মৃত্যু যখন দরজায় ঘা দিচ্ছে, তেমন
সময়ে যে ঔষধ বাঁচাতে পারে, তাকে
আমাদের মুনিঋষিরা নাম দিয়েছেন
বিশল্যকরণী। আমি তো 'কর্মক্ষেত্র'কে
বলব বিশল্যকরণী।
'কর্মক্ষেত্র' যেভাবে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা
করার পরিকল্পনা জোগায়, তাতে তো
সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন
নতুন জীবনের রসদ পায়।
'কর্মক্ষেত্র' বলছে, পরিশ্রম করো
সততার সঙ্গে, শ্রমকে ভয় পেও না,
স্বীয় কর্মগুণে ভাগ্যকে জয় করো।
আজ দেশের তরুণ প্রজন্মকে এই কথা
বলার মহান দায়িত্ব 'কর্মক্ষেত্র' গ্রহণ করেছেন,
আমি অন্তর থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি।

মহাশ্বেতা দেবী

৩ জুলাই, ২০০৫

মহাশ্বেতা দেবী: *জ্ঞানপীঠ, ম্যাগসেসে, আকাদেমি প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিতা লেখিকা।*

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

প্রথম বর্ষ। একাদশ সংখ্যা। মার্চ ২০১৩। চৈত্র ১৪১৯

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৫

ক্ষণের বচন ৮। শব্দবক্র ৮

চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডী লাহিড়ী। জয় বাবা রেডিও ৭

পু র নো অ্যা ল বা ম

কালান্তর। সম্পাদকীয়। প্রতাপকুমার রায় ৬১

হেঁয়ালির ছন্দ। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯

দেবেশ রায়ের দাওয়াত ৩০

এবারের অতিথি গল্পকার

শাহীন আখতার

ভিউপয়েন্ট ৩০ ছয় বছর আগে ৩২

লেমিংয়ের অন্তর্জলি যাত্রা ৩৫

ধা রা বা হি ক

একাত্তরের দিনগুলি। জাহানারা ইমাম ১৪

আমার ছবিজীবন। শুভাপ্রসন্ন ২৪

বিষাদগাথা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৬৭

মহাজনসঙ্গ। অমিতাভ চৌধুরি

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১০ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ ১২

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ। সবিতেন্দ্রনাথ রায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে ৬২

ক বি তা র পা তা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের স্বনির্বাচিত ৮টি কবিতা ৫৩

কবিতা-পরিচয়

আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৫৭

অশ্রুকুমার সিকদার ● অমিতাভ দাশগুপ্ত

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা, কবির উত্তর ● সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৬০

ভ্র ম ণ ক থা

সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ অথবা বল্গাহরিণের খোঁজে। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৩৮

ল ঘু ভা ষ - গু রু ভা ব

মৃত্যু: জীবনের প্রথম পাঠ। পবিত্র সরকার ৪৫

বুড়োক্রেজি। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। মিসপ্লেস্‌ড ৭৬

সাময়িকপত্রে সেকালের লেখা। বারিদবরণ ঘোষ। নাচঘর ৭৪

অভিন্ন বাংলা ভাষার এপার-ওপার। প্রণব চৌধুরী ৭৮

কেন লিখি: জ্বলদর্চি সংকলন ৮৭

কমল চক্রবর্তী ● দেবারতি মিত্র ● বিপ্লব মাজী ● কৃষ্ণা বসু

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুচিত্রা ভট্টাচার্য ● লীনা চাকী ● সৈয়দ কওসর জামাল

নলিনী বেরা ● প্রচেত গুপ্ত ● রবিশঙ্কর বল

নি য় মি ত

কয়েকটি চিঠি ৮০। বই ঠেক ৮২

প্রচ্ছদ: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক। ২৪"×১৮" (একাংশ)। **শিল্পী:** অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮

ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৮৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in

Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

Editor Amarendra Chakravorty.

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে
বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক
বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক
বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

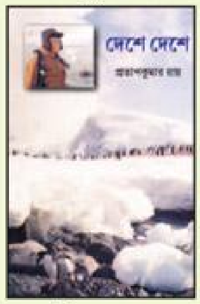

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

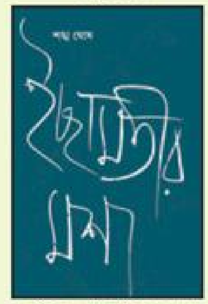

কবির দেখা কবির লেখা
একগুচ্ছ অসাধারণ
ভ্রমণকথার সংকলন।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

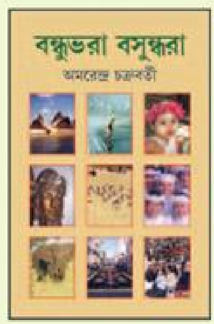

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর
আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

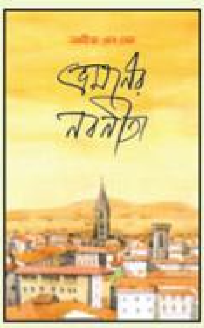

নানা মহাদেশের মাটির
জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

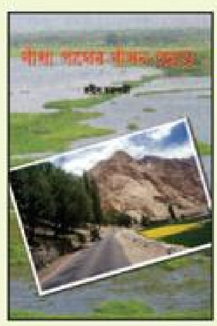

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ
ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই
পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি
দরকারি তথ্য।
₹৬০

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

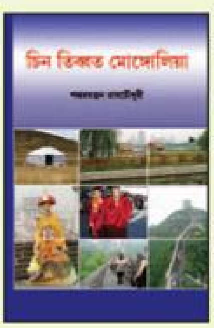

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া—
ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র
প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে
বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগঅন করুন

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

কালের কষ্টিপাথর

চৈত্র ১৪১৯ □ মার্চ ২০১৩

উৎসর্গ

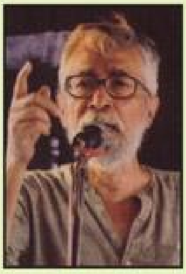

কথাসাহিত্য যাঁর হাতে লড়াইয়ের প্রস্তরকুঠার বা শল্যচিকিৎসকের ছুরিকাঁচি, কবিতার শব্দ যাঁর কলমে হৃদয়ে ফোটানোর ছুঁচ, সেই শুদ্ধ গেরিলা সাহিত্যশিল্পী নবারুণ ভট্টাচার্যকে এই সংখ্যার 'কালের কষ্টিপাথর' উৎসর্গ করে আমরা ধন্য।

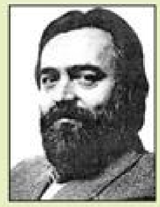

আমি শিশুদের জন্য লিখি না। আমার মধ্যে যে শিশু আছে আমি লিখি তার জন্য। আমার কবিতায় তাকে আমি খেলতে দিই। একজন শিশুর খেলায় যারা আনন্দে উদ্বেল হয় আমি তাদের জন্যও লিখি।

কবির কথা, তৃণ ও তারাদের উদ্দেশে সহর্ষ করতালি।
স্তোভিনিমির বালগ, ক্রোয়েশিয়া

স ম্পা দ কী য়

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তখনকার এক তরুণ কবি, পরে যিনি স্বনামধন্য বিশ্বতোমুখ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত হয়ে উঠবেন, আরেক তরুণ কবি-ঔপন্যাসিক, সাহিত্যে তখনও তিনি বিপুলভাবে আত্মপ্রকাশিত নন, সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আপনার কাছে একটি গল্প চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে পারব। এবং সেই মর্মে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু যা দেখছি তাতে মনে হয় সে রকম সাহিত্যপত্রে বাংলাদেশের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।'

এমন কত তরুণ হেরে গিয়ে বা হতাশ হয়ে শেষ অব্দি তার স্বপ্ন ত্যাগ করেছেন, অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যপত্রিকার ইতিহাসেও তার ইঙ্গিত মেলে। অঙ্কুরেই নষ্ট বা পরাজিত বা এমনকি অজাত সেইসব স্বপ্নের আঁকিবুকি কেউ যদি খুঁজে আনেন বা তাদের জীবাশ্ম সন্ধানে যান সেখানেও হয়তো বাঙালির মন ও মননের ডানা ঝাপটানো দেখা যাবে।

ছোট ছোট এইসব স্বপ্নভঙ্গের একটা বড় কারণ সাহিত্যের বাজার। তার চাহিদা-জোগানের নিয়মের রাজত্ব। বিশেষ করে বিনোদনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপরীতে গিয়ে গণরুচিকে যা প্রশ্ন করে, প্রভাবিত করতে চায়, তাকে টিকিয়ে রাখার মতো জনবল ধনবল এবং হয়তো-বা রুচিবল আমাদের সমাজে খুবই দুর্লভ। 'কালের কষ্টিপাথর'-এ এবারের 'পুরনো অ্যালবাম'-এ অর্ধশতকেরও আগের একটি সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদকের সকরুণ খেদ আজও তাই কিছুমাত্র পুরনো মনে হয় না। এ যেমন সত্যি, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় তা নিয়ে তেমনই আক্ষেপ করারও হয়তো কোনও সার্থকতা আর নেই। বিশেষ করে এখন যখন অনেক ছোট কাগজ সাহিত্য নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে। ছোট ছোট কাগজে অনেক নতুন কবি তাদের নতুন ভাষা নিয়ে জেগে উঠছেন।

আবার এত বড় একটা ক্ষোভের বিষয় সম্পূর্ণ সরিয়ে রেখে নতুন সাহিত্যপত্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনাও খুব বেশি এগোয় না।

প্রতি সংখ্যায় সম্পাদকের পাতা ভরানোও এক কঠিন কাজ। প্রতি মাসেই এই লেখা লেখবার সময় আমার কেবলই মনে পড়ে যায় এজরা পাউন্ডের A B C Of Reading বইয়ে সাহিত্যের মাস্টারমশাইয়ের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বলা সেই কথাটা যে, অনেকদিন ধরে চিন্তা ভাবনা করলে সাহিত্য নিয়ে হয়তো দুটো-একটা কথা বলা যায়, কিন্তু সাহিত্যের শিক্ষকদের ট্র্যাজেডি— ক্লাসে রোজই লম্বা সময় তাঁদের কথা বলে যেতে হয়।

হুবহু উদ্ধৃতি নয়, স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে আসা কথার টুকরো।

এতদিন পরে, ক্ষীণভাবে হলেও, মনে আছে হয়তো এইজন্যও যে মাসে মাসে এই পাতাটা লিখতে গিয়ে সম্পাদকের একই দুর্দশা ঘটে।

একটাই সান্ত্বনা। বাজারের জলহস্তি-হা হেলায় উপেক্ষা করে 'কালের কষ্টিপাথর' জন্মের প্রথম বর্ষটি প্রায় পূর্ণ করতে চলেছে। বাংলাভাষায় এখন আর 'বঙ্গদর্শন' বা 'বিচিত্রা' নেই, সেইসব যুগই আর নেই, এই অবস্থায় আরও বেশি সংখ্যক বাঙালিকে সাহিত্যমুখী করতে ছোট কাগজের চেয়ে বড়, বাজারনিয়ন্ত্রিত বড় কাগজের চেয়ে ছোট এই সাহিত্যপত্রিকা কতটা নিজের মতো করে বাড়তে পারে সেটাই এখন দেখবার।

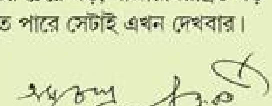

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই, বেড়াবার বই, কাজের বই

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক

বিমল মুখার্জির

দুচাকায় দুনিয়া

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের

ভ্রমণবই

ভ্রমণের নবনীতা

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।

দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৯০

শঙ্খ ঘোষের

ইছামতীর মশা

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।

দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১৫০

প্রতাপকুমার রায়ের

দেশে দেশে

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

বন্ধুভরা বসুন্ধরা

অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। মজবুত বোর্ড বাঁধাই। **দ্বিতীয় সংস্করণ** ₹১২০

প্রতাপকুমার রায় ও হরপ্রসাদ মিত্রের

বহু দেশ ঘুরে

বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে দশ দিকের দশটি লেখা ₹৬০

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

রবীন চক্রবর্তীর

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য ₹৬০

ভ্রমণ ট্রেকিং

যাঁরা ট্রেকিং করবেন, এ বই তাঁদের পথ দেখাবে আর ট্রেকিং যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, বইটি তাঁদেরও পৌঁছে দেবে প্রকৃতির অমৃতলোকে। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹১০০

নেকড়ের চোখ

বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়। মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন:

মৈত্রেয়ী নাগ ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। ₹৩৫০

দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

কাজের বই

কোন মেশিনে কী ব্যবসা

শুধু মেশিন চিনে, মেশিন কিনে ব্যবসা করুন। কোন মেশিনে কী ব্যবসা, কীভাবে কী করবেন, কোন মেশিন কোথায় পাবেন, কত দাম ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৪০

বাংলা সমাস

শিশিরকুমার আচার্য

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অপরিহার্য। ₹৬০

বাংলা প্রত্যয়

প্রকরণ ও পদ্ধতি

শিশিরকুমার আচার্য

সদ্য বেরিয়েছে ₹৯০

অনলাইনে পেতে

www.swarnakshar.in

লগ অন করুন

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই **তুতুল** ₹২৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের **বকবকম**

পাতায় পাতায় মজার ছবি ₹১৫

কানাইলাল চক্রবর্তীর

খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹২০

চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫

কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০

পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায়-ছবিতে

আমার ছেলেবেলা ₹১৮

পবিত্র সরকারের

কথামালা : ছড়ায় ঢালা ₹১৫

মৈত্রেয়ী নাগের

বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০

আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

ছো ট দে র ব ই

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৭৫

শাদা ঘোড়া

দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।

পঞ্চম মুদ্রণ ₹৩০

আমাজনের জঙ্গলে

ষষ্ঠ মুদ্রণ ₹৫০

হীরু ডাকাত

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

নবম মুদ্রণ ₹৪৫

গৌর যাযাবর

বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹৪০

টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত। ₹১৫

ঋষিকুমার ₹২০

পাখির খাতা ₹৪০

আমার বনবাস ₹১২

তালগাছের ডোঙা ₹২০

হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫

ভূতের বাঁশি ₹৪০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই

মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা

বোর্ড বাঁধাই ₹৫০

নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে

বোর্ড বাঁধাই ₹৩০

নিমফুলের মধু

গল্পসংকলন ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

কবিতা-পরিচয়

২১ জন কবির ৪০টি বিখ্যাত কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ₹১৫০

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED

29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448

E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

জয় বাবা রেডিও

লেখা ও ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী

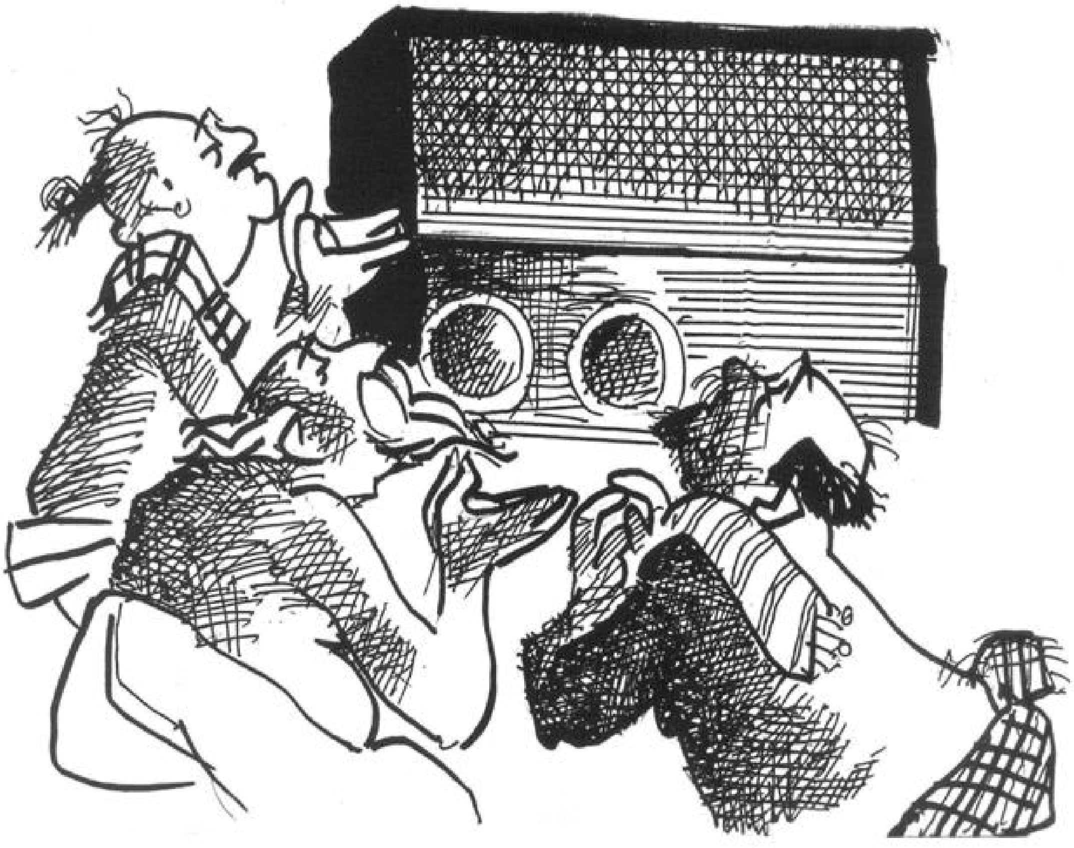

সে এক মজার গল্প। আমি তখন ক্লাস টু বা থ্রি-র ছাত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বয়স দুই বা তিন। ব্রিটিশ সরকার ঠিক করলেন, যুদ্ধের প্রচার যাতে গ্রামের লোকেরা ঠিকমতো শুনতে পায় সেজন্য বাছাই করা কিছু গ্রামে রেডিও বসানো হবে। আমাদের স্কুলে অরুণ সিংহ ছিলেন এম এসসি— তিনিই রেডিও বাজাবেন। সে সময় সারাদিন রেডিও চলত না। বড়জোর দু-তিন ঘণ্টা। গ্রামে রেডিও আসছে। কিছু লোক ভাবলেন, লক্ষণ ভালো নয়। কোনও অশরীরী ভূত হয়তো কথা বলবে। যে গাঁয়ে ভূত ছিল না, যন্ত্র দিয়ে সেই গ্রামে ভূত আনা হল। অরুণস্যার নিজে এম এসসি। গ্রামের লোকদের অনেক বোঝালেন তিনি। কেউ তাঁর কথায় কান দিল না। অগত্যা নারায়ণ শিলা এনে মন্ত্র পড়ে, রেডিওর ঘরটা পবিত্র করার চেষ্টা করা হল। দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন-সহ গঙ্গার জল দিয়ে সারা স্কুলবাড়িটা শুদ্ধ করা হল। এই স্কুলবাড়ির একটা ঘরে (তার নাম ছিল সায়েন্স হল) রেডিও বসল। রেডিওর সাইজ ছিল অতিকায়। হরলিক্সের ঢাকনির চেয়েও বড় ছিল তার নব। ভেতরে বড় বড় দুটি ব্যাটারি। প্রথমে গাঁক গাঁক শব্দ করে যে আওয়াজ বের হল, সেটাকে ভূতের ডাক ভেবে শ্রোতার দল পালাল। পরে কলকাতা থেকে মিস্ত্রি আনিয়ে সেই রেডিও ঠিকমতো সেট করা হল। ব্যাটারির পাশে ভাল্বের লাল টকটকে আলো জ্বললে রেডিও চালু হল বুঝতে হবে। লাল আলো মানে ভূতের চোখ! ঘর খালি হয়ে গেল ভয়ে।

ক্ষনেরবচন

৫৭

নিজের গুণের কথা শুনে অন্যমুখে
গুণী তবু লজ্জা পায় সবার সম্মুখে

৫৮

ক্ষমতার চেয়ে ক্ষমা অধিক ক্ষমতা
সদম্ভ উচ্চতা নয়, মধুর মমতা

৫৯

দুষ্টজনে নিন্দা করা নিন্দনীয় নয়
দম্ভ তাতে মিশে গেলে বিষময় হয়।

৬০

গ্রিসের প্রাচীন নাম ছিল হেলাদোস
প্রাচীনের স্পর্শমাত্র করো যদি ফোঁস
জানবে তোমার এই যুগও একরোখা
অন্ধ মনের ক্রুদ্ধ ষাঁড় যায় রোখা?

৬১

আমি সেরা, সর্বগুণী—
যে করে সে-দাবি
গুণী সে কক্ষনো নয়,
বকে হাবিজাবি

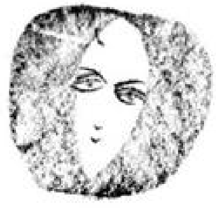

ক্ষণকথক ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শব্দবক্র

৬০। নেতাদুরস্ত

বিশেষণ; সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি বা সাদা শাড়ি, কাঁধে গামছা, পায়ে চপ্পল ইত্যাদি সহযোগে জনপ্রতিনিধিরা যে-সাজে সেজে জনতার কাছে যাওয়া সমীচীন মনে করেন > আমি তোকে লিখে দিতে পারি হাতকাটা পল্টু সামনের ভোটে দাঁড়াবে। ছেঁড়া জিনস, সানগ্লাস এইসব কেতাদুরস্ত সাজগোজ ছেড়ে কেমন নেতাদুরস্ত সাজখানা দিয়েছে দেখেছিস!

৬১। উন্মেশিন

বিশেষ্য; ই-মেল, স্কাইপ, এস এম এস-এর সুবিধাদি অনুধাবনপূর্বক প্রযুক্তিবিমুখ প্রাচীনমনস্ক ব্যক্তিরা মেশিন ব্যবহারে আচমকা যে সাবলীলতা প্রকাশ করেন > 'বৈকুণ্ঠবাবুর গিন্নির এমন অমোঘ উন্মেশিন নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না। যে মানুষ সামান্য ফোন ধরতে ভয় পেত, এখন দিব্যি কম্পিউটার চালিয়ে তিন মহাদেশে চাকরিরত তিন ছেলেমেয়ের সঙ্গে দিনরাত বাতচিৎ চালাচ্ছে!'

৬২। রোশনিসংকেত

বিশেষ্য; জামাকাপড়, চশমা, ঘড়ি প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের বাণিজ্যিক নির্মাতাদের নাম ছলেবলে জাহির করে চারপাশের লোকেদের যে বিশেষ সংকেত দেওয়া হয় > —'মাত্র পনেরো মিনিট দেখে বাতিল করে দিলেন ছেলেটিকে? সেরকম কোনও প্রশ্নই তো করা হল না!'

—'দেখো, ইন্টারভিউয়ের দিন দামি ঘড়ি জুতো সবাই পরে, তা'বলে ঘাড় নামিয়ে কলার উল্টে জামার ব্র্যান্ড দেখাবে আর এত বড় রোশনিসংকেত পেয়েও আমি চুপ করে থাকব? আমার আপিসে এসব লোকের জায়গা হবে না।'

৬৩। জমালেযামিনী

বিশেষণ; সারা রাত জমানো আসর বা আড্ডার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য > 'প্যানপ্যানে সিরিয়াল তো অনেক হল, এবারে একটা ভালো দেখে আস্ত গল্প বেছে একখানা জমালেযামিনী অনুষ্ঠান বানাও দেখি!'

৬৪। গদিমাতৃক

বিশেষণ; যে রাজনৈতিক আদর্শবাদের লক্ষ্য, উপলক্ষ সবকিছুই যতদিন সম্ভব গদি দখল করে বসে থাকার হিসেবনিকেশেই সীমিত থাকে। > —'এতবড় একটা দেশ, তার এত সম্পদ, এত আয়— তবু আমাদের দৈন্যদশা যেন কিছুতেই ঘোচে না।'

—'জগতের নিয়মই এই: নদীমাতৃক দেশে বিকাশ হয় সভ্যতার, আর গদিমাতৃক দেশে অসভ্যতার।'

শব্দবক্রমুণি

হেঁয়ালির ছন্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকস্মৃতি, যা নিয়ে ফোকলোর-বিদ্যা, তার বিপুল উপকরণের একটা বড় ভাগ ছড়া-প্রবাদ-হেঁয়ালির ভাগ। হেঁয়ালি— সেও বহুলতই হেঁয়ালি ছড়া। একটু ভাষার বেঁক আর একটু ছন্দের দোলা দুয়ে জোড়া হয়ে সে হয়েছে স্মরণযোগ্য, উপভোগ্য।

বিদেশেও হেঁয়ালির খেলা দেখতে পাই পার্লার গেমের মধ্যে। কিন্তু দেশ-বিদেশের ধাঁধা-হেঁয়ালির যত সঞ্চয় আজ স্তূপিত হয়ে উঠেছে তার প্রায়টাই পুরনো লোকস্মৃতি। লোকমুখের সেসব হেঁয়ালি-কথার ওপরে সংগ্রাহকের ভাষার ছন্দের দাগরাজি চড়েছে কোথাও, অন্তঃকরণ তাতে হয়তো বদলায়নি।

।।১।।
এইটুকু এক ছাউনিপাতায়
এতখানি ঘর বেশ ছাওয়া যায়।

।।২।।
মামাদের গোরু একটাই।
সেও দিব্বি গোরুটা দেখতাই।
সকালে উঠে সে গোরু নেই— শেষ
দেখে গেছি রাত একটায়।

।।৩।।
আবোলা জন্তু বেঁধে রেখে আসা রান্নাঘরের
দাওয়ায়।
ধুম গর্জন ধুম গর্জন— যতবার দানা
খাওয়াও!

।।৪।।
বুড়ি ঠাক্‌মা মরল প'ড়ে—
আছাড় খেয়ে, মুখ হাঁ ক'রে।

।।৫।।
এই আমাদের মা ঠাকরুন,
ছোটোখাটো, তবু রাঁধে দারুণ!

।।৬।।
নিশার অগ্রে, দিনের অন্তে
তা বলে সাঁঝে সে নয় কোনোমতে।

।।৭।।
ঢ্যাঙা পায়ে তাড়া করলে গো গোটা দল
তাড়াতাড়ি চল্‌, ঘরে উঠি যাই, চল্‌।

।।৮।।
সর্‌ষে গড়ান, সর্‌ষে গড়ান,
শুকোত দেয়া সর্‌ষে দানা।
রোদ নেই, সে শুকোয় কিসে!
তাও সে থাকুক, তুলতে মানা।

।।৯।।
যুদ্ধে গেলেন ইফা রাজা,
পাঁচজনা বীর গেল সাথে।
রাজা? রাজা? রাজা নেইকো,
ফিরছে কেবল পাঁচজনাতে।

।।১০।।
নদীতে ডুব দিল গিয়ে, আর ওঠে না।
ডুব্‌রি নাবাই, জাল ফেলি, সে আর ওঠে না।
গেল কোথায়? লোক খুঁজে যায়। আর ওঠে না।

।।১১।।
সরু লম্বাই কফিন বাক্‌শো, ছোটে
হাঁসফাঁস—
শব বয়ে ছোটে শও-পঞ্চাশ।

।।১২।।
ভাইয়ের সঙ্গে ভাজো, রাঁধো এক সাথে,
উলটিয়ে দাও বাপের মধ্যেটাতে,
ঢেলে মেখে নাও ছেলেটাকে স্বাদ করে,
খাওয়াশেষে পীয়ো বাপকে কণ্ঠা ভ'রে।

তালমুদ।

।।১৩।।
মুরগার ডিম ছুঁড়ে মারলুম ইরোকো গাছের
'পরে—
গাছ চৌচালা, ডিম ঝক্‌মক্‌ করে।

।।১৪।।
জ্যান্তে অনড় হয়ে থাকে স্থির,
কুঠারে ছিন্ন করে দাও শির,
পা কাটো, গা কাটো, করো খানখান—
জুড়তেই দেখি চলেছে সটান।

শিবার রানির ধাঁধা, বাইবেল।

।।১৫।।
শ্বেতাঙ্গ বাপ, আমি কালো ছেলে তাঁর।
ডানা নেই, তবু ঝোঁক খালি ওড়বার।
আমায় দেখতে এল যারা, জল
বইছে দু চোখ দিয়ে।
জন্মমাত্রে হাওয়াতে গেছি মিলিয়ে...

গ্রিক পুরাণ।

।।১৬।।
আগুন লেগেছে সমুদ্দুরে।
নদী ছাই হল আগুন পুড়ে।
কবীর দেখছে জেগে উঠে: গাছে
চড়ে আছে মাছ ভর-দুপুরে।

কবীর।

।।১৭।।
একটি থালা— মুক্তো ভরা,
মাথার ওপর উলটে ধরা,
সবার মাথায় মাথায় ঘোরে—
একটি মোতি যায় না ঝ'রে।

আমীর খুসরু।

উত্তর:
(১) প্রদীপ। *বাংলা।* (২) চাঁদ। *ওড়িয়া।* (৩) উনুন।... (৪) মৌমাছি। *খাতালা।* (৫) 'ন'। *পুরোনো ভারতীয়।* (৬) বৃষ্টি। *আফ্রিকি।* (৭) তারা। *পারসি।* (৮) পাঁচ আঙুলে তুলে খাবার খাওয়া। *য়োরুবা।* (৯) খোসা ছাড়ানো কলা। *খাতালা।* (১০) নুন। *য়োরুবা।* (১১) রাস্তা। *য়োরুবা।* (১২) নুন আর জলের যোগে মাছ ভাজো, রাঁধো, তিনটিই উঠেছে সমুদ্র থেকে, জলে উল্টে দাও, মাছের পিতারই মতো সে জল, ঝোল দিয়ে মাখো, ঝোল জল থেকেই তৈরি, খাওয়া শেষে জল খাও পেট ভ'রে। *ইজরায়েল।* (১৩) বাজ। *য়োরুবা।* (১৪) জাহাজ, আগে তৈরি হত কাঠে। জীবিত গাছ অনড়, কেটে কুটে তা দিয়ে জাহাজ বানাতে অমনি সে ছুটেছে। *ইজরায়েল।* (১৫) ধোঁয়া। *পুরনো গ্রিক।* (১৬) জানা নেই। উত্তরপ্রদেশ। (১৭) আকাশ আর তারা। *দিল্লি।*

ম হা জ ন স ঙ্গ

অমিতাভ চৌধুরি

। পর্ব ১৯।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ঘরোয়া আসরে কবিতা পাঠ করছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ তাঁর চিঠি পাওয়ার ছয় বছর পর। ১৯৫২ সালে শান্তিনিকেতনে। গত শতাব্দীর ছেচল্লিশ সালে আমার একটি ছড়ার বই পাঠিয়েছিলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউসে। ছাপার জন্য। তার পর সেখানকার একজন কর্মকর্তা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চিঠি— 'মনোনীত। ছাপা হবে।' আমি তো আহ্লাদে যোলো খানা। সহপাঠী একজন বলল, 'আরে, তুই কি কমিউনিস্ট হয়ে গেলি?' তখন ওসব বুঝি না। মফস্বলের ছাত্রের একখানি বই ছাপা হচ্ছে, সেই ঢের।

চৌরঙ্গি রোডে ওঁদের অফিসে গেলাম। কিন্তু, বরাত মন্দ, কমিউনিস্ট পার্টির ওপর পড়ল নিষেধাজ্ঞা। ওই প্রকাশন সংস্থাও বন্ধ হয়ে গেল। প্রকাশকরা হয় জেলে, নয় পলাতক। আমার আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে গেল। তবে আমি আবার নতুন করে পাণ্ডুলিপি সাজানো শুরু করলাম।

কিন্তু আমার বড় লাভ হল, বই ছাপা না হোক, সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমার কাছে সুভাষদা হয়ে গেলেন। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। তিনি আমাকে ভালোবাসতে শুরু করলেন। আমিও তাঁকে বড় ভাইয়ের মতো দেখতে শুরু করলাম। তারপর সুভাষদার জীবনে কত

উত্থানপতন। কবিখ্যাতি বাড়তেই লাগল। আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর সম্মান বৃদ্ধি হতে লাগল এবং শেষমেষ তিনি তাঁর প্রিয় রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়লেন। সর্বত্র হইচই। তিনি মমতা ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন। লেখাও চলল অবিরত। তার পরেই একদিন এল দুঃসংবাদ। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর নেই। মাথায় বজ্রাঘাত হল।

আসলে আমার জীবনে বড় লাভ সুভাষদার সঙ্গে পরিচয় হওয়া। তাঁর বাড়ি আমার কাছে ছিল অবারিত দ্বার। তিনিও আমার বাড়িতে এসেছেন। কত আলাপ— রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কার, বাংলা ছন্দ, শিশুদের জগৎ এবং মানুষকে ভালোবাসা। তার মধ্যে একদিন হঠাৎ তাঁর চিঠি পাই। অদ্ভুত চিঠি। বম্বে থেকে তাঁর একদা পরিচিত এসেছেন। তাঁর সঙ্গে সুচিত্রা সেনের আলাপ করিয়ে দিতে হবে। আমি তো অবাক। সুভাষদা আর সুচিত্রা সেনকে একসঙ্গে মেলাতে পারলাম না।

সুভাষদা অসাধারণ কবি। কিন্তু গদ্য রচনায়ও তাঁর জুড়ি নেই। ১৯৪০ সালে বের হয় তাঁর প্রথম কবিতার বই— 'পদাতিক'। তার প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তার পর প্রচুর বই। প্রত্যেকটি অসাধারণ। আবার ওদিকে নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' সংক্ষেপে লিখে একটা বই করেছিলেন এই সুভাষদাই। কবিতার মতো গদ্য রচনায়ও তাঁর জুড়ি নেই। আমি অবাক হয়ে যাই এত সুন্দর গদ্য তিনি লেখেন কী করে? 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় তিনি চলতি বাংলায় কিছু রিপোর্টিং করেছিলেন। পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার পর তাঁর 'ডাক বাংলোর ডায়েরি' আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল। তাছাড়া তাঁর শৈশব ও বাল্যস্মৃতি নিয়ে লেখা কত বার যে পড়েছি। পড়ে মুগ্ধ হয়েছি।

নদিয়া জেলায় বাড়ি। তাঁর গ্রামে ছিলেন সেকালের এক বিখ্যাত কবি— সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথা এবং কলকাতায় এসে প্রায়-বস্তিতে বাস, অতি দুঃখের দিন, তাঁর ঠাকুরদার কথা— সব আমাকে আপ্লুত করে রাখত। বড় হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। বজবজে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে ছিলেন। সেই কমিউনিস্ট পার্টিই তিনি ছেড়ে দিলেন। হলেন মুক্তপথের পথিক। হয়েছিলেন আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের কর্তাব্যক্তি। কখনও মস্কোয়, কখনও কায়রোয়, কখনও ভিয়েতনাম। ব্যস্ত মানুষ, তারপরেই সব ছেড়েছুড়ে কলকাতা-বন্দি।

যৌবনে সুভাষ। ছবি লেখকের সৌজন্যে।

একদিন হন্তদন্ত হয়ে পথে ছুটতে দেখে বললাম— 'সুভাষদা কোথায় চললেন?' বললেন— 'যাব ভোলা সেনের একটা ইলেকশন মিটিং আছে, ওইখানে কিছু বলতে হবে।'

সুভাষদা ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেবার তিনি আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। সাদা চুলের মুকুট পড়ে তিনি হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছেন, তখনই একজন চেনা লোক বিগলিত বিনয়ে বললেন, 'তিনি জানতেন এই অসাধারণ খবরটা।' সুভাষদা ভাবলেন নিশ্চয়ই ভদ্রলোক তাঁর আকাদেমি পুরস্কারের কথা বলছেন। তখন ওই ভদ্রলোক বললেন, 'আমি জানতামই না, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে।' সুভাষদা মরমে মরে গেলেন। তবে হেমন্তদার সঙ্গে সুভাষদার বন্ধুত্ব সেই স্কুলজীবন থেকে। দুজনে পড়তেন এক ক্লাসে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে। টিফিন পিরিয়ডে ডেস্ক বাজিয়ে গান গাওয়ার অপরাধে ওঁদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা হয়। সুভাষদাই অতি কষ্টে হেডমাস্টার মশাইকে থামান এবং পরে সুভাষদাই হেমন্তদার জন্য একটি গান লিখে দিয়ে তাঁকে গারস্টিন প্লেসে অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশনে প্রথম গান গাওয়ান এবং পরে আবার গান লিখে হেমন্তদাকে দিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডও করান। দুজনে এমন বন্ধুত্ব কদাচিৎ দেখা যায়।

সুভাষদা জীবনে অনেক সম্মান পেয়েছেন। সরকারি তো বটেই, সাধারণ মানুষেরও। জীবনে কোনও চাকরি করেননি। শুধু লিখে গিয়েছেন। সোবিয়েত রাশিয়ার পতনে তিনি বিষণ্ণ, কিন্তু এ যে অবশ্যম্ভাবী ছিল তা তিনি বুঝেছিলেন। স্ত্রী গীতাদিকে নিয়ে শরৎ ব্যানার্জি রোডে তাঁর আনন্দের সংসার। মাথায় কত পরিকল্পনা। 'আচ্ছা অমিত, এইটা করলে কেমন হয়।' 'শোনো অমিত, আমি ভাবছি, এ নিয়ে একটা ভালো বই লেখা যায়।' ১৯৯২ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাওয়ার পর বললেন, 'আর্থিক পুরস্কার পেলে যে-কেউ খুশি হয়, আমিও খুশি।'

জীবনে কত দিকে কত কাজই না তিনি করেছেন। সংবাদপত্র, মাসিক পত্র— সব কিছুতে লিখতেন। বিজ্ঞাপনের কপি রচনায় তিনি ছিলেন পয়লা নম্বর। নব প্রকাশিত 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ছিলেন সাহিত্য আকাদেমির পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান। বিশ্বভারতীর সংসদ সদস্য। আমিও ছিলাম। দুজনে একসঙ্গে ছিলাম, একসঙ্গে থাকতাম। কলকাতায় এমন লোকের অভাব যাঁর কাছে কোনও প্রশ্ন নিয়ে যাওয়া যায়। অতুল গুপ্ত নেই, সুনীতিবাবু নেই, ছিলেন সুভাষদা। নানা বিষয়ে আগ্রহী এমন খ্যাতিমান পুরুষের সঙ্গ সব সময় কাম্য, বাড়তি পাওয়া যেত তাঁর স্নেহ, তাঁর ভালোবাসা।

ভুল ছবি

ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সংখ্যায় এই বিভাগে ভবতোষ দত্ত সম্পর্কিত রচনায়, ভুলবশত অর্থনীতিবিদ-প্রাবন্ধিক ভবতোষ দত্তর বদলে বাংলাভাষার খ্যাতনামা অধ্যাপক ভবতোষ দত্তর ছবি ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

। পর্ব ২০।

প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ

'আম্রপালি'। কলকাতার বি টি রোডে প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের বাসগৃহ।

সবে সংবাদপত্রে চাকরি নিয়ে কলকাতার বাসিন্দা হয়েছি। ১৯৫৬ সাল। এসেই শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক হই। সভাপতি হয়েছিলেন প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ। বি টি রোডের আম্রপালি তাঁর বাড়ি। সেখান থেকেই চিঠি— 'আমিও তোমার মতোই এককালে আশ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক ছিলাম। সেই কারণেই তোমাকে আমি সর্বতোভাবে সাহায্য করতে আগ্রহী।' তাঁর সঙ্গে কিছুদিন পরে আমি দেখা করি। কলকাতা শহরে কী করে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্ঘবদ্ধ করলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কত স্নেহ করতেন, ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষদ গড়ে তুললেন কীভাবে— নানা কথা। ধীর স্পষ্ট উচ্চারণ, স্পষ্ট বাক্যাবলি, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

রবীন্দ্রনাথের শেষ অসুখের সময় তাঁর দুশ্চিন্তার কথা বলতে তিনি ভোলেননি। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের বড় পরামর্শদাতা ছিলেন ওই সময়। বিশ্বভারতীতে ১৯১৯ সাল থেকে ছিলেন জেনারেল সেক্রেটারি। রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্মানিত সদস্য করা নিয়ে যখন প্রচণ্ড গণ্ডগোল চলছিল, তখন 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' নামে একটি সুন্দর পুস্তিকা বের করেন, তিনি ও তাঁর বন্ধু সুকুমার রায়। রানী মৈত্রের সঙ্গে বিয়ের সময় পিতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তা সম্পন্ন হয় নীলরতন সরকারের বাড়িতে এবং নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করতে আসেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯৫৭ সালে আমরা যখন 'রক্সি' সভাগৃহে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছি, তখন তিনি কবির ভূমিকায় ও রাজার ভূমিকায় ডঃ কালিদাস নাগ অভিনয় করেন। স্টেজে পার্ট ভুলে এবং প্রম্পটারের তোয়াক্কা না করে তাঁরা দু'জনে সেদিন যা কাণ্ড করেছিলেন, তা কোনও দর্শকেরই ভোলবার নয়। কাগজে মন্দ রিপোর্ট বেরিয়েছিল। তা বেরোক, বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের অভিনয় করার উৎসাহটা তো ভোলার নয়।

প্রশান্ত চন্দ্রকে আমরা জানি ভারতের সংখ্যাতত্ত্বের জনক হিসেবে। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট তাঁরই কীর্তি। পরিসংখ্যানের এতবড় প্রতিষ্ঠান সারা পৃথিবীতে নেই। চিনের প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই,

এই প্রতিষ্ঠান দেখে মুগ্ধ। তাঁরই অনুরোধে প্রশান্ত চন্দ্র তাঁর দুজন সহকারীকে চিনে পাঠান ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে ইত্যাদি কাজের জন্য। তাছাড়া প্রশান্ত চন্দ্র ছিলেন ভারতের যোজনার সর্বাধিনায়ক। আমাদের দেশের যোজনার ব্যাপারে সর্বাধিক দান রবীন্দ্রনাথের। গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ পরে তা নিয়ে আলোচনা করেন জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের নানা প্রস্তাবে সায় দিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জওহরলাল প্রশান্ত চন্দ্রকে ডেকে পাঠান দেশের ভবিষ্যৎ প্ল্যানিংয়ের ভার নিতে। ইস্পাত ও তেলের ওপর জোর দিয়ে যে যোজনা তৈরি হয়, তার ভার নেন প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ। তার ভালো-মন্দ দু'য়ের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর।

১৯২৬। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইউরোপে প্রশান্ত চন্দ্র (একেবারে বাঁদিকে) এবং রানী মহলানবিশ

তাঁর ঠাকুরদা গুরুচরণ মহলানবিশের স্থাপিত ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে তাঁর প্রথম শিক্ষা। তারপর প্রেসিডেন্সি এবং কেমব্রিজ। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল এযুগের শ্রেষ্ঠ এবং অল্পবয়সে মৃত গণিত ধুরন্ধর রামানুজনের সঙ্গে। সেই সময়ই 'মহলানবিশ তত্ত্ব' নামে একটি পরিসংখ্যানের সৃষ্টি করেন তিনি। ১৯২৩ সালে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের ভার নেন তিনি। সেইখানে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী রানীর অতিথি হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বহুবার। পরিসংখ্যান নিয়ে একটি পত্রিকাও তিনি বের করেন। নাম দেন 'সংখ্যা'। ১৯৩৩ সালে। রোল্যান্ড ফিশারের সংখ্যাতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগের নমুনা ছক তিনিই তৈরি করেন।

তবে তিনি ছিলেন মূলত রবীন্দ্রানুরাগী এবং রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের ব্যাখ্যাকার। দুর্লভ বৈজ্ঞানিক সম্মান রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হওয়ার পরেও তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু কিছু লিখেছেন। পরিমিত অথচ মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের গান ও অনেক সুখ-দুঃখের কথা তিনি আমাদের জানিয়েছেন বইয়ে। ১৯২৬ সালে ইউরোপ সফরের সময় তিনি সস্ত্রীক সঙ্গী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের। মুসোলিনির দেশ ইতালি সফরের সময় যে-সমালোচনা শুরু হয়, তা সামাল দিয়েছিলেন প্রশান্ত চন্দ্রই। কবি বর্ণিত রাশিয়ায় প্রগতির ভিতও তৈরি করেছিলেন প্রশান্ত চন্দ্রই।

তাঁর পরিসংখ্যান পরিষদের বিশাল কর্মকাণ্ড বাদ দিলে তিনি সবচেয়ে বেশি জড়িয়েছিলেন বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথে। এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে মুক্ত করে বিশ্বভারতী গ্রন্থনালয়কে রূপ দেওয়ার প্রধান কারিগর প্রশান্ত চন্দ্রই। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসংকলন 'চয়নিকা' তাঁর উদ্যোগেই প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া তিনি প্রিন্সিপাল থাকাকালীনই প্রেসিডেন্সি কলেজে গড়ে তোলেন রবীন্দ্র পরিষদ। ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে তিনি দীক্ষান্ত ভাষণ দেন। মাত্র দু'পাতার ভাষণ। কিন্তু কী তথ্যপূর্ণ ও আবেগবর্জিত এবং রবীন্দ্রনাথের মূল ধরে টানাটানি। আমি মুগ্ধ হয়ে যাই এই ভাষণ শুনে। তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি আমার আর কোনও আলাপ হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তাঁর স্বল্প লেখা সব পড়েছি। পড়ে মুগ্ধ হয়েছি, লাভবান হয়েছি। দীর্ঘদেহী সুষমামণ্ডিত এই মানুষটি ছিলেন আমাদের দেশের সম্পদ। রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে জানতে হলে তাঁকেও জানা চাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন যেমন ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ঠিক তেমনই তিনিও দুই প্রান্তের মূল বস্তুকে একসঙ্গে গাঁথার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর কথা আমরা ভুলতে বসেছি। এমনকি তাঁর শতবার্ষিকী জন্মোৎসবও নমো নমো করে সারা হয়েছে, তাঁর পিতামহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে। আর কোথাও নয়! শান্তিনিকেতনেও না।

'আম্রপালি'তে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে

মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ ও জীবিত গেরিলার উদ্দেশে

জাহানারা ইমাম

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতি প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

এগারো

৫ জুলাই, সোমবার ১৯৭১

জামী স্কুলে যায় না, আমি প্রতি মাসে একবার গিয়ে তার মাইনেটা দিয়ে আসি। হেডমাস্টার খান মুহম্মদ সালেক সাহেব ব্যস্ত না থাকলে তাঁর সাথে, না হয় টিচার্স রুমে অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে খানিক গল্প করে আসি। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে চাকরি করেছি মাত্র দু'বছর। কিন্তু ওই সময় গভঃল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে যে হৃদ্যতা হয়েছিল, তা আজও অটুট রয়েছে।

আজ সালেক সাহেব একাই বসেছিলেন তাঁর ঘরে। ফলে বেশ সুযোগ পাওয়া গেল সেন্সরবিহীন কথাবার্তা বলার। একটু পরেই ফোন বেজে উঠল। সালেক সাহেব ধরে কথা বলতে লাগলেন, আমি চুপচাপ শুনে গেলাম। কোনও অভিভাবকের সঙ্গেই হচ্ছে, বোঝা গেল। সালেক সাহেবের কথাগুলো এরকম:

'জি হ্যাঁ স্কুল তো খোলাই। টিচার, দপ্তরি, দারোয়ান সবাই তো হাজির।

'জি, জি, রোজই আসছে। আজও তো পঁয়তাল্লিশজন ছাত্র স্কুলে এসেছে।'

'না, না, এক্লাসে হবে কেন? আঠারোটা ক্লাসে।'

'পাঠাতে চাইলে নিশ্চয় পাঠাবেন। পথের দায়িত্ব আমরা নিই কী করে বলুন? স্কুলের গেটের ভেতর ঢুকলে, তার পরের দায়িত্বটুকু আমাদের।'

আরও খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনলেন, 'জি হ্যাঁ, জি না, হ্যাঁ হ্যাঁ-' করে গেলেন। তারপর ফোন রেখে হাসলেন, 'বেচারি গার্জেন! কিছুতেই ডিসিশান নিতে পারছেন না। ছেলে পাঠাবেন কী পাঠাবেন না। ঘরে রাখার মতো মনের জোর নেই, স্কুলে পাঠাবার মতোও দাপট নেই এ যেন সেই মাথায় রাখলে উকুনে খাবে, মাটিতে রাখলে পিঁপড়েয় খাবে।'

সালেক সাহেবের স্ত্রী-পুত্রকন্যারা কেউ কোয়ার্টার্সে থাকে না, একেকজনকে একেক জায়গায় রাখার বন্দোবস্ত করেছেন। ক্লাস নাইনে পড়া একটি মাত্র ছেলে ওঁর সঙ্গে থাকে। হেসে বললাম, 'অন্তত দেখাবার মতো একটি কুমির ছানা সঙ্গে রেখেছেন।'

'কী করব বলুন। সরু চুলে বাঁধা ডেমোক্লিসের খাঁড়া ঝুলছে মাথার ওপর। তাই একটু সাবধানে থাকতে হয়। রাতে বাসায় থাকি না। তবে কেয়ারও করিনে। হায়াত যদ্দিন আছে, কেউ মারতে পারবে না। সুতরাং আগে থেকেই মরে কী লাভ?'

একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'জামী কেমন আছে? ও বাড়িতে ঠিকমতো পড়াশোনা করছে তো? দেখবেন যেন ঢিলা দিয়ে সব ভুলে খেয়ে বসে না থাকে। স্কুল বয়কট করা যেমন দরকার, বাড়িতে বসে স্কুলের পড়াটা ঠিকমতো চালিয়ে যাওয়াটাও তেমনই দরকার।'

বাড়ি ফিরে দেখি সাদ আর গালেব রুমীর খাটে বসে দাবা খেলছে। জামী খাটের পাশেই মেঝেতে বসে খাটের ওপর কনুই রেখে খেলা দেখছে। বারেককে ডেকে চা-নাশতার কথা বলে আমিও খাটের অন্য পাশে কনুই রেখে মাটিতে বসলাম ওদের খেলা দেখবার জন্য।

৭ জুলাই বুধবার ১৯৭১

গত তিনদিন ধরে বাঁকা আর শরীফের নাওয়া-খাওয়া বলে কিছু নেই। সারা দেশের সবগুলো ব্রিজ আর কালভার্টের তালিকা বানানো মুখের

মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত চৌধুরী ও হাবিবুল আলম (ডানদিকে)

কথা নয়। প্রথমত রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ-এর ডিজাইন ডিভিশন থেকে ব্রিজের ফাইলগুলো বের করা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ডিজাইন ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সামাদ শরীফের খুব ভক্ত। সরকারি চাকরিতে শরীফ যখন ডিজাইন ডিভিশনে ছিল, তখন সামাদকে সে ডিজাইন অফিসের জন্য গড়ে পিঠে তৈরি করে নিয়েছিল। কিন্তু ফুলের বোঁটায় কাঁটার মতো সামাদের সঙ্গে কাদের খানও শোভা পাচ্ছে— ডিজাইন ডিভিশনের অবাঙালি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। তার সন্দেহ উদ্রেক না করে অফিস থেকে ফাইল সরানো যায় কীভাবে? বাঁকা, শরীফ আর মঞ্জুর একত্র হয়ে অনেক সলাপরামর্শের পর ঠিক করল, চিফ ইঞ্জিনিয়ার মশিউর রহমান সাহেবকে ধরতে হবে। মশিউর রহমান সাহেব কাদের খানকে বললেন ব্রিজের ফাইলগুলো তাঁর অফিসে দিয়ে যেতে। সেখান থেকে রাতের অন্ধকারে ফাইল গেল সামাদের বাসায়। তারপর শরীফ আর বাঁকার দীন-দুনিয়া নেই। ৩,৫০০টি ব্রিজ আর কালভার্ট। সে সবের তালিকা বানানো কি চাট্টিখানি কথা? আবার বেশি লোক জানাজানি হলে চলবে না। মামাদের বাসায় বসে বসে বাঁকা নিজের হাতে ফাইল থেকে তালিকা কপি করেছেন। শরীফ বিভিন্ন টাইপের ব্রিজের ড্রয়িং করিয়ে প্রত্যেকটির স্পেসিফিকেশান লিখেছে।

শরীফ ও বাঁকার হাতের লেখা যাতে চেনা না যায়, সেজন্য দু'জনের হাতে লেখা অংশগুলো অন্য একজনকে দিয়ে আবার কপি করানো হয়েছে।

এখন সব রেডি। একবোঝা কাগজ গোল করে গুটিয়ে শরীফ আজ বাড়িতে নিয়ে এসেছে। ছেলে দুটি আজ-কালের মধ্যেই বাসায় আসবে ওগুলো নিতে। শরীফ ওদের বলে দিয়েছে ওদের পক্ষে ওগুলো হাতে করে অফিস থেকে বেরোনো রিস্কি। কারণ ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের অফিসের ওপর আই. বি'র লোকেরা চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখে।

৮ জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯৭১

গত রাত থেকে জামী অসুস্থ। জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা, নিঃশ্বাস নিতে শোঁ-শোঁ শব্দ, কষ্ট।

সন্ধের মুখে আমি আর শরীফ বাগানে বসেছিলাম। দুটি ছেলে গেট দিয়ে ঢুকে ধীর পায়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। এদেরকে আগে কখনও দেখিনি, তবু একপলক তাকিয়েই চিনলাম। পরনে সাধারণ প্যান্ট-সার্ট, মাথার লম্বা চুল প্রায় ঘাড় অব্দি, গাল পর্যন্ত নেমে আসা জুলপি, প্রায় চিবুক-ছোঁয়া ঝোলানো গোঁফ। দুই নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত চৌধুরী আর হাবিবুল আলম।

ছেলে দু'টি একটু হেসে আদাব দিল। শরীফ মৃদুস্বরে বলল, 'বস।' সামনের দুটো খালি বেতের চেয়ারে ওরা বসল। শরীফ বলল, 'সব রেডি। বাসায় এনে রেখেছি। একটু বুঝিয়ে দিতে হবে।'

শরীফ আমার দিকে তাকাতেই আমি উঠে ভেতরে গেলাম। ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম টেবিলটা পরিষ্কারই আছে, পাশের জানালার পর্দাও টেনে ঢাকা আছে। রান্নাঘরে গিয়ে কাসেমকে বললাম, 'গোটা চারেক শামি কাবাব আর দুটো চাপ এখুনি ভেজে ফেলো। ফ্রিজ খুলে রস-মালাইয়ের হাঁড়ি থেকে খানিকটা রস-মালাই একটা বাটিতে তুলে দিয়ে বললাম, 'ওগুলো ভাজা হলে এই মিষ্টিসুদ্ধ ট্রেতে সাজিয়ে কোয়ার্টার প্লেট, চামুচ, পানি সব দিয়ে ডাইনিং টেবিলে দিবি পনেরো মিনিট পর। আমি আর আসতে পারব না। বুঝলি?'

বাইরে বেরিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও কোনও বাড়ির জানলায় কারও চেহারা দেখা যাচ্ছে না, রাস্তাতেও কেউ নেই। শরীফকে বললাম, 'ডাইনিং টেবিলে বসো গিয়ে।'

ওরা তিনজনে ঘরে গেলে আমি বাগানেই বসে রইলাম গেট পাহারা দিতে। বুক দুরুদুরু করছে। খুব ইচ্ছে হচ্ছে ওদের সঙ্গে গিয়ে বসতে, ওদের মুখ থেকে রুমীর কথা শুনতে। কিন্তু গেট ছেড়ে আমার যাবার উপায় নেই। জামীটাও অসুখ বাঁধিয়ে পড়ে থাকার আর সময় পেল না।

সন্ধে হয়ে আসছে। আমাদের উল্টোদিকের দুটো বাড়ির পর রেজা সাহেবের ছেলে সাজ্জাদ এসে দাঁড়াল গেটে, 'খালাম্মা, একটা ফোন করব।' আমি বললাম, 'ফোন তো খারাপ।' ও চলে যেতেই দ্রুত পায়ে ঘরে গেলাম। এক্ষুনি কোথাও থেকে ফোন এলে মুশকিলে পড়ে যেতাম। দোতলায় উঠে বেডরুমের এক্সটেনশান ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম এক ডায়াল করে। তারপর আবার বাগানে গিয়ে বসলাম। আমাদের সিঁড়িটা ডাইনিং রুমের ভেতর পুবের দেয়াল ঘেঁষে। নামার সময় পায়ের গতি শ্লথ করে ডাইনে আড়চোখে ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকালাম। শরীফ টেবিলে ড্রয়িংয়ের কাগজ মেলে তার ওপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মৃদুস্বরে কিছু বলছে, কানে এল দু'চারটে শব্দ। অ্যাবাটমেন্ট, পিয়ার, গার্ডার, বিয়ারিং। ছেলে দু'টি কাগজের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে একমনে শুনছে।

সন্ধ্যারও অনেক পরে ছেলে দু'টি গোল করে গোটানো কাগজ হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরোল। আমার গলার কাছে কী যেন পাকিয়ে উঠল। এই কাগজের রোল হাতে নিয়ে বাইরে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো খুবই বিপজ্জনক। ওদের তাড়াতাড়ি ডেরায় পৌঁছনো দরকার। একটা প্রশ্ন করলেও দেরি হয়ে যাবে। বোবার মতো তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা নীরবে মাথার কাছে হাত তুলে গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

৯ জুলাই শুক্রবার ১৯৭১

আজ সকালেই ড্রয়িং-ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র কিছু সরা-নড়া করে ব্যবস্থা বদলে দিলাম। ড্রয়িং ও ডাইনিং রুমের মাঝখানে দুটো রুম— ডিভাইডার আলমারি বসানো আছে।

ঘরের এ জায়গাটার প্রস্থ হল ষোলো ফুট। আলমারি দুটো চার ফুট করে আট ফুট চওড়া। আলমারির দু'পাশে চার ফুট করে জায়গা খোলা। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে ড্রয়িং রুম, ডানদিকে ডাইনিং রুম। কোনও লোক দরজা দিয়ে ঢুকে ডানদিকে তাকালেই ডাইনিং টেবিলসহ প্রায় পুরো ঘরটাই একনজরে দেখে ফেলবে। শরীফ, কাসেম, বারেক আর ড্রাইভার আমিরুদ্দি— এই চারজনে মিলে আলমারি দুটো ঠেলে সদর দরজার পাশে দেওয়ালে লাগিয়ে দিল। এখন এদিকের দেয়াল থেকে শুরু করে ঘরের আট ফুট পর্যন্ত দুটো আলমারি দাঁড়িয়ে গেল। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে তাকালে ডাইনিং রুমটা আর দেখা যাবে না। এখন বাকি আট ফুটের ব্যবস্থা করতে হবে। ডাইনিং রুমের দূরতম উত্তর-পশ্চিম কোণে যে চারফুট চওড়া আলমারিটা ছিল, সেটা ঠেলে এনে ঘরের অপর পাশের দেয়াল ঘেঁষে রাখা হল। এখন এই আলমারি আর এ পাশের দুটো আলমারির মাঝে ফাঁক রইল চার ফুট। এখানে একটা পর্দা ঝুলিয়ে দেব। ব্যস, চমৎকার আলাদা দুটো ঘর হয়ে গেল। ড্রয়িংরুমের কেউই আর কোনও মতে দেখতে পাবে না ডাইনিংরুমে কে কী করছে। আর একটা ছোট্ট সমস্যা রইল। রুম ডিভাইডার আলমারি দুটোর দুদিকেই পাল্লা দেয়া। বসার ঘরের দিকে বই রাখার জন্য, খাবার ঘরের দিকে গ্লাস, প্লেট ইত্যাদি রাখার জন্য। এ আলমারির পিছনদিক বলে কিছু নেই। কিন্তু অন্য আলমারির পিছনদিকটা একেবারে বার্নিশবিহীন পিছনদিকই বটে। সেটা আবার বসার ঘরের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে। এর পিছনে কিছু সাঁটা দরকার। মাঝখানের চার ফুট ফাঁকের জন্য পর্দার কাপড় কিনতে গিয়ে দোকানে খোঁজ করে একটা মোটা কাপড়ের টুকরো কিনে নিয়ে এলাম। ক্রিম রঙের মোটা কাপড়ে খানিক দূরে দূরে নানা রঙের পোশাক পরা নর্তকীর ছাপ দেওয়া। এই কাপড়টা ওই আলমারির পিছনে বোমাকাঁটা দিয়ে সেঁটে দিলাম। পর্দার কাপড় কিনলাম খুব মোটা ঘন নীল রঙের— ঘন কুচি ফেলার জন্য ডবল চওড়া কাপড় নিলাম। যাতে পর্দাটা বাতাসে উড়লেও ঘন কুচির দরুন দু'পাশ দিয়ে দেখা না যায়। এসব শেষ করতে সন্ধে পেরিয়ে গেল। সারাদিন অন্য কোনও কাজ করিনি।

সব হয়ে গেলে দু'ঘরের চারটে পাখা ফুল স্পিডে ছেড়ে দিয়ে বসার ঘরে ঘুরে ফিরে বার বার করে দেখতে লাগলাম— কোনওভাবে খাবার ঘরের ভেতর দৃষ্টি চলে কি না। না, একেবারেই দৃষ্টি চলে না। এত ঘন কুচিওয়ালা এত ভারী পর্দাও নড়ে না এত ফুলস্পিডের পাখার বাতাসে। খুব সন্তুষ্টি লাভ করলাম

বারেক-কাসেম পালিয়ে যাওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল— ভালোই হল। এখন মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে মাঝেই আসবে। বাসায় কাজের লোক না থাকাই ভালো। গতকাল রোববার ছিল, বাপবেটা দু'জনে মিলে বাজার করে এনেছে। রান্নাঘরের কাজেও হাত লাগিয়েছে।

সারাদিনের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর। এখন যত খুশি প্রতিবেশীরা ফোন করতে আসুক, যখন খুশি আসুক।

১০ জুলাই শনিবার ১৯৭১

ডাক্তার সহি-সালামতে রাওয়ালপিন্ডি থেকে ফিরেছেন। দুপুরে আমাদের সঙ্গে ভাত খাওয়ার পর বসে বসে ওঁর করাচি-পিন্ডির ট্যুরের গল্প শুনলাম। করাচি পৌঁছে হোটেলে উঠেই ওঁরা দুজনে ডাঃ ইব্রাহিমকে ফোন করেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের হোটেলে চলে গিয়ে প্রথমেই শুনতে চান ঢাকা এবং সারা পূর্ব বাংলার খবর। ডাঃ ইব্রাহিম ওঁদের দু'জনকে বলেন, মিটিংটা আমি ইচ্ছে করেই পিন্ডিতে ডেকেছি যাতে তোমাদের মুখ থেকে আসল খবর সব শুনতে পাই। এ কে খান, নূরুল ইসলামের মুখে ঢাকা ও পূর্ব বাংলার প্রকৃত অবস্থা জেনে ডাঃ ইব্রাহিম খুবই মর্মাহত ও বিচলিত হন। করাচিতে একরাত থেকে পরদিন ডাঃ ইব্রাহিমসহ ওঁরা দুজন মিটিং করতে যান পিন্ডিতে।

চারটের দিকে বললাম, 'চলুন, সবাই মিলে কাওরান বাজার যাই। ঢেঁকি-ছাঁটা লাল বিরুই চাল কিনে আনি।'

ডাক্তার বললেন, 'চাল পরে কেনা যাবে। আগে টিউবওয়েল বসানোর কাজটা সেরে নিই।'

ঢাকায় কিছুদিন থেকে গুজব চলছে: মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ক্রমে ক্রমে সবগুলো পাওয়ার স্টেশন অচল করে দেবে। ঢাকা শহরে লাইট, পানি কিছুই থাকবে না। শরীফ কিছুদিন থেকেই ভাবনাচিন্তা করছে বাসায় টিউবওয়েল বসানোর কথা। আমাদের বাথরুমগুলোয় ইয়োরোপিয়ান কমোড, কিন্তু পানি ফ্লাশ করার সিস্টানটা সেকেলে। সাত ফুট উঁচুতে দেওয়ালে বসানো। ছাদের ট্যাঙ্ক থেকে পাইপ দিয়ে পানি আসে। ওগুলো বদলে তিন ফুট উঁচুতে লো-ডাউন বসানোর কথাও ভাবছে শরীফ। তাহলে ট্যাঙ্কে পানি না থাকলেও কোনও সমস্যা হবে না। লো-ডাউনের ঢাকনা খুলে বালতি থেকে পানি ভরে ফ্লাশ টানা যাবে।

ডাক্তার রাজশাহী ফিরে যাওয়ার আগেই বাসায় টিউবওয়েল বসানোর কাজ সেরে রাখতে চান। এবার উনি একাই ফিরে যাবেন। সানু খুকু লুনা ঢাকাতেই থাকবে। এনায়েতপুরে চিঠি লিখে দিয়েছেন খোকন ও মঞ্জুকে ঢাকা চলে আসার জন্য।

বিকেলে শরীফ ঢাকা ক্লাবে গেল টেনিস খেলতে, আমি মা'র বাসায়। সন্ধ্যার আগ দিয়ে বাসায় ফিরে দেখি বারেক— কাসেম দু'জনেই বাক্স বিছানা বেঁধে উধাও! কী তাজ্জবের কথা! জামী ওপরে ছিল, টেরও পায়নি। কপাল ভালো, খোলা খিড়কি দরজা দিয়ে কোনও চোর বা ফকির বাসায় ঢোকেনি।

১২ জুলাই সোমবার ১৯৭১

বারেক-কাসেম পালিয়ে যাওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল— ভালোই হল। এখন মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে মাঝেই আসবে। বাসায় কাজের লোক না থাকাই ভালো। পরশুদিন রাতে টেবিল লাগানো, খাবার গরম করা, খাওয়া শেষে টেবিল সাফ, থালাবাসন ধোয়া ইত্যাদি কাজে জামী-শরীফ দু'জনই সাহায্য করেছে। গতকাল রোববার ছিল, বাপবেটা দু'জনে মিলে বাজার করে এনেছে। রান্নাঘরের কাজেও হাত লাগিয়েছে। তাই ধকল টের পাইনি।

তবে এ বাসার যে একটা 'ব্যারাম' রয়েছে— অত্যধিক মেহমান আসা— আমার মেহমান, শরীফের মেহমান, জামীর মেহমান, বাবার মেহমান, এখন আবার নতুন আরেক ধরণের মেহমান— সকাল-দুপুর, সন্ধ্যা, রাত— তাদের মেহমানদারী করার পরিশ্রমটা গায়ে লাগে না কাজের লোক থাকলে। গতকাল রোববার তবু শরীফ-জামী চা বানানো, ট্রেতে করে এনে দেওয়া ইত্যাদি কাজে হাত লাগিয়েছিল বলে অতটা টের পাইনি। তাই গতকাল সন্ধ্যার মুখে মালু মিয়া হন্তদন্ত অবস্থায় পলাতক দু'জনকে ধরে আনলেও আমি বলে দিয়েছিলাম ওদের আর রাখব না। (মালু মিয়া গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুলের পিওন, বহু বছর ধরে কাজের ছেলে সাপ্লাই দেওয়া ওর একটা বাড়তি কাজ।)

কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই 'এলে'

গিয়েছি। পুরনো ঠিকে ঝি রেণুর মাকে খুঁজে বের করলাম। দু'বেলা ছুটো কাজের জন্য আবার ওকে রাখলাম। কাজ করে দিয়ে চলে যাবে— এই ভালো। বাসায় কে এল, কে গেল অত খেয়াল করবে না। শাহাদত আর আলমের সঙ্গে রুমীর কথা বলতে পারিনি— সেই দুঃখে কদিন খুব কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু এখন সেই কষ্ট আর নেই। রুমী যেখানে গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে, সেই মেলাঘর থেকে বিভিন্ন দিনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছে জিয়া, মনু, দুলু, পারভেজ।

পারভেজ বলল, 'খালাম্মা ওদিকে কি যে এক চোখের অসুখ শুরু হয়েছে—'

আমি কথা শেষ করতে না দিয়েই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এখানেও তো। গেল মাস থেকে। আমাদের চেনাজানা অনেকের হয়েছে। খুব কষ্ট। কপাল ভালো আমাদের বাড়িতে এখনও ঢোকেনি। তোমাদের ওদিক থেকেই নাকি এসেছে?

নতুন খবরটা দিতে না পেরে পারভেজ হতাশ হয়ে মুখ বন্ধ করেছিল, এখন বলল, 'সবাই তো বলে এদিক থেকেই ওদিকে গেছে।'

'এখানে কী গুজব জান? খানসেনারা এটার নাকি নাম দিয়েছে জয় বাংলা চোখ ওঠা। ওদেরই নাকি বেশি হচ্ছে এগুলো। ওরা বলে 'বিচ্ছু' গেরিলাদের চেয়েও বেশি বিচ্ছু এই চোখ ওঠা।'

'সত্যি বিচ্ছু চোখ ওঠা খালাম্মা। এত জ্বালা-যন্ত্রণা হয়, তাকানো যায় না, খালি চুলকায় আর পানি পড়ে লাল হয়ে থাকে।'

'হ্যাঁ, এখানকার খবরের কাগজগুলোতেও এ নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়েছে। ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস না কি যেন বলে। সারতে আট-দশদিন লাগে। ওষুধ দিলেও সারতে ওই একই সময় লাগে। আসলে ওষুধে সারে না, একটা সাময়িক আরাম হয় মাত্র।'

'তবে হোমিওপ্যাথিক একটা ওষুধ আছে, খালাম্মা, শুরুতেই খেলে আর চোখ ওঠে না।'

'তাই নাকি? নাম জান ওষুধটার?'

'হ্যাঁ, বেলেডোনা-৬।'

'ঠিক আছে পারভেজ। আমি বেলেডোনা-৬ কিনে রাখব। তুমি মেলাঘর ফেরত যাওয়ার আগে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে।'

১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ এস এস সি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। টুটু এ বছরের পরীক্ষার্থী। কিন্তু সে পরীক্ষা দিচ্ছে না। বাঙালি ছেলেমেয়েরা যাতে এস এস সি পরীক্ষা না দেয়, তার জন্য মাসখানেক ধরে বিভিন্ন জায়গায় কোথা থেকে কারা যেন গোপন ইস্তাহার বিলি করে যাচ্ছে— তাই নিয়ে মহল্লায় মহল্লায়, বাড়িতে বাড়িতে উত্তেজনা, আলাপ-আলোচনা, ভয়-ভীতি। পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের বাবা-মার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে- ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিতে গেলে কেন্দ্রে নাকি বোমা মারা হবে।

আজ এস এস সি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। বাঙালি ছেলেমেয়েরা যাতে এস এস সি পরীক্ষা না দেয়, তার জন্য মাসখানেক ধরে বিভিন্ন জায়গায় কোথা থেকে কারা যেন গোপন ইস্তাহার বিলি করে যাচ্ছে— তাই নিয়ে মহল্লায় মহল্লায়, বাড়িতে বাড়িতে উত্তেজনা, আলাপ-আলোচনা, ভয়-ভীতি।

অন্যদিকে, সরকারের তরফ থেকে পরীক্ষা দেওয়ার সপক্ষে প্রচুর ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরে মাইকযোগে বলে বেড়ানো হচ্ছে: ছাত্রছাত্রীরা যেন 'দেশদ্রোহীদের দুরভিসন্ধিমূলক ও মিথ্যা প্রচারণায়' বিভ্রান্ত না হয়, তারা যেন একটি মূল্যবান শিক্ষাবছর নষ্ট না করে। (পাকসেনারা যে গুলি মেরে কত মূল্যবান জীবন নষ্ট ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে সে কথা তাদের মনে নেই।) পূর্ব পাকিস্তান কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লিগের সভাপতি হাশিমুদ্দীন, পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কমিটির সভাপতি ফরিদ আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারি মওলানা নূরুজ্জামান এবং তাদের মতো আরও বহু 'দেশদরদি, জনদরদি নেতা' কদিন ধরে পরীক্ষা দেওয়ার সপক্ষে বিবৃতি দিয়ে দিয়ে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছেন। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তাদেরকে সহায়তা করার জন্য বহুসংখ্যক রাজাকারকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মোড়ে মোড়ে পুলিশ। রাস্তায় রাস্তায় টহল পুলিশের গাড়ি। রাজাকারগুলো এই সুযোগে বেশ প্রাধান্য পেয়ে গেল।

আজ ধলু ও চিশতী সপরিবারে ঢাকা আসছে ইসলামাবাদ থেকে— এক মাসের ছুটিতে। শরীফ গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে গেল পৌনে চারটেয়। জামীকে বাবার কাছে রেখে আমি পাঁচটার সময় মা'র বাসায় গেলাম। ধলুরা এল সোওয়া পাঁচটায়। কতদিন পরে দেখা। দু'বোনে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলাম। মা, লালুও কাঁদলেন। কিন্তু আমার কান্না যেন কিছুতেই থামাতে পারছিলাম না। কেন? ওর মধ্যে কী রুমীর জন্যও কান্না মেশানো ছিল?

১৭ জুলাই শনিবার ১৯৭১

গতকাল সন্ধ্যারও পরে ডাক্তারের ছেলে খোকন আর খোকনের ছোট খালা মঞ্জু এনায়েতপুর থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছে। ডাক্তার পরশুদিনই সকালে রাজশাহী রওনা হয়ে গেছেন। অল্পের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে ওদের দেখা হল না।

আজ সকালে রান্নাঘরে তরকারি কুটতে কুটতে মঞ্জুরের কাছে শুনছিলাম ওর ঢাকা আসার পথের আতঙ্কিত, লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কাহিনি।

মঞ্জুররা এনায়েতপুর থেকে যমুনা নদীর ঘাটে লঞ্চে ওঠে। লঞ্চ সিরাজগঞ্জ ঘাট ছুঁয়ে টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর ঘাটে এসে থামে। এখানে মঞ্জুরের এক দুলাভাই শাজাহান ঢাকা থেকে গাড়ি নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকে গাড়িতে ঢাকা।

লঞ্চে থাকার সময় নদীর বুকে এমন একটা ঘটনা ঘটে, যেটার কথা মনে করে মঞ্জুর এখনও মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে।

'বুঝলেন আপা, সিরাজগঞ্জ ঘাট ছাড়ার পর হঠাৎ একটা আর্মি-ভর্তি স্টিমার আমাদের লঞ্চের পাশ দিয়ে আসতে আসতে চিৎকার করে লঞ্চ থামাতে বলল। আমরা তো ভয়ে কুঁকড়ে এতটুকু। আর বুঝি কারও রক্ষা নেই। কিন্তু ওরা শুধু একজন লোককেই খুঁজছিল। সে হল সিরাজগঞ্জ কওমী জুট মিলের এক ইঞ্জিনিয়ার। তাকেই ধরে নিয়ে গেল। অন্য যাত্রীদের কাউকে কিছু বলল না।'

'তুমি চিনতে ওই ইঞ্জিনিয়ারকে?'

'না আপা, আমি কী করে চিনব? উনাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর লঞ্চের অন্য লোকেরা বলাবলি করছিল— তাই থেকে জানলাম। আমার সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল আর্মিগুলো যেভাবে ওই ভদ্রলোককে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করছিল, তা শুনে। ওরা বলছিল, 'তোমার মতো এরকম মশহুর আদমির এত ছোট লঞ্চে যাওয়া কি মানায়? এই দেখো, তোমার জন্য আমরা কত বড় স্টিমার নিয়ে এসেছি।'

আমার বুক ফেটে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। ওই ইঞ্জিনিয়ারটি নিশ্চয় গোপনে মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। ওর কপাল মন্দ, ব্যাপারটা কোনওভাবে পাক আর্মির কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। ফাঁস করে দেওয়ার মতো দালাল, রাজাকারদের তো অভাব নেই দেশে। নাকি, দেশের কাজ করতে

সঙ্গের ছবিতে ষাটের দশকে তৎকালীন জিন্না অ্যাভেনিউ তথা এখনকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভেনিউ-এর একাংশ

গেলে এভাবে জীবন দিতেই হবে? কপাল মন্দ বলছি কেন? এতো ওই লোকটির জন্য গৌরবের কথা।

গৌরবের কথা?

হঠাৎ মনে হল দম আটকে আসছে। লোহার সাঁড়াশি দিয়ে কেউ যেন পাঁজর চেপে ধরেছে।

আর তরকারি কুটতে পারলাম না। বসার ঘরে এসে ডিভানে শুয়ে পড়লাম, মঞ্জুর ভয় পেয়ে জামীকে ডাকাডাকি করতে লাগল। আমি বললাম, 'ও কিছু না। শরীরটা কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না। খাটনি বেশি হয়ে গেছে। রান্নার লোক নেই তো, তাই। একটু পরে ঠিক হয়ে যাব।'

১৮ জুলাই রবিবার ১৯৭১

শরীফের দাঁতে ভীষণ ব্যথা হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা ওর জন্য পিসপাস রান্না করছিলাম। উসকোখুসকো চুল নিয়ে ফকির এসে হাজির, 'ভাবি, ময়মুরব্বিদের দোয়া ছিল, তাই অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।'

'কী ব্যাপার? কোথায় কি হল?'

'জীবনে এই প্রথম চোখের সামনে গেরিলা অপারেশান দেখলাম।'

'বলেন কী? দাঁড়ান, দাঁড়ান, এক্ষুনি শুরু করবেন না। চুলো থেকে হাঁড়িটা নামিয়ে আসি।'

'বিকেলবেলা জিন্না অ্যাভেনিউতে গিয়েছিলাম একটা কাজে। গ্যানিজের দোকানটা আছে না? ওইখানে কয়েকজন বিচ্ছু গুলি আর গ্রেনেড ছুঁড়ে কয়েকটা পুলিশ মেরে দিয়ে চলে গেল। উঃ, কী সাহস ছেলেগুলোর। একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে, বুঝলেন?'

উত্তেজনায়, আনন্দে ফকিরের চোখ চকচক করছে। সারা মুখ লাল টকটকে। শরীফ দাঁতের ব্যথা ভুলে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, 'আঃ আরেকটু খুলে বলো না। কয়টা ছেলে ছিল? কিসে করে এসেছিল?'

'অত কি শুনেছি? দুটো তো দেখলাম হাতে স্টেনগান বা মেশিনগান ওইরকম কিছু একটা হবে। দোকানের ভেতরে ঢুকে গেল আর ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শুনলাম। একটা গ্রেনেডও ফাটিয়েছে। গাড়ি একটা ছিল বটে, কিন্তু ঠিক গ্যানিজের সামনে তো দেখিনি। সামনে মনে হয় একটা মোটরবাইক ছিল, একটা ছেলেও যেন বসেছিল বাইকটাতে।'

আমি বলে উঠলাম, 'একটা কথা যদি ঠিক করে বলতে পারেন! খালি 'মনে হয়' আর 'যেন!'

জামী বলল, 'মা তুমি কিন্তু চাচার ওপর অবিচার করছ। তখন মেশিনগান থেকে ব্রাশ ফায়ার হচ্ছে, পুলিশ মরছে। রাস্তার লোকজন ছুটে পালাচ্ছিল নিশ্চয়। তাই না চাচা? আপনি তখন কী করলেন? ছুটে পালাননি কোথাও? ফকির সোফায় হেলান দিয়ে বললেন, 'পালিয়েছিলাম তো বটেই। ওরকম অবস্থায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকে গোরস্থানে যাওয়ার জন্য? গ্যানিজের দুটো দোকান পরে সিঁড়িঘর ছিল একটা সেইখানে ঢুকে সিঁড়ির নীচে লুকোই। আমার সঙ্গে আরও অনেকে।'

শরীফ আবার জিজ্ঞেস করল, 'ক'জন লোক মরেছে, জানতে পেরেছ?'

'বিকেলবেলা জিন্না অ্যাভেনিউতে গিয়েছিলাম একটা কাজে। গ্যানিজের দোকানটা আছে না? ওইখানে কয়েকজন বিচ্ছু গুলি আর গ্রেনেড ছুঁড়ে কয়েকটা পুলিশ মেরে দিয়ে চলে গেল। উঃ, কী সাহস ছেলেগুলোর। একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে, বুঝলেন?'

আজ ভয়েস অব আমেরিকার খবর শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ঢাকার রাস্তায় পাকসেনা ও মুক্তবাহিনীর মধ্যে গান-ফাইট। বলে কী? একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ? গুলি বিনিময়? কই আমরা তো ওরকম কিছু টের পেলাম না?

'না, ছেলেগুলো চলে যাবার পর তাড়াতাড়ি ওখান থেকে পালিয়ে আসি। তক্ষুনি তো মিলিটারিতে ভরে যাবে জায়গাটা। তবে আসার সময় দেখলাম গ্যানিজের দরজার সামনে কয়েকটা মিলিশিয়া পড়ে আছে।'

এখন মুখরোচক বিষয়, আলাপ-আলোচনা করতে করতে কোথা দিয়ে দুই ঘণ্টা উড়ে গেল। গেরিলারা আজকাল বে-শ তৎপর হয়ে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে প্রায়-প্রায়ই বোমা ফাটিয়ে যাচ্ছে এত কড়া পাহারা সত্ত্বেও। কী করে করে ওরা? জানের ডর বলে কিছু নেই বোধহয়। 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য?'

রাত প্রায় দশটা। ফকিরসহ আমরা সবাই মিলে শরীফের জন্য রান্নাকরা পিসপাস খেলাম খুব তৃপ্তি করে।

১৯ জুলাই সোমবার ১৯৭১

মালু মিয়া আজ আবার বারেককে নিয়ে এসেছে। এ কদিনের কাজের ঠেলায় আমারও মন নরম হয়ে এসেছে। মালু মিয়ার কাকুতি-মিনতি এবং বারেকের মাফ চাওয়ার পর ওকে আবার ফিরিয়ে নিলাম। কাসেমের অন্য বাসায় চাকরি হয়ে গেছে, বারেকের হয়নি। জামী বলল, 'ভালোই হল। এই দুর্দিনে গ্রামে গিয়ে না খেয়ে মরত।' আমি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ বারেক না এলে তুমিও মরতে দাদার ডিউটি করতে করতে।'

পারভেজ এসেছে সন্ধ্যার পর। ও আগামীকাল রওনা দেবে। আমি আগেই বেলেডোনা-৬ কিনে রেখেছি অনেক কয়টা শিশি, আরও কিনেছি কয়েকটা নেইল কাটার, গোটা তিনেক সানগ্লাস। 'একটা সানগ্লাস, একটা নেইল কাটার রুমীর জন্য। বাকিগুলো তোমরা ব্যবহার করো। বেলেডোনা যখন যার লাগবে।' পারভেজকে দুশো টাকা দিলাম, 'একশো তুমি নিয়ো, একশো রুমীকে দিয়ো।'

এসব কথা বলতে বলতে হঠাৎ গুলিগোলার শব্দে চমকে উঠলাম। পারভেজ বলে উঠল, 'কাছাকাছি কোথাও মনে হচ্ছে?' বলতে না বলতেই বাতি চলে গেল। আমি হেসে বললাম, 'ওই বুঝি শুরু হল। মোমবাতি জ্বালতে জ্বালতে চিন্তা করতে লাগলাম, গুলির শব্দটা ঠিক কোন জায়গা থেকে এল? উত্তর-পূর্বদিক থেকেই তো মনে হচ্ছে। ওদিকে কোথায়? শরীফ বলল, 'কেন পি জি হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তাটায় পুকুরটার এপাশে যে পাওয়ার সাবস্টেশনটা আছে, ওখানে হতে পারে।'

জামী লাফ দিয়ে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ রেললাইন পার হয়েই ওই যে মেইন রোডের বাঁ হাতে উঁচু দেওয়াল আর কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা সাব-স্টেশনটা'— কথার মাঝখানেই জামী হঠাৎ 'ইয়া হু-' বলে এক চিৎকার এবং আরেক লাফ- ওইটাকে ধানমন্ডি সাব-স্টেশন বলে না? মার দিয়া কেল্লা! জয় মুক্তিবাহিনীর গেরিলা।'

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে ধমকে উঠলাম, 'থাম থাম। অত চেঁচাস নে। কে কোথায় শুনে ফেলবে।'

পারভেজ উশখুশ করে বলল, 'আমাকে এবার যেতে হয়।'

'আরেকটু পরে যাও। রাস্তায় অন্ধকারে কোথায় বিপদ ওত পেতে আছে কে জানে?'

'না, অন্ধকারেই বরং সুবিধে। গুলির শব্দ তো শাহবাগের দিক থেকে এসেছে, আমি নিউ মার্কেটের দিকে দিয়ে চলে যাই। কিছু হবে না খালাম্মা। এর চেয়ে ঢের বেশি ঝুঁকি নিয়ে আমরা চলাফেরা করি।'

ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ বাতি জ্বলে উঠল। মনটা দমে গেল, এত তাড়াতাড়ি সব ঠিক করে ফেলল? তবে ভোল্টেজ খুবই কম, এত কম যে মোমবাতি জ্বেলে বাকি কাজ সেরে শোবার ঘরে গিয়ে রেডিও নিয়ে বসলাম। একটু পরেই ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা অনুষ্ঠান শুরু হবে। আজকাল রেডিওতে ব্যাটারিই ব্যবহার করি সব সময়। কারণ কখন কোন জায়গায় বসে রেডিও শুনব, তার ঠিক নেই। বাড়ির সর্বত্র ইলেক্ট্রিক তার বয়ে বেড়ানো সম্ভব না। আর এখন তো কারেন্টই নেই।

আজ ভয়েস অব আমেরিকার খবর শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ঢাকার রাস্তায় পাকসেনা ও মুক্তবাহিনীর মধ্যে গান-ফাইট। বলে কী? একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ? গুলি বিনিময়? কই আমরা তো ওরকম কিছু টের পেলাম না? গুলি গোলার শব্দ শুনেছি বটে তবে দু'দলে একেবারে গান-ফাইট হওয়ার মতো অত সাংঘাতিক বলে মনে হয়েছে কি?

জামী বলল, 'কী জানি হয়তো এখানে

সামান্য হয়েছে, ঢাকার অন্য এলাকায় বেশি হয়েছে। আমরা বাড়ি বসে সেটা টের পাচ্ছি না।'

শরীফ বলল, 'আপাতত চারদিক বেশ শুনশানই মনে হচ্ছে। এটুকু ঠিক যে এখন অন্তত কোনও গান-ফাইট হচ্ছে না। এখন শোয়া যাক। কাল খবর নেব কোথায় কী হল।'

আমি বললাম, 'ভোয়া বি বি সি-র বরাত দিয়ে বলল। বি বি সি-তে আগেই বলেছে নাকি? আজ আমাদের বি বি সি শোনা হয়নি। কিন্তু বি বি সি-র বাংলা অনুষ্ঠান তো পৌনে আটটা থেকে সোয়া আটটা। ঘটনাটা তো ওইরকম সময়েই ঘটেছে। তাহলে?'

শরীফ বলল, 'কেন বি বি সি ইংরিজি খবরেও তো দিতে পারে। বি বি সি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইংরিজি খবর বলে না? দেখি কাল খোঁজ নেব আর কেউ শুনেছে কি না।'

রাতে ভালো ঘুম হল না। উত্তেজনায় সারা শরীর-মন চনমন করছে। গুজব সত্যি হতে চলেছে নাকি? রাজধানী ঢাকা শহরে ইলেক্ট্রিসিটি থাকবে না। কিন্তু কাল দিনের আগে জানবার কোনও উপায় নেই।

২০ জুলাই মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ সকাল থেকে পানি নেই। গত রাতে কারেন্ট না থাকার দরুন মিউনিসিপ্যালিটির পাম্প চালানো সম্ভব হয়নি— সেটা বোঝাই যাচ্ছে। বারেককে একটা ছোট বালতি হাতে ডাক্তারের বাসায় টিউবওয়েল থেকে পানি আনতে পাঠালাম। নীচের বাথরুমে দুটো বড় বালতি, রান্নাঘরে কয়েকটা ডেকচি ভর্তি করে নিলাম। ট্যাপে পানি না আসা পর্যন্ত কোনওমতে রাঁধাবাড়া আর হাত-মুখ ধোয়ার কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

শরীফ অফিসে গিয়েই ফোন করেছে, 'শোনো, জামীকে পি জি'র দিকে রাস্তায় যেতে বারণ করো। ধানমন্ডি পাওয়ার সাব-স্টেশনের সামনে আর চারপাশে মেলাই মিলিটারি। পুরো জায়গাটা কর্ডন করে রেখেছে। রেললাইনের কাছ থেকে সব ট্রাফিক ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আমি তো গাড়ি ঘুরিয়ে আবার আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে গিয়ে বলাকা-নীলখেত হয়ে অফিসে এসেছি।'

'আর কোনও খবর।'

'এখনও জানি না। জানলেই ফোন করব।'

ধলু আর চিশতী এসেছে সাড়ে নটার দিকে। রাজশাহীতে ট্রাঙ্কল করবে। লাইন পেতে পেতে এগারোটা বাজল। অনেকক্ষণ গল্প করা গেল ওদের সঙ্গে।

পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ লোকেরা নাকি জানে না যে পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারিরা এত খুন-খারাবি করেছে। সরকারি প্রচার মাধ্যমের চমৎকার ব্যবস্থাপনার ফলে তারা

গেরিলারা ওই দুটো পাওয়ার স্টেশনের ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দিয়ে ঠিকমতো ভেগে গেছে। খানসেনারা একটাকেও ধরতে পারেনি। তবে বিস্ফোরণের পর থেকে ওই দুই এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়েছে। ধরপাকড়, বাড়ি বাড়ি তল্লাশি

জানে যে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয়রা হামলা করছে, দেশের ভেতরের কিছু 'গাদ্দার বাঙালি' তাদেরকে সাহায্য করছে, সেই জন্য পাকিস্তান আর্মি ভারতীয় দমন আর হিন্দু মারার কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

'বুবু, জানেন তো পশ্চিম পাকিস্তানিরা কী ভয়ানক রকম অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান। এটা আরও বেড়েছে' ৬৫ সালের ইন্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধের পর থেকে। ইয়াহিয়া সরকার এই সেন্টিমেন্টটার সুযোগ নিয়ে এমন নির্লজ্জের মতো মিথ্যে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে যে কি বলব! তাছাড়া ওদিককার জনসাধারণও এমন কট্টর পাকিস্তানপ্রেমিক যে, সরকার যা বোঝাচ্ছে, নির্বিচারে তাই বুঝে নিশ্চিন্তে দিন-গুজরান করছে।'

'ও দিকের লোকেরা কি বি বি সি, ভয়েস অব আমেরিকা, রেডিও অস্ট্রেলিয়া এসব শোনে না?'

'শোনে, কিন্তু বিশ্বাস করে না। ওরা সরকারের ছেলে ভুলানো ছড়া শুনেই সন্তুষ্ট।'

শরীফ আবার ফোন করল এগারোটার দিকে, 'কাল রাতে উলান আর গুলবাগ পাওয়ার স্টেশনে 'শর্ট সার্কিট' হয়েছে।'

'আর শাহবাগে?'

'না, ওখানে ঠিকমতো হয়নি।'

'উলান কোথায়? গুলবাগ?'

'উলান রামপুরার দিকে। গুলবাগ-খিলগাঁওয়ে। আরেকটা খবর: পরশু বিকেলে শুধু গ্যানিজে নয়। ভোগ-এও।'

'তাই নাকি? বাঃ বেশ তো। একই দল নাকি?'

'ঠিক জানি না। কেউ বলতে পারল না।'

'শোনো, বাসায় ফেরার পথে আজই লো-ডাউন কিনে নিয়ে এসো। কমোড ব্যবহার করা যাচ্ছে না তো। বালতি দিয়ে পানি ঢাললে ঠিকমতো ফ্লাশ হয় না।'

'আনব। তুমি আহাদ মিস্ত্রিকে বিকেলে আসতে বলে দাও।'

চিশতীকে বললাম, 'তোমরা বাড়ি ফেরার পথে দুটো হারিকেন আর কিছু মোমবাতি কিনে নিয়ে যাও।'

লুলু এল একটার দিকে। বলল, 'কী কাণ্ড জানেন মামি? ধানমন্ডি পনেরো নম্বর রোডে কাল রাতে কারা যেন একটা মোটরগাড়ি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। আজ ভোরে ওখানে লোকে লোকারণ্য। কিন্তু মজা কি জানেন? যেই সূর্য উঠল, অমনি লোকজন সব ফরসা!'

'কেন?'

'সূর্য ওঠার পরে মিলিটারি আসবে। মিলিটারিরা তো বিচ্ছুদের ভয়ে নিজেই নিজেদের কারফিউ দিয়ে রাখে সারারাত!'

'তুই না আজিমপুর রোডে থাকিস। তুই ধানমন্ডি পনেরো নম্বর রোডের খবর জানলি কী করে?'

'বারে, আমি রোজ ভোরে মর্নিং ওয়াক করতে বেরোই না?'

'লুলু, তুই কি উলান গুলবাগের কথা শুনেছিস আজ কারও মুখে? আর আমাদের পাড়ার ঘটনা?'

লুলু, অবাক হয়ে বলল, 'না তো। কেন কী হয়েছে?'

লুলুকে সংক্ষেপে বললাম, গতকাল রাতের ঘটনা আর সকালে শরীফের ফোনের কথা। 'তোর মামা এলে সব বিস্তারিত শোনা যাবে। বস। খেয়ে যাবি।'

আড়াইটে বেজে গেছে। শরীফ এখনও আসছে না। ছটফট করছি। ও এলে তবেই শোনা যাবে উলান-গুলবাগে ঘটনার পুরো বিবরণ। ফোনে খোলাখুলি কথা বলা বিপজ্জনক। তাই 'শর্ট সার্কিট' শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

শরীফ এসে বলল, গেরিলারা ওই দুটো পাওয়ার স্টেশনের ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দিয়ে ঠিকমতো ভেগে গেছে। খানসেনারা একটাকেও ধরতে পারেনি। তবে বিস্ফোরণের পর থেকে ওই দুই এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়েছে। ধরপাকড়, বাড়ি বাড়ি তল্লাশি, রামপুরা আর খিলগাঁও এলাকা নাকি খানসেনা দিয়ে গিজগিজ করছে। ওদিকে রাস্তা দিয়ে হাঁটাও নাকি বিপজ্জনক।

আমার ভয় হল, ধানমন্ডি সাব-স্টেশনের দরুন মিলিটারি হামলা আমাদের বাড়ি পর্যন্ত গড়াবে না তো আবার? শরীফ বলল, 'মনে হয় না। আমাদের বাড়ি ও জায়গা থেকে বেশ দূরে— গলির ভেতরে। ওরা সাব-স্টেশনের

চারপাশটা ঘিরে তল্লাশি করছে। ওখানে বিচ্ছুরা ভেতরে যন্ত্রপাতি বিশেষ নষ্ট করতে না পারলেও পুলিশ বেশ কয়টা মেরে দিয়ে গেছে।'

শরীফ তিনটে লো-ডাউন কিনে এনেছে। আহাদ মিস্ত্রি কাজে লেগে গেছে। অন্তত একটা লো-ডাউন আজকের মধ্যে লাগাতেই হবে। প্রথমে দোতলায় বাবার বাথরুমটায় কাজ শুরু হয়েছে। আহাদ এ পাড়ারই লোক, দরকার হলে ও রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করতে পারবে।

ডাক্তারের টিউবওয়েলটা খুব মোক্ষম সময়ে বসানো হয়েছিল। আজ বড্ড কাজে লাগল। আমি তো সকালেই পানি আনিয়ে সেরেছি। বিকেলে দেখি, সব বাড়ি থেকে কলসি, বালতি, জগ সারে সারে চলছে ডাক্তারের বাড়ির দিকে।

দিনেরবেলা ডোমেস্টিক অর্থাৎ লাইট ফ্যানের লাইনে দু'একবার কারেন্ট এসেছিল অল্পক্ষণের জন্য। পাওয়ার লাইন একেবারেই ছিল না। সন্ধ্যার পর সব লাইন চলে গেল। সারা ঢাকা শহর নিকষ কালো।

বিকেলেই তাড়াহুড়ো করে চারটে হারিকেন কিনে আনা হয়েছে। দোকানে শরীফ আর জামী গিয়েছিল। এসে বলল, 'হারিকেন আর মোমবাতি কেনার জন্য দোকানে যা ভিড়! সবাই কিনছে। দোকানিরা এই সুযোগে দামও বাড়িয়ে দিয়েছে।'

২২ জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯৭১

দুপুরে খেয়ে একটু শুয়েছিলাম। কলিং বেলের শব্দে উঠে দরজা খুলে দেখি, মনু।

'উঃ খালাম্মা, গোটা শহর পানির তলায় ডুবে গেছে। এমন বৃষ্টি দেখিনি।'

'আমাদের ঘরের ভেতরেও তো পানি ঢুকেছিল। মেঝের ওপর এক ফুট। রাস্তায় ছিল কোমর সমান। এই তো ঘণ্টাদুয়েক আগে রাস্তার পানি নেমেছে।'

মনু ঘরের চারদিকে এলোমেলো জিনিসপত্রের দিকে তাকাল, 'তাই? ভালোই হয়েছে খালাম্মা। এইরকম বৃষ্টিতে খানসেনারা খুব বেকায়দায় পড়ে গেছে। একে তো ওরা এইরকম বড় বড় নদী, বিল, হাওড়, দেখেইনি, তার ওপর এইরকম একনাগাড়ে তোড়ে বৃষ্টি। ঢাকা শহরে রাস্তায় এক-কোমর পানি। ওদের দেশে তো ড্রেনের মতো খালে এক হাঁটু পানি জমলে ওরা ডুবে মরে!'

সবাই মিলে খুব হাসলাম। তারপর আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'এখন থেকে একটু বেশি সাবধানে থেকো মনু। গভর্নমেন্ট তো রাজাকারদের অনেক ক্ষমতা দিয়ে দিল। সামরিক আইন আদেশ-১৫৯ জারি করে ওদেরকে ইচ্ছেমতো গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদেরকে পাইকারি হারে অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে। সন্দেহ হলেই যে-কোনও লোককে ওরা গ্রেপ্তার করতে পারবে। গুলি করতে পারবে।'

পাকিস্তান সরকার এখন বেশ ঘাবড়ে গেছে। ঢাকা শহরে রোজই দিনে-রাতে বিচ্ছুরা একটা-না-একটা কিছু করেই যাচ্ছে। তাছাড়া সারাদেশের বর্ডার জুড়ে যুদ্ধও তো বেশ জোরেশোরে চলছে। কিছু কিছু বর্ডার এলাকা মুক্তও হয়ে গেছে।

শরীফ একটু হেসে বলল, 'এসব ক্ষমতা রাজাকারদের প্রথম থেকেই দেওয়া ছিল। এখন একটা সামরিক আইন আদেশের ঘোষণা দিয়ে হালাল করে নিল বলতে পারো।'

মনু বলল, 'পাকিস্তান সরকার এখন বেশ ঘাবড়ে গেছে। ঢাকা শহরে রোজই দিনে-রাতে বিচ্ছুরা একটা-না-একটা কিছু করেই যাচ্ছে। তাছাড়া সারাদেশের বর্ডার জুড়ে যুদ্ধও তো বেশ জোরেশোরে চলছে। কিছু কিছু বর্ডার এলাকা মুক্তও হয়ে গেছে। কাজেই সরকার এখন শুধু রাজাকার কেন, আরও যদি কিছু বাহিনী বানাতে পারে, তাও বানাবে।'

'কেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রচুর পরিমাণে মিলিশিয়া আনছে না? ওই যে কালচে ছাই রঙের সালোয়ার-কামিজ পরা সৈন্যগুলো?'

'হ্যাঁ, ওগুলোয় তো সারাদেশ ছেয়ে গেছে।'

মনু আসাতে একটু ভালো লাগল। কিছুদিন থেকে মনটা কোনওমতেই বাগে থাকছে না। সবসময় মন খারাপ, একটু কিছু হলেই লুকিয়ে বা প্রকাশ্যে কান্না, যখন-তখন পাঁজরে ব্যথা। কিছুদিন থেকে আরেকটা কথা সবসময় মনে জাগছে : 'অন্য ছেলেরা প্রায়-প্রায়ই ঢাকা আসছে কত রকমের ডিউটি নিয়ে। রুমী কি একবার আসতে পারে না?'

মনু বলল, 'আসবে, খালাম্মা আসবে। ওর ট্রেনিং হয়তো এখনও শেষ হয়নি। ওতো অনেক দেরিতে গেছে।'

তা বটে। রুমীর যাওয়াতে আমিই তো বাদ সেধেছি প্রথম দিকে।

মনু আগামীকাল ফিরে যাবে। ওর হাতে দুশো টাকা দিলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের এখন টাকার খুব দরকার। যখন যার হাতে পারছি পাঠাচ্ছি। পারভেজ নিয়ে গেছে। টাট্টুর সঙ্গে দু'বারে দুশো পাঠিয়েছি। টাট্টুর মাধ্যমে পরিচয় হয়েছে রাজু বলে এক মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে। তার হাতেও কয়েকবার দুশো-পাঁচশো করে টাকা পাঠিয়েছি। আমাদের নিজেদের টাকা বেশি নেই। কিন্তু আল্লাই টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শরীফের অনেক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু, পাকিস্তান কনসালট্যান্টস-এর ডিরেক্টর মজিদ সাহেব শরীফকে বলেছেন : তাঁর দুটি মাত্র মেয়ে, বিয়ে-শাদি হয়ে তারা বিদেশে আছে। তাদের জন্য তিনি যথেষ্ট দিয়ে দিয়েছেন। এখন কিছু টাকা তিনি দেশের জন্য খরচ করতে চান। মজিদ সাহেব স্থির করেছেন, দশ হাজার টাকা তিনি মুক্তিযুদ্ধের জন্য খরচ করবেন। কিন্তু তার কোনও সোর্স নেই পাঠাবার। তাই শরীফকেই অনুরোধ করেছেন। তিনি সেভিংস সার্টিফিকেট ভাঙিয়ে দু'বারে পাঁচ হাজার করে দশ হাজার টাকা শরীফের হাতে তুলে দিয়েছেন। শরীফ এ টাকা ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু করে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধার হাত দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা নিয়েছে। ছেলেরাও একসঙ্গে বেশি টাকা সঙ্গে নেবার ঝুঁকি নিতে চায় না। তার চেয়ে যখনই আসবে, অল্প অল্প করে নিয়ে যাবে।

মজিদ সাহেব শরীফকে একটি শর্ত দিয়েছেন : তাঁর এ টাকা দেওয়ার কথা কাউকে ঘুণাক্ষরেও বলা চলবে না। শুধু তিনি আর শরীফ জানবেন। শরীফ রাজি হয়েছে। শরীফ অবশ্য আমাকে বলেছে। তবে নিজের অর্ধাঙ্গিনীকে বলাটা বোধহয় শর্তভঙ্গের মধ্যে পড়ে না।

তিনটে বাথরুমে লো-ডাউন লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। আহাদ মিস্ত্রি আজ থেকে ভেতরের উঠোনে টিউবওয়েল বসাচ্ছে।

২৪ জুলাই শনিবার ১৯৭১

আজ আহাদ মিস্ত্রি টিউবওয়েল বসানো শেষ করল, আর আজই দুপুর থেকে ডাইরেক্ট ট্যাপটাতে চিরচির করে একটু একটু পানি আসা শুরু হল। বিকেলের মধ্যে পাওয়ার লাইন ঠিক হয়ে গেল।

লাইট পানি আসাতে খুব আরাম লাগছে বটে কিন্তু মনে মনে কোথায় যেন একটা আশাভঙ্গের খচখচানি। ঢাকার মতো জায়গায় কারেন্ট থাকবে না, বিজলিবাতি জ্বলবে না, ট্যাপের পানি পাওয়া যাবে না, হারিকেন জ্বালিয়ে রাতে কাজ চালাতে হবে, টিউবওয়েল টিপে পানি নিতে হবে— এইরকম পরিস্থিতির সম্ভাবনায় মনটা কি ২৫/৩০ বছর আগের শৈশবকালে ফিরে যাবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল?

ক'দিনের এলোপাথাড়ি খাটুনিতে শরীরটা বড্ড কাহিল হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে। কাজের

ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে শুয়ে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে। ড্রয়িংরুমের ডিভানটায় শোয়া যায় বটে কিন্তু মেহমান থাকলে তা আর সম্ভব হয় না। তাই আজ ডাইনিং টেবিল আর সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় উত্তরের দেয়াল ঘেঁষে একটা ছোট চৌকি পেতে ফেললাম। তোষক বিছিয়ে সুন্দর একটি ফুলতোলা বেডকভার দিয়ে ঢেকে দিলাম। এইবার ঠিক হয়েছে। বাইরের ঘরে মেহমান থাকলেও আমি রান্না করার ফাঁকে ফাঁকে এখানে শুয়ে বিশ্রাম করতে পারব। এটার পায়ের দিকে সিঁড়ির পাশে পুব ঘেঁষে দুটো সোফাও রাখলাম। মনু, দুলু, পারভেজ, রাজু, টাট্টু, এরা আজকাল প্রায়-প্রায় আসে। আজকাল এ পাশেই বসাই যাতে বাইরের ঘরে হঠাৎ কেউ এসে ওদের না দেখে। কিছুদিন আগে একদিন পারভেজ জিজ্ঞেস করছিল: 'খালাম্মা, দুটো বাড়ির পরের বাড়িটার একটা ছেলে দেখি যখনই যাই বা আসি, আমাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে। আমি রুমীর কে হই, রুমী কোথায় গেছে— এই সব কথা।'

ওই শোনার পর থেকে পারভেজ, মনু, জিয়া, রাজু সবাইকে বলে দিয়েছি— কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন বলে ওরা রুমীর চাচাতো ভাই।

মাসুম সেই মার্চে দেশে গিয়েছিল। আজ সন্ধ্যার পর হঠাৎ দেখি সে এসে হাজির বাড়ি থেকে। ওকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠলাম। বাড়িটা বড্ড খালি হয়ে গিয়েছিল।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমার বিশ্রামের চৌকিটাতে আরাম করে শুয়ে বললাম, 'এবার বলো দেশের খবর। ২৫ মার্চের পর খাটুরিয়া, ডোমার— ওদিকে কী হয়েছিল?'

খাটুরিয়া আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রাম, ডোমার— থানা।

মাসুম বলল, '২৫/২৬ মার্চ চিলাহাটি থেকে এক দল ই. পি. আর. খাটুরিয়ার ওপর দিয়ে সৈয়দপুরের দিকে মার্চ করে যায়।'

'কেন?'

'সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করবে বলে। খাটুরিয়ায় কয়েকটা বাঙ্কারও তৈরি করেছিল ওরা।'

'বাঙ্কার কেন?'

'ওদের কাছে যা শুনেছিলাম— চিলাহাটি থেকে শুরু করে মাঝে মাঝেই ওরা বাঙ্কার বানাতে বানাতে আসছিল। যদি পরে সেরকম যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে যাতে সুবিধা হয় সেজন্য।'

'যুদ্ধ হয়েছিল?'

ওই দলটা সৈয়দপুর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। মাঝপথে দারোয়ানীতে পাক আর্মি যুদ্ধ করে হটিয়ে দেয় ওদের। দু'দিন পরে ওরা খাটুরিয়ার ওপর দিয়েই আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।'

'নীলফামারীর খবর জানিস কিছু?'

নীলফামারী মহকুমার দূরত্ব খাটুরিয়া থেকে বেশি নয়। আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন নীলফামারীতে থাকেন। মাসুম বলল, 'ছয় এপ্রিল পর্যন্ত নীলফামারী মুক্ত ছিল। সাত তারিখে সকালে পাক আর্মি যুদ্ধ করে মুক্তিবাহিনীকে হটিয়ে দেয়।' জামী বলল, 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ মা? ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের আর সব জায়গাতেই কিন্তু প্রথম কিছুদিন মুক্তিযোদ্ধারাই দখল নিয়েছিল। বাংলাদেশের সবগুলো জেলা সদরে প্রথম দিকে পাক আর্মি ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে ছিল। তারপর তারা বেরিয়ে যুদ্ধ করে মুক্তিবাহিনীকে হটিয়েছে। তারপর তারা জ্বালাও-পোড়াও করতে পেরেছে। তার আগে নয়।'

মাসুম বলল, 'আমরা তো ২৬ মার্চই আকাশবাণী, বি বি সি, ভয়েস অব আমেরিকা শুনে ভেবেছিলাম ঢাকা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

আসলেও প্রায় তাই হয়েছিল। ঢাকায় যত বস্তি, যত বাজার, যত কাঁচা বাড়িঘর, সব পুড়িয়ে দিয়েছিল। নেহাৎ বিল্ডিং পুড়িয়ে ছাই করা যায় না, তাই গোলা মেরে মেরে যতটা পেরেছিল ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, শহীদ মিনার চুরমার করে দিয়েছিল। শহীদ মিনার এখনও ওইভাবে আছে। ওখানে 'মসজিদ' লেখা একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে। ঢাকার রাস্তায় ট্যাঙ্ক নামিয়েছিল।' জামী বলল, 'মাসুম ভাই, রমনা রেসকোর্সের কালীমন্দিরটা কিন্তু নেই— ওটা গোলা দিয়ে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে ওখানকার মাটিটা পর্যন্ত সমান করে দিয়েছে।'

আমি বললাম, 'তুই আরও আগে ঢাকা এলে পারতিস।'

'কী করব। বাবা কিছুতেই আসতে দেবেন না। ওদিকে তখন গুজব— ঢাকার মিরপুর-মোহাম্মদপুরে বাস-কোচ থেকে বাঙালিদের নামিয়ে মেরে ফেলে। এখন আবার ওদিকে নতুন উপদ্রব শুরু হয়েছে। সৈয়দপুরে এয়ারপোর্ট তৈরি হচ্ছে। তাতে চারপাশের এলাকা থেকে লোক ধরে এনে এয়ারপোর্ট তৈরির কাজে লাগানো হচ্ছে। ওদিককার সব ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের ওপর হুকুম হয়েছে— নিজ নিজ এলাকার গ্রামগুলো থেকে প্রতিদিন নির্দিষ্টসংখ্যক লোক পাঠাতে হবে। মাটিকাটা থেকে শুরু করে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং বানানো, রানওয়ে তৈরি সমস্ত কাজই ওইসব লোকদের দিয়ে বিনা মজুরিতে করানো শুরু হয়েছে। পুরো অঞ্চলে একেবারে হাহাকার পড়ে গেছে। প্রত্যেক চেয়ারম্যান গ্রামভিত্তিক নির্দিষ্টসংখ্যক লোক পাঠাতে বাধ্য। কোনও গ্রামে কামলা-মজুর সব পাওয়া না গেলে

জামী বলল, 'মাসুম ভাই, রমনা রেসকোর্সের কালীমন্দিরটা কিন্তু নেই— ওটা গোলা দিয়ে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে ওখানকার মাটিটা পর্যন্ত সমান করে দিয়েছে।'

সঙ্গের ছবিতে রমনা রেসকোর্স ও দূরের সোজাসুজি মন্দির দেখা যাচ্ছে

পরশু মাঝরাতে কয়েকজন বিচ্ছু পথের ওপর কয়েকটা ছোট সাইজের মাইন বসিয়ে দেয় কোনও এক ফাঁকে। তাতে দুটো খানসেনা-ভর্তি লরি উল্টে রাস্তার পাশের ঢালু জমিতে পড়ে যায়।

শিক্ষিত, সচ্ছল লোকদের মধ্য থেকে নিয়ে হিসেব পুরো করে দিতে হচ্ছে। এর মধ্যে কোনও ছাড়াছাড়ি নেই। যে এলাকা থেকে যতগুলো মজুর পাঠাবার কথা, ঠিক ততগুলো পাঠাতেই হবে। তাতে যদি গ্রামের মোড়লকে বা তার ছেলেকে বা অন্য কোনও শিক্ষিত লোককে নিতে হয়, তাহলে তা-ই নিতে হবে। এইবার বাবা একটু ভয়ে পেয়েছেন বলে ঢাকা আসতে দিলেন।'

'রাস্তায় কীরকম ভোগান্তি হল? পৌঁছতে এত দেরি হল যে?'

'দেরি হওয়ার কারণ অনেক জায়গায় ব্রিজ নষ্ট। মুক্তিবাহিনী উড়িয়ে দিয়েছে। এক বাস ছেড়ে নৌকোয় নদী পেরিয়ে অন্য বাস ধরা, বাসে ওঠার সময় আবার চেকিং। ঢাকা ঢোকার আগে থেকে আরও কড়া চেকিং— বাস থেকে নামিয়ে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে বডি চেক করা— জিনিসপত্র সব নামিয়ে তন্নতন্ন করে চেক করা— প্রতিটি চেকপোস্টে একই ব্যাপার। শেষপর্যন্ত যে এসে পৌঁছেছি এতেই আল্লার কাছে হাজার শুকুর।'

জামী বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল, 'মনে হল যেন বেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ আসিতে ঢাকার দ্বারে।' (জামী শৈশবকালে কিছুদিন বাফায় গান শিখেছিল!)

২৫ জুলাই রবিবার ১৯৭১

সকালে নাশতা খাওয়ার সময় বললাম, 'অনেক দিন আতাভাইয়ের বাড়ি যাওয়া হয়নি। মাসুম এসেছে, চল ওকে নিয়ে যাই।'

শরীফ বলল, 'ওই সঙ্গে ফকিরের বাসাও ঘুরে আসব। ওকে ফোন করে দাওতো, যেন বেরিয়ে না যায়।'

আতাভাই নারিন্দায় থাকেন, ফকির লারমিনি স্ট্রিটে।

ফোন করতেই ফকির বললেন, 'আজকে এদিকে না আসাই ভালো। কাল সারারাত ধরে যাত্রাবাড়ির ওদিকটায় গোলাগুলি চলেছে। সকাল হতে হাটখোলার মোড় থেকে যাত্রাবাড়ি-ডেমরা ওই এলাকায় কারফিউ দিয়ে রেখেছে।'

'তাই নাকি? কী বৃত্তান্ত— কিছু জানতে পেরেছেন?'

'না, এখন বৃত্তান্ত জানতে বেরোনো খুব নিরাপদ হবে না। যাত্রবাড়ি-ডেমরা এলাকায় বহুত ধরপাকড়, মারধর হচ্ছে। আমরা তো পাশেই— আমি অবশ্য ইচ্ছে করলে নবাবপুর রোডের দিক দিয়ে বেরোতে পারি কিন্তু আমার বউ বলছে, কি দরকার! অন্তত একটা ছুটির দিন বউ-বাচ্চা নিয়ে বাড়িতে আরাম করলে হয় না?'

'করুন। আমরাও তাহলে তাই করি।'

আতাভাইকেও ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম, 'রাতে গোলাগুলির শব্দ শুনেছেন?'

উনি বললেন, 'শুনেছি প্রচুর। আমরা তো ভয় পেয়ে গেছিলাম— শেষপর্যন্ত আমাদের পাড়াতেও শুরু হল কিনা। কিন্তু ওইদিকে আর আসেনি।'

'গোলাগুলি কোনদিকে হয়েছে বলে মনে হয়?'

'শব্দটা তো যাত্রাবাড়ির দিক থেকেই এসেছে, মনে হয়। হাটখোলার মোড় থেকে ওইদিকে তো কারফিউ আজ।'

মনটা খুব চনমন করতে লাগল।

যাত্রাবাড়ির দিকে সারারাত গোলাগুলি। না জানি কী যুদ্ধ হয়েছে। কার কাছে, কেমন করে ঘটনার বিবরণ পাই?

২৬ জুলাই সোমবার ১৯৭১

যাত্রাবাড়ির ঘটনা নিয়ে সারা শহরে তুমুল হইচই। কাল থেকে কতজনের মুখে যে কতবার একই বৃত্তান্ত শুনলাম, তার হিসাব নেই। আমাদের সকলের আনন্দ আর উত্তেজনার আরও একটা বড় কারণ— সারারাত ধরে গুলিগোলাটা দুই দল খানসেনার মধ্যেই হয়েছে।

আসল ব্যাপারটা হল এই: যাত্রাবাড়ির রাস্তা দিয়ে সারারাত ধরে মিলিটারি ভর্তি বড় বড় লরি যাতায়াত করে। ওদের যাতায়াতের সুবিধের জন্য রাত দশটার পর ওই রাস্তা দিয়ে অন্য সব গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকে। পরশু মাঝরাতে কয়েকজন বিচ্ছু পথের ওপর কয়েকটা ছোট সাইজের মাইন বসিয়ে দেয় কোনও এক ফাঁকে। তাতে দুটো খানসেনা-ভর্তি লরি উল্টে রাস্তার পাশের ঢালু জমিতে পড়ে যায়। রাতের অন্ধকারে শব্দ ও চিল্লাচিল্লি শুনে যাত্রাবাড়ি চেকপোস্ট থেকে পাক আর্মি ভাবে, ওখানে নিশ্চয় গেরিলারা কিছু করছে। অমনি তারা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। তা শুনে খাদে-পড়া পাকসেনারা মনে করে ওগুলো 'মুক্তিদের' গুলি। তারাও তখন গুলি করা শুরু করে। এমনিভাবে খানসেনারা অমাবস্যার ঘোর-কালো রাতের অন্ধকারে 'মুক্তি' ভেবে নিজেদের মধ্যেই—

আমরা যত শুনি, তত হাসি। কাগজে ভিয়েতনাম যুদ্ধের খবর প্রসঙ্গে মাঝেমাঝেই 'সেমসাইড' কথাটা পড়েছি। এবার ঢাকাতেই সেমসাইড হল।

ক্রমশ

আমার ছবি জীবন

শুভাপ্রসন্ন

৭

“ক্যালকাটা পেইন্টার্সে একমাত্র কর্মী যিনি অত্যন্ত পরিশ্রমে, ভালোবাসায় এই সংগঠনকে চালু রেখেছিলেন, তিনি রবীন মণ্ডল। আমি তাঁর এক সময়ের ছায়াসঙ্গী ছিলাম। প্রায় প্রতিদিন কয়লাঘাটে রেলের অফিসে চলে যেতাম। ব্যাংকশাল কোর্টের পাশে বিশাল অট্টালিকা, লাল ইটে ওয়্যারহাউস স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন ওই বাড়িটি। তার দীর্ঘতম বারান্দাটি ইটালিয়ান সেরামিক টাইলে গাঁথা। আজও আমার কাছে তার বর্ণ-গন্ধ অমলিন। সেই রবীনদাকে নিয়েই আমার উচ্চাশা, স্বপ্ন, আর ভবিষ্যতের রাস্তা পাড়ি দেওয়া। ক্যালকাটা পেইন্টার্সের গোটা প্রদর্শনীর জন্য পই পই করে তাঁর সঙ্গে ঘুরেছি নানা কারণে। রবীনদা প্রথম আমায় দিল্লি চিনিয়েছেন, বম্বে চিনিয়েছেন। আমার চেয়ে কমপক্ষে ষোলো বছরের বড় উনি। ক্যালকাটা পেইন্টার্স নামক সংস্থাটি যদি সংগঠন হিসেবে ভারতবর্ষের শিল্পকলার আন্দোলনের ইতিহাসে কিছুমাত্র স্থান পায় তার কৃতিত্ব একমাত্র রবীন মণ্ডলের।”

আমাদের গ্রুপটার নাম ছিল ‘সোসাইটি ফর আর্টস অ্যান্ড আর্টিস্টস’। জহর মঞ্জু, পূরবী, প্রবীর, রবীন আর কার্তিকদা। মূলত, এই কজন মিলে আমাদের গ্রুপ। দুয়েকজন আরও আনাগোনা করত, কার্তিকদা আমাদের চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়। কিন্তু আমরা বন্ধু ছিলাম।

রাইটার্সে চাকরি করতেন। আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে আমাদের গ্রুপ শো হল খুব বড় করে। মন-প্রাণ দিয়ে আঁকা ছবিগুলি সাজিয়ে। সেই বোধহয় আমাদের প্রথম স্বাধীন প্রদর্শনী। সফল হল। সেখান থেকে আমার দুটো ছবি কিনে নিল ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট। শক্ত বোর্ডের ওপর ট্রেসিং পেপার অ্যারারুটের আঠায় একটু তুঁতে মিশিয়ে লেপটে দিতাম। তারপর সরু নিবে চাইনিজ ইঙ্কে কাটাকুটি করে একধরণের প্রাচীন মানুষের ছবি আঁকতাম। শেষ করতাম স্বচ্ছ তেল রং নিয়ে। এই প্রদর্শনীতে এসেছিলেন প্রকাশ কর্মকার, রবীন মণ্ডল। তখন এঁদের খুব নামডাক। প্রকাশদাকে দেখতেও খুব সুন্দর। চাপ দাড়ি, ফরসা গায়ের রং, বলিষ্ঠ চেহারা, সদ্য প্যারিস থেকে ফেরা। আমাদের কাছে তখন আইকনের মতো। আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, কী করছিস এখানে, চলে আয় আমাদের দলে। আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম। আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম আগের দল থেকে। ক্যালকাটা পেইন্টার্সে যোগ

দেওয়ার পর প্রথম প্রদর্শনী ড্রয়িংয়ের। তখন মাডল বলে এক ধরণের ছবি আঁকছি। প্রথম দিনেই এক আমেরিকান অধ্যাপক দেড়শো টাকার বিনিময়ে সেই ছবিটি কিনে নেন। আমার উৎসাহের দীপদানিতে তেল পড়ে। এগিয়ে যাই, আরও ছবি আঁকতে থাকি। এ সংসারে যাঁরা কুঁড়ে অথচ আকাঙ্ক্ষা আছে তারা ঈর্ষাকাতর হয়। কলেজের বন্ধুরা মিলে যে গ্রুপ আমরা করেছিলাম সে গ্রুপ ছেড়ে দিয়েছি বলে অনেকেই আমার প্রতি বিরূপ হয়েছিল। কিন্তু আমি কীই-বা করতে পারি! বন্ধুদের কেউ কেউ পূর্ব প্রণয়ের পরিণতির দিকে ধাবিত হল। ব্যবসা শুরু করে দিল, কেউ কেউ চাকরির খোঁজে এখানে-ওখানে। আর কেউ রেসের মাঠে দৌড়ল না।

ক্যালকাটা পেইন্টার্স একটা দামাল গোষ্ঠী হিসেবে কলকাতার সাহিত্য-শিল্প জগতে উচ্চারিত হত। তার কারণ, সোসাইটি অব কনটেমপোরারি আর্টিস্টস দল থেকে বেরিয়ে এসে, 'গ্রুপ এইট' এই নাম দিয়ে ওঁরা প্রথম দিল্লিতে প্রদর্শনী করেন। তখন দলে ছিলেন নিখিল বিশ্বাস, গোপাল সান্যাল, প্রকাশ কর্মকার, রবীন মণ্ডল প্রমুখরা। সেটাই পরে ক্যালকাটা পেইন্টার্স হয়। ওরা ভালো কাজ করতেন। জোরালো হাত ছিল। কমিটেড শব্দটা এঁদের পক্ষে যথোপযুক্ত। কিন্তু কারও সঙ্গে কারও সত্যকার হৃদয়-বন্ধন ছিল না। পানশালায় এরা একাকার হয়ে যেতেন। এঁদের মধ্যে নিখিল বিশ্বাস একটু অন্যরকম। বড়সড় বলিষ্ঠ চেহারা। কালীঘাটে বস্তিতে থাকতেন। খ্রিস্টান। তাই পিছনে কিছু সাহায্যের হাত থাকত। ওইসব সময়ে বলিষ্ঠ ড্রয়িং বলতে ঘোড়া, যিশু, পেশিবহুল কিছু মানুষ, এসব চলে আসত। হুসেন থেকে নিখিল বিশ্বাস সকলেই অশ্বারোহী ছিলেন। কেন জানি না ভারতবর্ষে সমকালীন চিত্রকলায় ঘোড়াকে বিষয় করার যৌক্তিকতা কী কারণে? ভারতীয় সমাজজীবনে ঘোড়া পাশ্চাত্যের মতো সমাদৃত নয়। গাধা বা খচ্চর দেখা যায় সর্বত্র। ঘোড়া সাধারণত এলিট ক্লাসের মনোরঞ্জনে ব্যবহার হয়। আরক্ষায়, রেসকোর্সে বা বিশেষ ধরণের গল্ফ খেলায় আর আভিজাত্যে। কিন্তু এইসব তুর্কি প্রগতিবাদী শিল্পীদের ক্যানভাসে ঘোড়া কেন জায়গা পেল, তা জানি না। যদিও একজন চিত্রকর হিসেবে এ ভাবনা সমীচীন নয়। সমালোচক যাঁরা তাঁরাই কলম ভরাতে এইসব ভাবনা ভাবেন। এটা তাঁদেরই থাক। ব্যক্তিগতভাবে নিখিল বিশ্বাস আমার মনে বিশেষ জায়গা পাননি। ওর সাফল্যকে অনেকে অনুসরণ করেছেন। শেষের দিকে কিছু ছবিতে অন্য সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অকালে চলে গিয়েছেন। যে সময়ে তিনি

মিষ্টি কথার জাদুতে এঁরা অনবদ্য। যেমন আমার এক অগ্রজ। কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী অথচ ব্যক্তিজীবনে, আচরণে কমিউনিজমের ছিটেফোঁটারও দেখা মেলে না। আমাদের সামনে গালভরা বিপ্লবের কথা বলতেন, লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কটূক্তি করতেন। 'আকাদেমি নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান' বলে আমাদের মগজধোলাই করতেন। অন্যদিকে গা-ঢাকা দিয়ে সেই রাণু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং অ্যাকাডেমির পুরস্কারটাও জোগাড় করেছিলেন।

ক্যালকাটা পেইন্টার্সে, তখন গ্রুপের অবস্থা খুব ডামাডোল। প্রকাশদা বরাবরই ডাকাবুকো। কিছু কিছু মানুষের কিছু কারণে একটা আকর্ষণ থাকে। তার ফলে বহু মানুষ তাঁকে ঘিরে থাকেন। প্রকাশদাকে একলা হাঁটতে কখনও দেখা যায়নি। সাগরময় ঘোষ থেকে সুপণ্ডিত আমলা। অশোক মিত্র, সুনীল, শক্তি থেকে টিন-এজার কবি, ঠাকুমা থেকে নাতনি সবাই যেন তাঁর ইয়ারদোস্ত। গম্ভীর, দাম্ভিক, উচ্চকোটির প্রাবন্ধিক থেকে শুরু করে কড়চার গড়গড়ে লেখকের সঙ্গেও তাঁর তুইতুকারির সম্পর্ক। আমার নিজের জীবনযাপনে প্রকাশদার কিছুই অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য আমার ছবিজীবনে একটা উৎসাহ, আর গতি এনে দিয়েছিল প্রকাশ কর্মকারের সান্নিধ্য।

হঠাৎ আমি যেন ছাত্র-তরুণ তকমা ঝেড়ে 'যুবক চিত্রকর' হয়ে গেলাম। ওঠা-বসা বড় দাদাদের সঙ্গে যাঁরা আমার চেয়ে পাঁচ-দশ বা আরও বেশি বয়সের বড়। যেমন, রবীন মণ্ডল, বিজন চৌধুরি, শ্যামল দত্ত রায়, প্রকাশ কর্মকার, সুহাস রায়, গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য, যোগেন চৌধুরি— এইসব পোক্ত শিল্পীর সঙ্গে।

বরাবরই, কাজের দায়িত্ব নিতে ভালোবাসি। সংগঠন করার যে ধরণধারন, নেতৃত্ব দেওয়ার আত্মবিশ্বাস ছেলেবয়েস থেকেই আমার ছিল। অনেককেই দেখতাম ফাঁকিবাজ, পাশ কাটিয়ে চলা, নিষ্ঠাহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন চরিত্রের মানুষ। ভেতরে ভেতরে রাগ হত এইসব দাদার ওপর। অথচ মিষ্টি কথার জাদুতে এঁরা অনবদ্য। যেমন আমার এক অগ্রজ। কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী অথচ ব্যক্তিজীবনে, আচরণে কমিউনিজমের ছিটেফোঁটারও দেখা মেলে না। সহজে বেঁচে থাকার জন্যই পার্টির প্রতি তাঁর আনুগত্য। এঁদের স্বপ্নও ছোট। আমাদের সামনে গালভরা বিপ্লবের কথা বলতেন, লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কটূক্তি করতেন। 'আকাদেমি নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান' বলে আমাদের মগজধোলাই করতেন। অন্যদিকে গা-ঢাকা দিয়ে সেই রাণু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং অ্যাকাডেমির পুরস্কারটাও জোগাড় করেছিলেন। এই দু'মুখো মনোভাব কোনওদিনই আমি বরদাস্ত করি না। এইভাবে শ্রদ্ধা উঠে যায়। সেই তারুণ্যে অন্যায় আর ভাঁড়ামো দেখলে খুব প্রতিবাদী হয়ে উঠতাম। কোনও বাছ-বিচার থাকত না।

'ক্যালকাটা পেইন্টার্স-এ পুনরায় সেই অগ্রজ শিল্পীকে নিয়ে আসার কাজটা করেছিলাম আমি। এঁদের অনেকের সঙ্গে পরস্পরের মুখ দেখাদেখি ছিল না। বিকাশদার বিবাহবাসরে রবীনদাকে প্রস্তাব দিই, সেই 'অগ্রজ শিল্পী'কে দলে আনা উচিত। অভিজ্ঞ রবীনদার তাতে প্রশ্রয় ছিল না। কিন্তু অত্যুৎসাহী আমি নিজেই দায়িত্ব নিয়েছিলাম। তাঁর প্রধান বিবাদ ছিল প্রকাশ কর্মকারের সঙ্গে। দুজনকে আমি স্টুডিওতে আমন্ত্রণ করি, বিবাদ মিটে যায়। হাউমাউ করে ওঁরা কেঁদে ওঠেন। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেন। যেন দুই মাতাল খালাসিটোলা থেকে বেরিয়ে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। এঁদের নিয়ে কলকাতায় মিথের অন্ত ছিল না। আজ ফিরে দেখি, এগুলি অর্থহীন। এজন্য আমার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার খামতি হয়নি। কিন্তু ছবিজীবনের প্রেক্ষিতে সত্যি বলতে গেলে সঠিক শব্দ ব্যবহারই বাঞ্ছনীয় মনে করি। নানাভাবে 'ক্যালকাটা পেইন্টার্স'-এর দায়িত্বে এসে বিভ্রান্ত হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি, বোকা হয়েছি, সে উপলব্ধির নিরিখে মানুষ হিসেবে তাঁকে উচ্চস্থানে রাখতে পারিনি। সেটা তিয়াত্তর সাল, ক্যালকাটা পেইন্টার্স-এর মিটিংয়ে ঠিক হয় বড় আকারের প্রদর্শনী হবে কলকাতা, মুম্বই, দিল্লি— তিন শহরে। আমাদের বাজেট

লেখকের সঙ্গে বাঁদিক থেকে অহিভূষণ মল্লিক, প্রকাশ কর্মকার, করুণা সাহা, অমিতাভ ব্যানার্জি, ডেসমন্ড ডোয়েগ, কেকো গান্ধি, গোপাল সান্যাল, রবীন মণ্ডল ও অন্যান্যরা

দশ হাজার টাকা। সেই অগ্রজ শিল্পী-সদস্য প্রতিশ্রুতি দিলেন, শুভা, তোর ভাবনা নেই, ওসি গাঙ্গুলিকে বলে দেব। ও অন্তত সাত হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবে। আমি টগবগিয়ে কাজ করে চলেছি। 'কেমিয়ো' প্রেসের কর্ণধার অনিল সাহা অত্যন্ত শিল্পরসিক মানুষ। উনি শান্তিনিকেতনে সত্যজিৎ রায়, প্রভাস সেন, জয়া আপ্পাস্বামীদের সহপাঠী ছিলেন। অনিল সাহা পরে প্রতিষ্ঠা করেন হাতিবাগানে এই প্রেসটি। তখন প্রযুক্তির এত রমরমা ছিল না। কিন্তু তাঁর নান্দনিক বোধ, পরিচালন ক্ষমতা, উপযুক্ত কারিগর আর সর্বোপরি শৃঙ্খলায় অনন্য হয়ে উঠেছিল সে প্রতিষ্ঠানটি। একটা সময় এই কেমিয়ো প্রেস থেকে হাতে গাঁথা সিসার শব্দাক্ষর যুক্ত করে পরপর ধাতব ব্লকের ছাপ দিয়ে বহু বর্ণের ছবি সাজিয়ে যে মুদ্রণ নমুনা প্রকাশ পেয়েছে, বলতে দ্বিধা নেই— ভারতবর্ষের তৎকালীন মুদ্রণশিল্পে তা অভাবনীয়। সে সময়ের ছাপা ললিতকলা অ্যাকাডেমি থেকে প্রকাশিত মনোগ্রামগুলি যদি কেউ দেখেন তাহলে বোঝা যাবে আজকের উন্নত প্রযুক্তির পাশেও সেগুলি কত উজ্জ্বল ও উন্নত। সেই অনিলবাবু আমায় খুব স্নেহ করতেন। প্রভাসবাবু আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করান। সেই সংখ্যাটি বিনামূল্যে তিনি ছেপে দিয়েছিলেন। সেই দাদাকে প্রতিদিন মনে করিয়ে দিই, হাতে আর মাত্র পাঁচ দিন সময়। কোনও বিজ্ঞাপন আসেনি তখনও। আমি উৎকণ্ঠায়। দায়িত্ব নিয়েছি তো! রোজই বলেন ও তো বলেছে পাঠিয়ে দেবে। তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন? অগত্যা আমি চলে যাই ফুৎনানি চেম্বারসে। বাটা অফিসের ওপরে ওসি গাঙ্গুলির স্টুডিওতে। সঙ্গে রবীনদা। ওসি গাঙ্গুলি আমাদের দেখে বলেন, ও আপনারা এসেছেন? কিন্তু সে তো কিছু বলেনি। গতকালই তো আমরা একসঙ্গে মদ্যপান করেছি। আমরা স্তম্ভিত। একান্ত অনুরোধ করায় উনি ছোট একটা বিজ্ঞাপনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। বললেন, এই ম্যাটারটা নিয়ে যান। প্রকাশিত হলে আমার কাছে বই-সমেত বিলপত্র দেবেন। ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফুৎননি চেম্বারসের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকি। দোতলার কাছাকাছি নামতেই মুখোমুখি হই সেই দাদার, উনি ওসি-র কাছে যাচ্ছেন সান্ধ্য বৈঠকে। আমি বিজ্ঞাপনের কথা মনে করাতে অন্য মেজাজে ভর্ৎসনার সুরে ওসি-র কাছে যাওয়াটা যে ঠিক 'আইনসম্মত' হয়নি তা আমায় জানিয়ে দেন। প্রদর্শনী আমার একার ছিল না। তিনিও তার অন্যতম অংশগ্রহণকারী।

আর দ্বিতীয় ঘটনা, সে সময় সবে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভা গঠন হয়েছে। যেহেতু ওঁর এলাকায় উনি দাপুটে সক্রিয় কমিউনিস্ট সেহেতু নতুন শাসনে আসা কংগ্রেস দল তাঁকে শাসিয়েছিল। ভয়ে উনি ঘরছাড়া। থাকেন দক্ষিণ কলকাতায় জোছন দস্তিদারের বাড়ি। তখন আমার বাড়ির ছোট্ট স্টুডিওয় তাঁর খুব যাতায়াত। একদিন খুব কাতরভাবে আমাকে অনুরোধ করলেন, শুভা, তুই তো ওই মন্ত্রীকে চিনিস। ও তো ডাকাবুকো কংগ্রেস নেতা। তুই একটু আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে বলিস। যাতে আমি বাড়ি ফিরতে পারি। তোর বউদি সেই বাড়ি থেকে টিফিন কেরিয়ার করে জোছনের বাড়িতে খাবার নিয়ে আসে। এই টানাপোড়েনে বউদির বড় কষ্ট হয়। তুই একটু ওকে বল, ওই পাড়ার ছেলেরা যাতে কোনও অসুবিধার সৃষ্টি না করে। যথারীতি অপারেশনে নেমে পড়ি। আমার ফিলোজফার গাইড অহিভূষণ মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে যাই তরুণ তুর্কি ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা তৎকালীন তথ্যসংস্কৃতি মন্ত্রীর দরবারে। ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন সংলগ্ন একতলার একটি ঘরেতে তিনি বসে আছেন স্বাভাবিক সপারিষদসহ। সকালে তাঁর সেই আমদরবারে আমি, অহিদা, সঙ্গে সেই অসহায় শিল্পী দাদা। মন্ত্রীকে জানাই, ইনি কত বড় মাপের শিল্পী কিন্তু পাড়ার ছেলেরা তাঁর প্রতি অন্যায় করছে। আপনি যদি স্থানীয় নেতাকে একটু বলে দেন, তাহলে একটু সুবিধা হয়, উনি যাতে ওনার বাড়িতে সহজে যাতায়াত করতে পারেন সেটা দেখা আমাদের সকলের কর্তব্য। সেই তুর্কি নেতা-মন্ত্রী সমস্ত ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। উনি শিল্পী দাদার দিকে আপাদমস্তক তাকান এবং বলে ওঠেন,

জিনিসটা অত সহজ নয়। আপনি শিল্পী, আপনারা ছবি আঁকুন, কিন্তু রাজনীতির এই স্তরে নিজেকে জড়ান কেন? দুর্ভাগ্য, আপনারা চিহ্নিত কমিউনিস্ট। কয়লার ময়লা যায় না। একটু দেখবেন, বলে ফোন তোলেন কৃষ্ণ বা ওই ধরণের কোনও স্থানীয় নেতার উদ্দেশে। তাকে বলে দেন, শিল্পী অমুক দাদা নিজের বাড়িতে যাবেন এবং থাকবেন। তার যেন কোনও অসুবিধা না হয় একটু দেখো। সেকথায় কাজ হয়। ওনার ওই সমস্যা মিটে যায়।

কিন্তু পরে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে যায়। হয়তো এই ঘটনা আমাদের কোনও সিনিয়র সদস্যকে বলে ফেলি। তাঁর কাছ থেকে সেই দাদার কানে যায় যে আমি নাকি বলেছি, তিনি অমুক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। এটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। তিনি ফুঁসতে থাকেন। সেদিন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ জয়নাল আবেদিনের প্রদর্শনী। তার দু'দিন আগে প্রভাস সেনের ফার্ন রোডের বাড়িতে জয়নাল সাহেবের সঙ্গে কত গল্প। প্রদর্শনীতে আমরা কত হইচই করব... এইসব এইসব। আমার অ্যাকাদেমিতে পৌঁছতে একটু দেরি হয়। গিয়ে দেখি, সকলেই আমার প্রতি রক্তচক্ষু। প্রায় মারতে উদ্যত। সেই শিল্পীর বড় দোসর সন্দীপ সরকার আমাকে খুব রূঢ় ভাষায় ভর্ৎসনা করতে শুরু করলেন। আমার অন্যায়— আমি 'মিথ্যেবাদী'। তাঁর বন্ধু শিল্পীর নামে এইসব রটিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি মর্মাহত হই। আমার এই মনোবেদনার অংশীদার একমাত্র অহিদা ছাড়া আর কেউ হতে পারেনি। পরে এই জল গড়ায় অনেক দূর পর্যন্ত।

একজন মানুষকে জানা বোঝার আর অন্য কী উপায় আছে! তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ। আমার শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরি, সেই হিসেবে তাঁকে বরাবরই দেখেছি, দেখতে চেয়েছি, আমি তার কখনওই প্রতিদ্বন্দ্বী নই। এক অনুজ চিত্রকর মাত্র। যদিও এই ঘটনাগুলোই শুধু একজনকে জানার বোঝার একমাত্র সূত্র হতে পারে না, জীবন অনেক বড়। তবুও আমার সেই আঘাত তাঁর থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তারুণ্য-যৌবনের মধ্যে যে সহজ উদ্যম থাকে সেগুলো আঘাতে জর্জরিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যায়। মনের গতি-স্রোত সেই ধাক্কা থেকে অন্য পথে ধাবিত হতে থাকে। এরকমই ক্যালকাটা পেইন্টার্সে যুক্ত হয়ে আমি সমস্ত জীবন-সময়-স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা ঢেলে দিয়েছিলাম ওই দলটির সঙ্গে কিন্তু স্বপ্নের অবক্ষয় হতে থাকে এভাবে।

ক্যালকাটা পেইন্টার্সে একমাত্র কর্মী যিনি অত্যন্ত পরিশ্রমে, ভালোবাসায় এই সংগঠনকে চালু রেখেছিলেন, তিনি রবীন মণ্ডল। আমি তাঁর এক সময়ের ছায়াসঙ্গী ছিলাম। প্রায় প্রতিদিন কয়লাঘাটে রেলের অফিসে চলে যেতাম। ব্যাংকশাল কোর্টের পাশে বিশাল অট্টালিকা, লাল ইটে ওয়্যারহাউস স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন ওই বাড়িটি। তার দীর্ঘতম বারান্দাটি ইটালিয়ান সেরামিক টাইলে গাঁথা। আজও আমার কাছে তার বর্ণ-গন্ধ অমলিন। সাহেবদের প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় রেল বিশাল এবং তার বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড। বহু বিখ্যাত মানুষ কোনও না কোনও সময়ে এখানে চাকরি করেছেন। লেখক বিমল মিত্র তাঁর অনেক রচনায় রেল-জীবনের ছবি এঁকেছেন। এ মহলে ঢুকে যে ছবি দেখি তা হল কোনও বড়ঘরে শুধুই অসংখ্য ফাইলপত্র, কেউ দিবানিদ্রা যাচ্ছেন, কোনও উন্মাদ তারস্বরে চিৎকার করতে করতে এঘর-ওঘর পরিক্রমা করে বেড়াচ্ছেন। এক জনপ্রিয় সাধু যিনি অসুস্থ ঘা-পচা মানুষদের ক্ষতস্থান সরাসরি জিব দিয়ে চেটে দিয়ে আরোগ্য করে থাকেন, ডালহৌসি পাড়ায় তাকে দেখলেই শত শত ভক্ত ঘিরে ধরে— ইনি রেল কর্মচারী। মাঝে মাঝে বিশ-পঁচিশজন ভক্ত নিয়ে জটাধারী ধন্বন্তরি আবির্ভূত হন। হাজিরাখাতায় সই করতে হয়তো। রেলের এই কেরানিকুল বড় হৃদয়বান। এভাবেই পরস্পর পরস্পরকে দেখেন। বড়বাবু থেকে ছোটবাবু সবাই সকলের জন্য।

সেই দাদার কানে যায় যে আমি নাকি বলেছি, তিনি অমুক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। এটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। তিনি ফুঁসতে থাকেন। সেদিন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ জয়নাল আবেদিনের প্রদর্শনী। তার দু'দিন আগে প্রভাস সেনের ফার্ন রোডের বাড়িতে জয়নাল সাহেবের সঙ্গে কত গল্প। প্রদর্শনীতে আমরা কত হইচই করব... এইসব এইসব। আমার অ্যাকাদেমিতে পৌঁছতে একটু দেরি হয়। গিয়ে দেখি, সকলেই আমার প্রতি রক্তচক্ষু। প্রায় মারতে উদ্যত।

একটা প্রশস্ত ঘরে চলে কো-অপারেটিভ। গামছা থেকে দেশলাই, খাতাপত্তর, ব্যাগ, জুতো, জামাকাপড় কী নেই! সবই বাজার থেকে অন্তত দশ-পনেরো শতাংশ কম দাম। কেরানিরা ওই কো-অপারেটিভের ঘরে মশগুল হয়ে থাকেন। নিজেরাই কেনাকাটা করেন। পরিবারকে খুশি রাখেন। এরই মধ্যে কয়েকজন ছোটখাটো অন্য ব্যবসা করেন। সই করে কেউ চলে যান কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশনার ব্যবসা দেখাশোনা করতে। বিকেলে কখনও ফিরে আসেন, কখনও আসেন না, অটুট বোঝাপড়া। জোরালো ইউনিয়ন তো! কো-অপারেটিভের পাশের ঘরে কেউ ক্যারাম খেলেন, ব্রিজ খেলাও চলে। অফিসের টেবিলে এগুলো ছাড়া সবচেয়ে বেশি চর্চা চলে কে কতটা গ্র্যাচুইটি পাবে, পেনশন পাবে তা নিয়ে। রেলের পাশ কে কীভাবে খরচ করেছে, কোন কোন খাতে বোনাস কিংবা অন্য উপরি আয়ের ব্যবস্থা আর মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়াশোনা, পরিবারের সমস্যা এইসব গুঞ্জনে ভরপুর। এসবই কেরানিদের জীবন। এরকমই একটি বিভাগে রবীনদা কাজ করতেন। তাঁর টেবিলের সামনে অসংখ্য কাঠের খোপ। ডাকঘরে যেমন চিঠি বিলির আগে বিভিন্ন জায়গায় চিঠিগুলিকে আলাদা খোপে রেখে বাছাই করা হয়, এগুলো বাছাই করে রাখার খোপ, এটা রেলের অভিযোগ বিভাগ। কোনও যাত্রীর মাল খোয়া গিয়েছে, তিনি অভিযোগ করে চিঠি দিয়েছেন। কোনও যাত্রীর পার্সেল ঠিকমতো পৌঁছয়নি, তাদের অভিযোগ করা চিঠিগুলি খোপে খোপে সাজানো। খুব শ্লথ গতি। কোনও কোনও চিঠি হয়তো স্থবির হয়ে রয়ে গিয়েছে, দীর্ঘকাল। করুণার করস্পর্শ জোটেনি তার। রবীন মণ্ডল এই দায়িত্বের একজন কেরানি ছিলেন। মাঝে মাঝে ওর পাশে বসতেন অর্জুন পদক পাওয়া সাঁতারু। প্যারিস থেকে সদ্য ফেরত আসা কোনও তরুণ শিল্পী। লক্ষণীয় হল, সে স্থান কখনও নিঝুম ঘুমন্ত থাকত না। সবসময়ই গুঞ্জন, নানা মানুষের আনাগোনা। কিন্তু রেলের চাকা যে ঘোরে এঘরে বসে তার কোনও ইঙ্গিত পেতাম না। রবীনদার ওই খোপগুলির দুয়েকটি খোপে ছিল ক্যালকাটা পেইন্টার্সের দস্তাবেজ। তখন ক্যালকাটা পেইন্টার্স রেজিস্ট্রিকৃত দল। ললিতকলা অনুমোদন দিয়েছে। তার ফলে প্রদর্শনী বাবদ বাৎসরিক দু'হাজার টাকা মেলে। টাকাটা মার যায় না, কিন্তু সময়মতো হাতে আসে না। ভারতবর্ষের তিনটি শহরে আমরা তখন নিয়মিত প্রদর্শনী করি। এই সংক্রান্ত

যাবতীয় চিঠিপত্র ওইসব খোপে। মাঝে মাঝে আমাদের মিটিং হয়। জড়ো হই রবীনদার ওই ঘরটিতে। দু-চারজন লোক বেশি হলে বেরিয়ে পড়ি অফিসের কাছেই এক মিষ্টির দোকানে। রবীনদারা ওই দোকানের নিয়মিত খরিদ্দার। সবাই খাতির করে। চা চলে আসে। গরম গরম কচুরি, আলুরদম, মচমচে অমৃত্তি। জীবন অমৃতময় হয়। আমরা খুব খাতির পাই। ওরা জানে, আমরা খুব বিখ্যাত শিল্পী, তাই খাদ্য-বণ্টনে অন্যদের চেয়ে আমরা বেশি মনোযোগ পাই।

ভারতীয় রেল-জীবন, রেল-পরিবার এক বিচিত্র পৃথিবী! কোথাও তার তুলনা মিলতে পারে না। ছেলেবেলায় শুনতাম, পরিবারের কেউ রেলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সে পরিবার ধন্য মনে করত। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ কতখানি ছোট স্বপ্ন দ্যাখে, কতখানি নিরুপদ্রব সুযোগসন্ধানী, উদ্যোগহীন অথচ সহজ রাস্তায় উঁচুতে পৌঁছে যাওয়ার জাল বোনেন তা এদের মধ্যে চলা ফেরা লক্ষ না করলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় না। রবীনদার থিয়েটার, যাত্রা, সিনেমা থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের প্রতি একটা মোহ ছিল। হাওড়ার মাহিষ্য পরিবারের সন্তান। এঁরা খুব একটা ডাকাবুকো প্রকৃতির হন না। কারও প্রতি একান্ত ভরসা রাখতে পারেন না। একটা কথা দশজনকে দিয়ে যাচাই করে নেওয়া স্বভাব। নিজের ব্যাপারে সদা-সচেতন। আর কোথায় যেন হাওড়াবাসীর এক ধরণের জেলাপ্রীতি, গোষ্ঠীপ্রীতি থাকেই। কলকাতার ঘটির থেকে হাওড়ার ঘটি একধরণের স্বভাব-কৃপণ 'একলাসেঁড়ে' প্রকৃতির মানুষ হন। বদ্যিদের চেয়ে হাওড়ার নেটওয়ার্ক তুলনায় অনেক ছোট হলেও অনেক মজবুত প্রযুক্তির মানুষ এঁরা। আমি নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাব না, জানিই বা কী? কিন্তু হাওড়াবাসী অনেকের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে আমার অল্প-শিক্ষিত উপলব্ধিতে এই কথা বললাম। এমনই হাওড়ার অমোঘ গুণ যে পূর্ববঙ্গের কট্টর বাঙালরাও হাওড়ায় কিছুকাল কাটালেই হাওড়ার ঘটির সঙ্গে মজে একাকার হয়ে যান। সেই রবীনদাকে নিয়েই আমার উচ্চাশা, স্বপ্ন, আর ভবিষ্যতের রাস্তা পাড়ি দেওয়া। ক্যালকাটা পেইন্টার্সের গোটা প্রদর্শনীর জন্য পই পই করে তাঁর সঙ্গে ঘুরেছি নানা কারণে। রবীনদা প্রথম আমায় দিল্লি চিনিয়েছেন, বম্বে চিনিয়েছেন। আমার চেয়ে কমপক্ষে ষোলো বছরের বড় উনি। কলকাতায় আমি ওঁর চেয়ে পরিচিত। এমনিতে ভবঘুরে হলেও অন্য শহরের কিছুই আমি জানতাম না তখন। বছরের পর বছর রেলভ্রমণ, প্রদর্শনী চলাকালীন বোম্বে-দিল্লিতে দিনের পর দিন একসঙ্গে কাটানো, কত পথ একসঙ্গে হাঁটা, কত ছোটখাটো ভাবভাবনার বিনিময়, কত ছোটখাটো জিনিস দেখা! আমার ছবি আঁকার ধরণ, পারিবারিক সংস্কৃতি শিক্ষা কোনও কিছুর সঙ্গে তাঁদের কারও মিল ছিল না। অথচ এঁদের সংস্পর্শে আমার ছবি-পেশা-জীবনের ভিত তৈরি হয়েছিল। আমার কিছুটা স্পষ্টবাদিতা, অপ্রিয় সত্য কথা বলার প্রবণতার জন্য এঁরা খুব কাছে থেকেও আমায় একান্ত কাছের মানুষ ভাবতেন না। আরও অনেক কারণ আছে। যে আকর্ষণে সাধারণত তথাকথিত মধ্যবিত্ত মানুষ আকর্ষিত হন, তার কোনও মাধ্যমেই আমি পটু নই আজও। ফাঁকফোঁকরে দু-দণ্ড সুখটান দেওয়ার অভ্যেস নেই। ন্যূনতম পেয়ালা-পিরিচে দার্জিলিং-অসম চায়ের মৌতাত থেকেও আমি বঞ্চিত। জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকানও পরিক্রমা করতে পারিনি। আজ ফ্রেন্ড-ফিলোজফার-গাইড কিংবা সাম্যবাদের যে পানীয় আকর্ষণ, শত্রুতা ভুলিয়ে এক মৌতাতে জীবনকে একাকার করে দেয়, সেই মদ্যপানেও আমি অনুত্তীর্ণ। বরং অবাক লাগত, আপাতগৃহস্থ, সরলমতি, ভিতু, রক্ষণশীল রূপের প্রবরেরা সুযোগ পেলেই যখন মদ্যপানের আসরে অবলীলায় ঢুকে পড়তেন তখনও আমি তা থেকে দূরেই থেকেছি। তাই আমি কোনওদিন ওই অন্তরঙ্গতার অন্দরমহলে ঢুকতে পারিনি। ক্যালকাটা পেইন্টার্স নামক সংস্থাটি যদি সংগঠন হিসেবে ভারতবর্ষের শিল্পকলার আন্দোলনের ইতিহাসে কিছুমাত্র স্থান পায় তার কৃতিত্ব একমাত্র রবীন মণ্ডলের। হ্যাঁ আমিও সেই ভেঙে যাওয়া দলটিকে আবার নতুন করে জোড়া লাগিয়ে হইহই করে জমাটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি, দায়িত্ব নিতে শিখেছি। ছবি জোগাড় করা, ঠিকঠাক উপস্থাপনা করা সবই করেছি যার পিছনে রবীনদার নেতৃত্ব ও সহযোগিতা ছিল। আর অন্য সদস্যরা বড়ই ওলট-পালট, কেউ মালঞ্চ, কেউ গুলঞ্চ। মরশুমে ফুটে উঠত, আবার উধাও হয়ে যেত।

এই রবীনদার বন্ধুরা দীর্ঘদিন থেকে তার কৌমার্য হরণের চেষ্টা করছিলেন। যৌবন শেষের দিকে তিনি, যখন বন্ধুরা ঘোর সংসারী। কেউ কেউ নাতি-নাতনি নিয়ে বৃহৎ পরিবারের মধ্যমণি। নানান প্রস্তাব আসে। বিশেষভাবে রবীনদার কেরানি বন্ধুকুল খুব ভাবিত। প্রসঙ্গ এলে প্রকাশ কর্মকার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চারণে কিছু আদিম শব্দ প্রয়োগ করেন। কেরানি বন্ধুরা খুব সিরিয়াস এ ব্যাপারে। কিন্তু রবীনদার কৌমার্য ঘোচে না। শেষ মনে আছে, হাওড়া জেলার কোনও এক স্কুলের প্রধানশিক্ষিকার সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন প্রায় পাকাপাকি হয়ে আসে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে রবীনদার উইকেটে বল ঠেকে যায়। এরকম সময়ে আমার কাছে প্রায় প্রতিদিন যাতায়াত করতেন বাণী মিত্র। থাকতেন কলেজ রো'র আমাদের বাড়ির খুব কাছে। আর্ট কলেজে উনি ছিলেন আমার দুবছরের সিনিয়র। কলকাতার মিত্তিরবাড়ির মেয়ে, ঝামাপুকুর অঞ্চলে এদের হোসিয়ারি ব্যবসা। মাপে তিনি বড়জোর সাড়ে চার ফুট। গোলগাল, মোটাসোটা প্রাণবন্ত একটা রূপ ছিল। বরাবরই একটু ডাকাবুকো। কলেজ জীবন থেকে দেখতাম, কারও না কারও সঙ্গে তার পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। কলেজ জীবনের পর তাঁকে দেখতাম কলেজেরই মাস্টারমশাই এক নামী শিল্পীর সঙ্গে তাঁর বেজায় বন্ধুত্ব। সুখ-দুঃখের সব কথা আমার স্টুডিওয় এসে বাণীদি অনর্গল বলে যেতেন। সব কথাতেই ঘটি-মিত্তিরদের অহংকার ফুটে উঠত। নিজের গুণ থাকুক বা না থাকুক সবার চেয়ে সব বিষয়ে তিনি যে এগিয়ে আছেন আর অন্যরা যে ওঁর চেয়ে বেঁটে এটাই আমাকে শুনতে হত। একসময় বিশেষ এক অবস্থায় তাঁর হতাশা চরমে ওঠে। সেই শিক্ষক-শিল্পীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। সেই চরম হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন বাণীদি। আমি বয়সে ছোট হলেও অনেক সময় নানান সমস্যার সমাধানে পরিচিতরা আমার কাছে আসতেন। আমি যথাসাধ্য পুরোহিতের কাজ করতাম। বাণীদিকে সে সময়ে একদিন সকালে দৃঢ়ভাবে বলে উঠি, এরকম করবেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে করুন। তাহলে অন্তত অনেক বিপদ থেকে মুক্ত হবেন, নিরাপত্তা পাবেন, সেই মুহূর্তে আমি দুয়েকজনের নাম প্রস্তাব করি। অচিরেই বাতিল করেন তিনি, শেষ নাম প্রস্তাব রবীনদার। বয়সে অনেক তফাত হলেও অসম্ভব নয় বলে আমি অনেক যুক্তি দিই। আমার ধারণা হয় এতে বাণীদির একটু সম্মতি আছে। এরপর নানা কাহিনি, ছোটাছুটি। রবীনদাকে জানানো। তাঁদের রঁদেভ্যুর ব্যবস্থা করা, আমার স্টুডিও থেকে শুরু করে বেশ কয়েক জায়গায় সাক্ষাতের লুকোচুরি, টানাপোড়েন। বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র বিলি পর্যন্ত সময় লেগেছিল এক মাস পনেরো-ষোলো দিন। অনেকের কাছেই তখন বাহবা পেয়েছিলাম। শ্যামল দত্তরায় তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে এর বর্ণনা দিতেন। রেস্তোরাঁর নানান আড্ডায় মুখরোচক হয়ে উঠেছিল এ বিষয়।

এইটুকুই, এই পর্যন্তই থাক। এরপরে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে আমার ভূমিকা, সম্পর্ক, একটু অন্যরকম হয়ে যায়। আমি অনুচ্চারিত থাকি রবীনদার জীবন বিষয়ক আলাপচারিতায়, কিংবা আত্মজীবনীমূলক রচনায়, এমনকি ক্যালকাটা পেইন্টার্সের ইতিহাস থেকেও আমাকে আবছা করে দেওয়া হয়। বেশ লাগে। বিস্ময়ও হয় যখন দেখি দূরত্ব থেকে গালিগালাজ, ঈর্ষাতুর মন্তব্য, চরিত্রহননের চেষ্টা। আবার এই মানুষেরাই সুধারসে নিমজ্জিত হলেই একাকার হয়ে যান।

এগুলোই আমার অপদার্থতার কৈফিয়ত।

সে সময় আরেকজন মানুষও আমার ছবিজীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। কস্মিনকালেও আমার জীবন-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না। বন্ধুত্ব ছিল প্রকাশ কর্মকার, বিজন চৌধুরি, রবীন মণ্ডল আর মহিম রুদ্রদের সঙ্গে। মহিম রুদ্র বেশ কিছুকাল হল মারা গিয়েছেন। ষাট থেকে সত্তরের দশকের গোড়ায় যেসব ইন্টেলেকচুয়াল আইকনেরা দক্ষিণ কলকাতা শাসন করতেন, চিত্রকর-পদ্যকার-গল্পকারদের মিলিত কারবারে লিপ্ত হতেন, উইন্ডসার থেকে খালাসিটোলা আর কিছু বিলাসী ধনীদের বৈঠকখানার সান্ধ্য আড্ডায় সভাবর্ধন করতেন, এঁদের অন্যতম মধ্যমণি ছিলেন মহিম রুদ্র। ভালো কথা বলতেন। জুতসই চেহারা, কোঁচকানো দাড়ি। কোঁচকানো চুল, বিয়ে করেছিলেন সুইডিস মহিলাকে। সেই সময় বোধহয় ইন্টেলেকচুয়ালদের মধ্যে বিদেশি সহচারিণীর একটা চল হয়েছিল। আদি অবশ্য অন্নদাশংকর রায়, অমিত চক্রবর্তী প্রমুখেরা। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহিম রুদ্র, প্রণবেন্দু দাশগুপ্তরা। এঁদের দলে ছিলেন আরও একজন। যিনি লেখকও নন, চিত্রকর নন। বা হয়তো তখনও তিনি সেভাবে অত পরিচিত হননি। কিন্তু তাঁদের ছায়াসঙ্গী ছিলেন। আমি সেইভাবে তাঁকে দেখেছি, আর ক্যালকাটা পেইন্টার্সের সমস্ত হাল যখন আমার হাতে তখন তিনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ হন। আমি তাঁর বিষয়ে কিছু জানতাম না। পরে জেনেছি তিনি কৃষ্ণনগরের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ, পরে বেহালার অক্সফোর্ড মিশনের সঙ্গে যুক্ত হন। ক্যালকাটা পেইন্টার্স-এর ব্যাপারে তিনি খুব উৎসাহী। প্রতিটি মদের আসরে নিয়মিত শুরু থেকে শেষপর্যন্ত তিনিই। মনে আছে, তখন ব্রিটিশ পেইন্টস-এর চৌরঙ্গির অফিসে একটা গ্যালারি হয়েছিল। তার সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম গোড়া থেকে। ওই গ্যালারির সূচনা হয় আমাদের কাজ দিয়ে। রবীন মণ্ডল, শ্যামল দত্তরায়, বিকাশ ভট্টাচার্য, বিপিন গোস্বামী আর আমি। তখন কলকাতায় তো প্রাইভেট গ্যালারি ছিল না। আমাদেরই আয়োজন করতে হত। লোক ডাকতে হত, সমালোচকদের আমন্ত্রণ জানাতে হত। এই নতুন গ্যালারির সুবিধা হল যে তাঁরা নিজেরাই এসব কাজের দায়িত্ব নিলেন, আর গ্যালারির ভাড়া লাগল না। 'দেশ' পত্রিকা একমাত্র সাপ্তাহিক, যাঁরা নিয়মিত ছবির কথা ছাপতেন, অনেকটা জায়গা জুড়ে কালী বিশ্বাস লিখতেন 'দেশ'-এ। কিন্তু তিনি সদ্য প্রয়াত হয়েছেন, তখন 'দেশ'-এ শিল্পকলার নিবন্ধ লেখার কেউ নেই। সাগরময় ঘোষই সর্বেসর্বা। আমি সাগরদাকে জানাই, এই প্রদর্শনীটার বিষয়ে 'দেশ'-এ লেখা বেরলে ভালো হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য কালীবাবু নেই, তাই এই কলমটা বন্ধ আছে, কী করা যেতে পারে? সাগরদা জানালেন, আমারও সেই চিন্তা কিন্তু লোক পাই কোথা থেকে! আমি দুয়েকটি চেনা নামের প্রস্তাব দিই। সাগরদা বাতিল করেন সেগুলি। পরিশেষে হঠাৎ মনে আসে সন্দীপ সরকারের নাম। সাগরদা তার পরিচয় জানতে চাইলেন। কিন্তু কোনও সূত্র পেলেন না। আমি নাছোড়বান্দা হওয়ায় উনি বললেন, তোমাদের প্রদর্শনীটা তাকে দিয়ে লেখাও। যদি ঠিকঠাক হয় তখন তার কথা ভাবব। সেই থেকে সন্দীপ সরকার 'দেশ'-এর নিয়মিত লেখক হয়ে যান। পরে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। সুরালয়ে পৌঁছে গেলেন। সব পাকাপাকি হয়ে যায়। নিজগুণেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু কিছু অসুখ, কিছু লোলুপতা, তাঁর ধারাবাহিকতা ভেঙে দিয়েছিল। সেই কলামকে ব্যক্তিগত সুযোগের জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সরাসরি দাবি করতে লাগলেন এমন কিছু যা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বয়স্ক বন্ধুরা তাঁকে ব্যবহার করতে লাগল। কলকাতা নামক এই বৃহৎ গ্রামে এগুলো কারও অজানা রইল না। আমার মেতে ওঠা, দৈনন্দিন জীবনের ফুরসতহীন সময়, ভালোবাসা, আঘাত, আবেগ, ব্যর্থতা আর মরীচিকার অন্বেষণে ছুটে যাওয়া সমানতালে চলত।

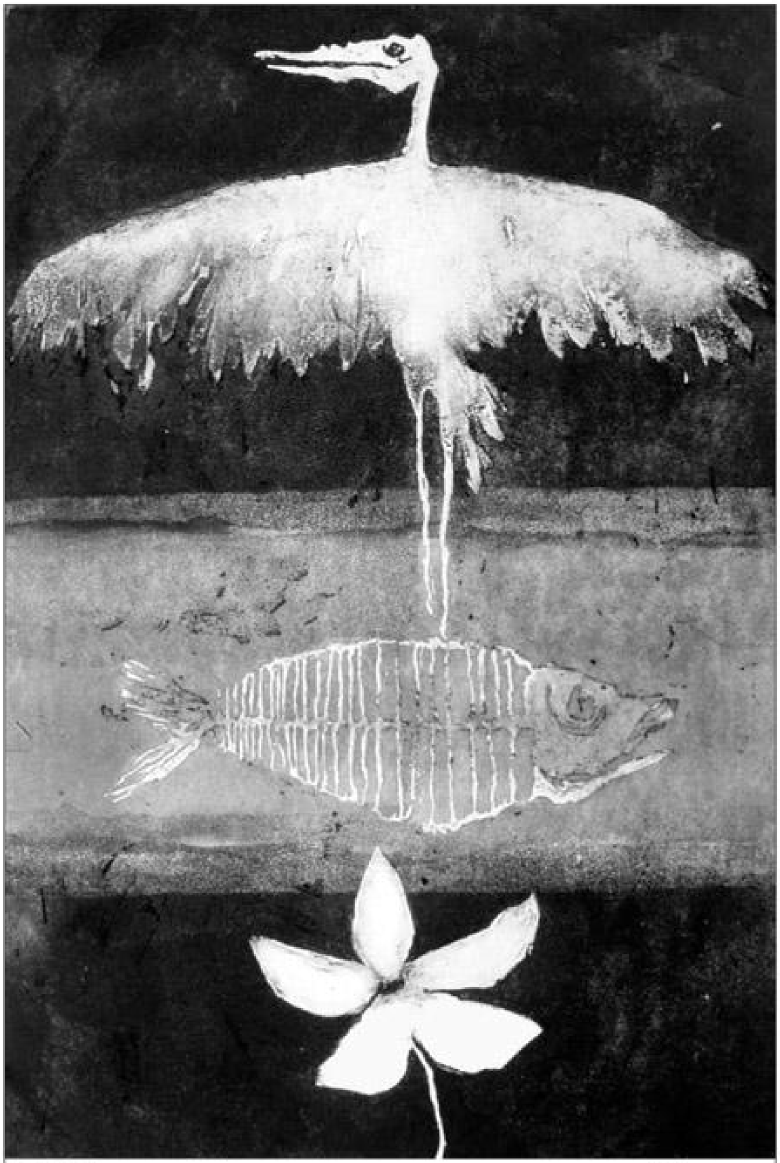

বি-টু ইলিউশন *শিল্পী: শুভাপ্রসন্ন*

ক্রমশ

দেবেশ রায়ের দাওয়াত

গত সংখ্যায় শ্বেতা সরখেল-এর গল্পদুটি পড়ে দু-চারজন সাক্ষাতে বা ফোনে জানতে চেয়েছেন— এঁর নাম তো শুনিনি, ইনি কে?

যাঁরা এমন জিজ্ঞেস করেছেন তাঁদের কাউকে বলেছি, ওঁর গল্পটা আমার কাছে ছিল, তাই দিয়েছি, কাগজের সম্পাদকের ভালো লেগেছে, তাই ছেপেছেন।

জিজ্ঞাসুদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে চেনাজানা আছে আমার, তাঁদের জবাব দিয়েছি একটু পেঁচিয়ে, এই দাওয়াতটি কি শুধু তাঁদের গল্পের জন্য যাঁদের নাম সবাই জানেন? এমন নামডাকওয়ালা লেখকদের গল্প আমার সেরেস্তায় থাকবে কী করে?

যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও একটু বেশি, তাঁদের বলেছি— এ-পর্যন্ত এই দাওয়াতে যাঁদের গল্প ছাপা হয়েছে তাঁদের কারও নামই কি আপনাদের শোনা ছিল, অথচ গল্পগুলি সবই তো কমবেশি ভালো লেগেছে।

আমি জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলাম ওখানকার জিলা গ্রন্থাগারের নতুন ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে। না-যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না দুটি কারণে। প্রথম কারণ— জলপাইগুড়ি। দ্বিতীয় কারণ— জিলা গ্রন্থাগারের প্রথম ভবনের উদ্বোধনেও আমি ছিলাম। তৃতীয় কারণটাও একটা কারণ, ব্যক্তিগত হলেও— আমার বড়দি সুধা রায়চৌধুরি ও তাঁর স্বামী দিলীপ রায়চৌধুরি প্রথম থেকেই এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দুজনের কেউই আর এখন নেই।

উঠেছিলাম আমার বহুকালের বন্ধু সমর চৌধুরির কাছে। সমর জলপাইগুড়ি ডিভিশন্যাল লাইফ ইনসিওরেন্স কর্মচারী ইউনিয়নের সেক্রেটারি ছিলেন অনেক-অনেক বছর। চাকরি করতে করতেই হার্টের কঠিন অসুখে পড়েন। দু-দুবার বাইপাস হয়েছে। নীতিবাদী রাজনীতি, রেডিও নাটক ও মঞ্চ নাটক, ফিল্মোৎসব— এই তাঁর কাজ এখন। জগন্নাথ বসু ও উর্মিমালা বসু এখন সমরের লেখা বিবেকানন্দ-সম্পর্কিত একটি নাটক কলকাতায় ও অন্যত্র অভিনয় করে চলেছেন।

শ্বেতা, সমর ও কর্ণার একমাত্র মেয়ে। কর্ণা আমার ছাত্রী ছিল কিনা মনে নেই। সে অনেক বছর আগে চলে গিয়েছে। তার আগেই অবিশ্যি শ্বেতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে অতনু-র সঙ্গে। শ্বেতা ও অতনুর এখন দুই সন্তান। তাদের নিয়ে ওদের ব্যস্ততা শেষ হয়নি।

সমরের বাড়িতে একদিন দুপুরে আমাদের দেখাশোনা করতে শ্বেতা এল। তখনই একটা গল্প দিয়ে বলল, তুমি পড়ে আমাকে জানিও কী কী দোষ হয়েছে।

কলকাতায় ফিরে সেই গল্প পড়ে আমি তো তাজ্জব। সমর পারেও। এত ভালো গল্প লেখে মেয়েটি, কোনওদিন একটা কথাও বলেনি।

শ্বেতার গল্পটা আমার সেরেস্তায় ঢুকিয়ে ওকে ফোন করে বললাম, আরও কী কী লিখেছিস, পাঠা।

অনেক সময় নিয়ে শ্বেতা পাঠিয়েছে। তা থেকেই এই গল্পদুটো দাওয়াতে দিয়েছি।

গল্পদুটো পড়ে কয়েকজনের সঙ্গে তো কথা হয়েছে। তাঁর ভেতর একজনের মন্তব্যটাই আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে— গল্পদুটোর জন্য ওকে একটুও ভাবতে হয়নি, এত সত্য হয়েছে।

একথা যিনি বলেছেন তাঁর পড়ার অভিজ্ঞতা অনেককালের, ক্লাসিক থেকে আধুনিক, শুধু বাংলাই নয় ও তিনি শুধুই পাঠক।

শ্বেতার গল্পের সেই আধুনিকতার সত্যটাই আমার ভালো লেগেছে। আমাদের বেঁচে-থাকা এখন এতটাই জটিল যে অনেক গিঁট পড়ে গিয়েছে। এত অনেক, যে আমরা গোলমাল করে ফেলছি কোন গিঁটটা খুলে দিলে জীবনটা সহজবোধ্য হতে পারে। এটা নয় যে আমরা জীবনটাকে সহজগম্য করতে চাই। এটাও নয় যে আমরা মনে করছি, জীবন আর সহজবোধ্য হওয়া সম্ভব। জীবনের অনতিক্রম্য জটিলতা আর অনিবার্য সরলতার মধ্যে দ্বন্দ্বও যে সবসময় খেয়াল করি, তাও নয়।

শ্বেতার গল্পদুটিতে আমি পড়ে ফেলতে পেরেছিলাম— ও দেখে ফেলতে পারছে আমাদের এখনকার 'হাম দো হামারা দো' ছোট পরিবারে পুরনো পরিবারের মানুষজনের সংখ্যা ও সমস্যা ঠিক আঁটছে না। সেই আঁটাআঁটিটা একেকজনের স্নেহ-ভালোবাসার সম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আঁটাআঁটি। যতটা সামাজিক-আর্থিক, তার চাইতে অনেক বেশি মানবিক। সে মানবিকে গ্যাস-বুকিং বা কেরোসিন-আনা জুড়ে যায় ফেমিনিস্ট তৎপরতা ও সচেতনতার সঙ্গে। সেখানে কুঁচি দিয়ে শাড়ি-পরাও জুড়ে যায় একটু ভিন্নতর সামর্থ্যের সমস্যার সঙ্গে, যে সমস্যা গড়সামর্থ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

গল্পের সমস্যা যত গড় হয়, ততই কী বিশিষ্ট সত্য হয়ে ওঠে।

এবার আমরা ছাপছি তিনটি গল্প— এগুলো লিখেছেন শাহীন আখতার। লেখকের পরিচয় এখন থাক, পরে হবে। অনেকে হয়তো এঁর লেখা পড়েওছেন। গল্পগুলির ভেতর একটা গোপন সংযোগ আছে। পাঠকের যদি সেই সংযোগটি ভালো লাগে, তাহলে সম্পাদক চাইলে, এর পরের কোনও সংখ্যাতে শাহীনের আরও তিনটি এমন গল্প ছাপা যেতে পারে। পাঠক তেমন পড়তে চান কিনা আগে সেটা জানতে হবে। পাঠক সেটা যদি জানান তাহলে সেইমতো দাওয়াত হবে অদূর ভবিষ্যতেও।

শাহীন আখতার

ভিউপয়েন্ট

শুনে এসেছিলাম, এখান থেকে শীতের চাঁদনি রাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। হিমালয়ের খাঁজকাটা শুভ্রশিখর, হীরকদ্যুতি ছড়িয়ে উত্তর-দিগন্তে ভেসে থাকে, শীতের শুরুতে কিংবা শেষে, বছরের এক-আধ দিন। এছাড়া বাদবাকি সময়, অন্য আর দশটা মফস্‌সল শহর থেকে পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়ার ফারাক বলতে গেলে একেবারেই নেই।

তারপরও চৈত্রের শেষে বৈশাখ ছুঁয়ে আমি যে এখানে এসেছি, সে কি কেবলই কাজের সূত্রে? অফিস-নথিতে এরকম একটা রেকর্ড আছে, থাকুক, তাতে কারও বিশেষ ক্ষতি হবে না। কাজ আমি এখানেও তা-ই করেছি, দক্ষিণবঙ্গের নালতা কি দেবহাটা গেলে যা করতাম। কারণ উত্তর আর দক্ষিণের কোথাও একচিলতে জমি পড়ে নেই, মুসলিম পারিবারিক আইনের জালে যা আটকা পড়েনি। তার ওপর যাদের নিয়ে গবেষণা, ফিল্ম বা পত্রিকার ফিচার, তারা চাদর জড়িয়ে, বোরখা-মুড়ে, উত্তর-দক্ষিণ কী পূব-পশ্চিম সবদিকেই কম-বেশি একই হারে আছে। এমন যে রোকেয়ার বাড়ি পায়রাবন্দ, সেখানেও চটেঘেরা

রিকশা বা গরুরগাড়িতে এখনও মেয়ে সওয়ারিরা যাওয়া-আসা করে, ঘুঘু-চরা পৈতৃক ভিটেয় সদ্য-বসানো রোকেয়া ফলকের ধার ঘেঁষে।

এরকম আরও অনেক কিছু পঞ্চগড় আর তেঁতুলিয়ার মেয়েদের জীবন-জুড়ে যোলোআনাই আছে। তবে জালে যেমন ছেঁদা থাকে, আইনেও আছে তেমনি ফাঁকফোকর। তা না হলে, আয়েশা গত ক'বছর ধরে এত ওড়াউড়ি করছে কীভাবে। অবশ্য ওর কথা যদি ধরি, আমার জানা মতে, ও তো সেই রহস্যগল্পের একমাত্র দুঃসাহসী ডুবুরি, আইনের জাল ছিঁড়ে-ফেঁড়ে অতল সমুদ্র থেকে যে উঠে এসেছিল। অন্তত আমার দিগন্তে। সত্যি যে, সেটা ছিল ঠাকুরগাঁয়ের শেষের রাতে ঘটে-যাওয়া এক স্বপ্নসদৃশ ঘটনার যবনিকা মাত্র। তার আগে অর্থাৎ সেদিন দুপুরেই কীভাবে আমি একজন স্থানীয় প্যারালিগ্যাল কর্মীকে জিজ্ঞেস করি, 'এখানকার মেয়েরা চাইলে তো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পারে, পারে না?'

আমার আকুল প্রশ্নটাকে মোটরবাইকের ধুলোর সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে, 'কাঞ্চনজঙ্ঘার যে কী রূপ,' উল্টে সে আমাকেই বলে, 'আট-ন'মাস পরে আসলে নিজের চোখে তা দেখতে পাবেন।' আমি তখন পঞ্চগড় আর তেঁতুলিয়ার কাজ সেরে ঠাকুরগাঁও যাচ্ছি। রাতটা ওখানে থেকে কাল আমার ঢাকা ফেরার কথা। চালকের পিছনের সিটে বসে, দুলকি চালে এবড়ো-খেবড়ো পথে যেতে যেতে একবার ইচ্ছে হচ্ছিল বলি, 'আমি আমার কথা বলিনি। ধূলি-মেঘের প্রাচীরের ওপাশে গা-ঢাকা দিলেও আমি জানি, কাঞ্চনজঙ্ঘা এখন আমার দৃষ্টিসীমার মধ্যেই আছে।' কিন্তু একে তো অমসৃণ পথ, তার ওপর আমার কথাটাও কেমন বাঁকাচোরা। তার পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে মোটরবাইকসহ লোকটি তো পথ থেকে ছিটকে, হুড়মুড়িয়ে মাঠেও পড়ে যেতে পারে! তাই সরলভাবে বলি, 'কবে-না-কবে-কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে, তার জন্য ঢাকা থেকে এখানে এসে বসে থাকার কোনও মানে হয় না।'

অথচ একদিন হঠাৎ করেই আমার মনে পড়ে, একে দেখব বলে ভোর-রাতে, হিমালয়ের হাড়-কাঁপানো শীতে টাইগার হিলে উঠেছিলাম। কাচঘরের ভেতরে তখন দর্শনার্থীদের ভিড়। বাইরে পাহাড়-সমান কুয়াশা। তার ওপাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা, না নদীনালা বোঝার উপায় নেই। যার যার বায়নোকুলার, জুমক্যামেরা হাতে আর গলায় ঝুলিয়ে, দর্শনার্থীরা ঘুরছে। তুলে যে চোখে লাগাবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়, সেই সুযোগ কিছুতেই আর আসে না। একসময় ত্যক্ত-বিরক্ত হয়েই বোধ হয়, কাচের ঘর ছেড়ে সবাই নেমে আসে চোরকাঁটা-ভরা টাইগার

পাহাড়ি পাকদণ্ডী বেয়ে দর্শনার্থীদের শোকমিছিল এঁকেবেঁকে নামতে লাগল। আমি টাইগার হিল শেষবার পিছন ফিরে দেখে সেই প্রথম ঠিক করে ফেলি যে, এত ঘটা করে বিখ্যাত সিন-সিনারি আর কখনও দেখতে যাব না।

হিলের তালুর ঠিক মাঝখানে। ততক্ষণে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকে সূর্য একবার উঁকি দিয়ে আবার মেঘের আড়ালে ঢুকে পড়েছে। অথচ কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা নেই। মেঘের যে আড়ালে সে ছিল, তখনও সেই আড়ালেই। এছাড়া সূর্যোদয়ের সময় সুউচ্চ এই হিমালয়শৃঙ্গে যা ঘটার আমরা ঠিক তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, সে অনেক আগে ঘটে গিয়েছে। তারপর কে আর ওখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকে! পাহাড়ি পাকদণ্ডী বেয়ে দর্শনার্থীদের শোকমিছিল এঁকেবেঁকে নামতে লাগল। আমি টাইগার হিল শেষবার পিছন ফিরে দেখে সেই প্রথম ঠিক করে ফেলি যে, এত ঘটা করে বিখ্যাত সিন-সিনারি আর কখনও দেখতে যাব না।

গতবছর গ্যাংটকে, হোটেলের ম্যাড়মেড়ে ছাপার পর্দা সরাতেই কাঞ্চনজঙ্ঘার একেবারে মুখোমুখি। আমি তো অবাক। কী ব্যাপার, জল না চাইতেই দেখি তুমুল বৃষ্টি। তিনতলা থেকে রাতের পোশাকেই কয়েক লাফে হোটেল কাউন্টারে নেমে আসি। 'এই যে দেখেন, ওই তো উত্তর-পশ্চিমে।' একখণ্ড কালো মেঘ ততক্ষণে ড্রাগনের হাঁ-করা মুখে তার অর্ধেকটা গিলে ফেলেছে, তবু আমি হাঁফাতে হাঁফাতে একই কথা বলে চলি, 'এটা কি কাঞ্চনজঙ্ঘা? ওই যে উত্তর-পশ্চিমে?' তখন হোটেলের বাঙালি ম্যানেজার বেশ গর্ব করে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ দিদি, কাঞ্চনজঙ্ঘা। তাসি ভিউপয়েন্টে উঠে, একদিন গিয়ে দেখে আসুন না। গোটাটাই দেখতে পাবেন।'

গোটা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে আর তাসি যাইনি। তবে গ্যাংটকে বাকি পাঁচদিন বিছানায় শুয়ে-বসে পর্দা টানলেই বায়ুকোণে দেখা দিত রোদঝলসানো তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা। সেবার কী যে হল, মিরিক থেকে, এমনকি শিলিগুড়ির মহানন্দা ব্রিজের ওপর দিয়ে রিকশায় যেতে যেতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেলাম। চলে আসার দিন জলপাইগুড়ির বাসে চড়ে চ্যাংড়াবান্ধা যাচ্ছি, বুড়িমারী চেকপোস্ট হয়ে দেশে ফিরব— হায় তখনও।

মোটরবাইক থেকে ঠাকুরগাঁও নেমে প্যারালিগ্যাল লোকটি হঠাৎ করেই বলে বসে, 'ভাগ্য ভালো থাকলে একচান্সে ঠিকই দেখতে পাবেন।'

'কী?' কয়েক পা এগিয়ে গিয়েও, সে আসলে কী বলতে চাচ্ছে, বুঝতে না পেরে আমি পিছন ফিরে তাকাই।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা! পঞ্চগড় কষ্ট করে নাই-বা গেলেন। আট-ন'মাস পর ঠাকুরগাঁও থেকেও তো দেখা যাবে।'

'তাই নাকি? কী সাংঘাতিক!' আমি হাসতে শুরু করি। 'আমি তো পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়ার কথাই শুধু শুনেছি। ঠাকুরগাঁও থেকেও দেখা যায়! ঢাকা থেকে যায় না? হি হি হি।'

আমার পেট ফেটে হাসি বেরোচ্ছে। লোকটা অপ্রস্তুত। তবু হাসি থামাতে পারি না আমি।

'ও কী, হাসছেন যে বড়? আমার কথা বিশ্বাস না করেন কেয়ারটেকারকে ডাকছি।' মেহেদি গাছের বেড়া ডিঙিয়ে ও গেস্টহাউসে ঢুকে পড়ল কেয়ারটেকারকে ডাকতে।

আমার হাসির দমক, যা অপ্রতিরোধ্য, অতর্কিতে এসে লোকটা আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার তা চলেও গেল। আমাদের বন্ধু দীপা বলে, আমার নাকি এই এক বাতিক— যখন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি'র মতো কখনও কোনও সত্যি কথা বলার দরকার পড়ে, আমি তখন সামান্য ছুতোয় পাশের লোকটিকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে হাসতে শুরু করি। সত্যি বলতে কী, এ-ব্যাপারে দীপা এতটুকুও মিথ্যে বলে না। আমি নিজেও দেখেছি, 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বের হয়,' এই ভয়ে সেই কবে কথার বদলে ঠোঁটে হাসি তুলে নিয়েছিলাম, আজ কেন যেন না-হেসে আর পারি না। আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি শুনে লোকটা হয়তো জানতে চাইত, কবে কার সঙ্গে দেখতে গিয়েছি, এতবার দেখার পরও আবার কেন দেখতে চাই ইত্যাদি বিষয়।

ওর এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমাকেও নিশ্চয়ই কথার পিঠে আরও অনেক কথা বলতে হত!

আমি বছরখানেক আগে একদিন দীপাকে বলেছিলাম, 'জানো তো দীপা, তিল থেকে তাল হয়!'

'তাতে তোমার কী?' দীপা তেড়ে ওঠে।

আমার কী! আমি কিঞ্চিৎ ভাববার চেষ্টা করি। ও তো এখন সংসার পেতে তীরে উঠে বসেছে। সাগরে তুফান উঠলে যা হওয়ার আমারই হবে। কিন্তু কতদূর কী হবে, সেদিকে

না গিয়ে আমার কেবল মনে পড়ে, এমন একসময় গিয়েছে কোথাও-না-কোথাও আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার পথ ছিল। যদিও দিকচিহ্নহীন। তার শেষটা ছিল অজানা আর রহস্যময়। এখন সেই পথের বুকে ঘাস গজিয়েছে। কাঁটা গাছ আর বিষাক্ত ঝোপঝাড় দখল করে নিচ্ছে পথের শেষ চিহ্নটুকু। আমি দীপাকে কেবল বলি, 'দেখো না, এই বছরটা, এই '৯৩ সালটা কেমন দোররা মারা, পাথর-ছোঁড়া দিয়ে শুরু হয়েছে। ঘরে বসে থাকো তো! আমার যে কী, তুমি তার কী বুঝবে?'

মুখে একথা বললেও আমি না-ভেবে পারি না যে, সবার না হোক, কিছু লোকের মুখ বন্ধ করার, হাসি ছাড়া অন্য কোনও সূক্ষ্ম উপায়ও তো আছে। তারপরও কেন যে হি হি হো হো করে চলেছি, সেই কবে থেকে!

খানিক পর কেয়ারটেকারকে না পেয়ে লোকটি মনমরা হয়ে ফিরে এল। আমি তাকে খুশি করার জন্য বলতে লাগলাম, 'ঠাকুরগাঁয়ে নিশ্চয়ই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার স্পট আছে। এই যেমন তাসি ভিউপয়েন্ট, টাইগার হিল।' এবার একটু না-হেসে আমি আবার পারি না। তারপর কষ্টে-সৃষ্টে বলি, 'ভ্রমণকাহিনিতে থাকে না? আমি আসলে ভিউপয়েন্ট দেখতে চাই। যা গরম! বিকেলটা ঘুরে ঘুরে দেখলে হয়।'

লোকটি তখন মোটরবাইক গ্যারাজ করছিল। আমার কথা তার এককানে ঢুকে পড়তে, সে অন্য কান দিয়ে সেটি বের করে ফেলে, নিঃশব্দে বাড়ির পথ ধরল। আমিও তোষামোদে কুকুরের মতো লেজ নেড়ে নেড়ে ওর পিছন পিছন চললাম।

বাঁশঝাড়, পুকুরপাড়, মুদি দোকান পেরিয়ে আমরা শহরের উত্তর সীমানায় এসে পড়ি। এখানে পুব-পশ্চিম লম্বালম্বি পিচঢালা নতুন বাইপাস। উত্তরে যতদূর চোখ যায়, ধু-ধু-প্রান্তরের পর সবুজ একফালি গ্রাম, মাঝখানটা একেবারেই সুনসান। লোকটি পথের পাশের মাটির ডেলায় কেড্‌স ঠুকে, 'এটা ঠাকুরগাঁও ভিউপয়েন্ট' বলে, বাঁকা হেসে ঘোড়সওয়ারির বিপুল বিক্রমে পুবদিকে চলে গেল।

আমি তো অবাক। হাসতে হাসতে নিজেকে কোথায় যে নামিয়ে ফেলি! প্যারালিগ্যাল লোকটি পায়ের তলায় ইট-সিমেন্ট নয়, যেন আমাকেই ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেল।

তখন বাইপাস থেকে নেমে একটা গরুরগাড়ি দূরের সেই গাঁয়ের দিকে যাচ্ছিল। খানিক দূরে উঁচু লোহার পুল, তার ওপারে মাঠের প্রান্তে ঝিরঝিরে হাওয়ার আমগাছ। আমি উত্তর দিগন্তের যেখানটায় পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া, হয়তো-বা ঠাকুরগাঁও থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, সেদিকে চোখ রেখে হাঁটতে লাগলাম। আমার চারপাশে গোধূলির

যদিও জমাট-ছায়া এখন সর্বত্র। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটুখানি বসব বলে নীচে চোখ ফেলতেই দেখি, আমার একহাত দূরে একটি কবর। ছোট্ট, আনকোরা, কাঁচা। পাশেই আমার মাপের আয়তাকার আরও একটা। এ কোথায় এসে পড়লাম!

লাল রং। এতক্ষণে বাচ্চাদের খেলনা-প্রায় দূরের সেই গরুরগাড়ি বাদ দিলে, জায়গাটা একদম জনশূন্য, যেন-বা মৃতপুরী। শহরের লোকেরা কেন যে এমন নিরিবিলি খোলা জায়গায় হাওয়া খেতে আসে না! যত্তো সব কূপমণ্ডূক। আমি পুল পেরিয়ে আরও খানিকটা হেঁটে রাস্তার বাঁদিকের আমগাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। যদিও জমাট-ছায়া এখন সর্বত্র। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটুখানি বসব বলে নীচে চোখ ফেলতেই দেখি, আমার একহাত দূরে একটি কবর। ছোট্ট, আনকোরা, কাঁচা। পাশেই আমার মাপের আয়তাকার আরও একটা। এ কোথায় এসে পড়লাম! আমি কয়েক লাফে, জানি না কটা কবর ডিঙিয়ে, রাস্তায় গিয়ে উঠি।

রাস্তার ধারেও সারবন্দি কবর। পুলের এপার-ওপার কোথায় যে নেই! তার মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ সিমেন্ট বাঁধানো, মৃত্যুর সন তারিখ খোদাই করা কবরও আছে। যদিও তুলনায় বেশ কম। এই যে চুনকাম করা, চোখে না-পড়ে যায় না এমন সব সাদা ফকফকে কবরগুলো আসার পথে কোথায় ছিল? বাঁশের কঞ্চি-ঘেরা এক কি দুই বছরের পুরনো কবরও যত্রতত্র। এগুলো কয়েক দণ্ডে গজিয়ে-ওঠা যেমন সম্ভব নয়, আগে চোখে না-পড়াটাও মনে হল তেমনি অসম্ভব ব্যাপার।

আমি ভিউপয়েন্ট না ছাই, হাসতে হাসতে কবরখানায় ঢুকে পড়েছি। এখন যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গেস্টহাউসের দিকে পা চালালাম। আমার পায়ে পায়ে কবরের সংখ্যাও চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলল। ছোট্ট একটুখানি শহর, চোখের সামনে মুছে গিয়ে, দিনের শেষ আলোয় আর কিছু নয়, আস্ত একটা কবরখানা হয়ে উঠতে পারে— এ যে অবিশ্বাস্য!

ছয় বছর আগে

রানি! রানি তুমি যেখানেই থাকো, আমি আর পারছি না, প্লিজ বেরিয়ে এসো।

আমি পরিত্যক্ত কুয়োর পাথরের গোল বেষ্টনীর ওপর দাঁড়ানোর সময় চাইছিলাম, কেউ আমাকে ডাকুক।

ফিরে এসো রানি-ই-ই-ই।

আমার নাম দূরের তৃণ-গুল্মহীন পাহাড়ের পাষাণ বুকে ধ্বনিত হোক।

রানি নেই! হায় রানি তুমি কোথায়?

মরুভূমি অন্ধকার করে ধূলির ঝড় উঠুক।

মাত্র ছয় বছর আগেকার কথা।

আমি জানি, ছয় বছর আগে হলে, আজকের এ-অবস্থায় আমার ঠিক রাগ হত কিংবা কান্নাও হয়তো পেতে পারত। কাঁদতে কাঁদতে আমি দ্বিতীয়বার গেস্টহাউসে ফেরার পথ হারিয়ে ফেলতাম। এখন ভয় পেলেও আমি দেখলাম, একেবারেই কাঁদছি না। এছাড়া মনে হল, প্যারালিগ্যাল লোকটি আমাকে দুহাতে মাথার ওপর তুলে, 'ভিউপয়েন্ট দেখতে চাস তো যাহ' বলে কবরখানায় তো ছুঁড়ে দেয়নি। আমি যে গরুরগাড়ির পথ ধরে দিগন্ত ছুঁতে চাইব, সেটি তার জানার কথা নয়। সত্যি বলতে কী, আমাদের আলাপ-পরিচয়ও মোটে দিন চারেকের। তা-ও আবার পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়ার কানি-কানচিতে কার স্বামীর চার বিয়ে, কে তালাকের দু'বছরের মাথায় দেনমোহরের টাকা পেল না, মৌলবি-মাতব্বর একশো এক দোররা মেরে কোন বিধবাকে একঘরে করল— এমন সব দেওয়ানি আর ফৌজদারি বিষয়ে। তার মধ্যে যখন যেখানে যেতে চেয়েছি, লোকটি দু'চাকার পক্ষিরাজে চড়িয়ে আমাকে ঠিক অকুস্থলে নিয়ে গিয়েছে। দিনমান মোটরবাইক এক-ঠ্যাংয়ে দাঁড় করিয়ে সে কারও উঠোনের বেলতলায় কী খড়ের গাদায় ঠায় বসে থাকত। আমি ঘরের ভেতর পিঁড়ি বা জলচৌকিতে বসে মেয়েদের সাক্ষাৎকার নিতাম। এছাড়া গাঁয়ের লিকলিকে বাচ্চারা কিলবিলিয়ে আমাকে ছেঁকে

ধরলে, সে হর্ন বাজিয়ে তাদের তাড়িয়েছে। হর্নে কাজ না হলে, হাতের কাছে লাঠি-সড়কি যখন যা পেয়েছে, তা-ই দিয়ে উঠোনময় বাচ্চাদের দাবড়িয়ে বেড়াতেও আমি তাকে দেখেছি। তবে কিনা সেসবই হাসতে হাসতে, একরকম খেলাচ্ছলেই বলা যায়।

গত ক'দিন ধরে এসব নিজের চোখে দেখা। কোনটা যে বিশ্বাস করব? দিন শেষে সেই অতন্দ্র প্রহরী আমাকে কবরখানায় ছুঁড়ে না দিক, ছেড়ে তো দিল! আমি একটি শহরের জন্ম থেকে আজ অবধি যত মুসলমান মৃত, তাদের কাঁচা-পাকা, নতুন-পুরনো কবরে গিয়ে পড়লাম। এক কবরের মাথা, অন্য কবরের পাশ, আরেক কবরের বেড়া, যখন যা চোখে পড়ছিল, এমনভাবে দেখতে দেখতে পালাচ্ছিলাম, যেন হন্তদন্ত হয়ে আমি আমারটা খুঁজছি, অথচ কোথায় জানি না।

বছর ছয় আগে, ঘর-ছাদ-গাছতলা-আঙিনায় শ'খানেক বিছানার মধ্যে বুঝতে পারছিলাম না, কোনটা আমার। সবগুলো ছিল দেখতে প্রায় একইরকম। পায়ের কাছে রাখা সন্ধ্যারাতের কম্বল-বালাপোশ, মাঝরাত্তিরে টেনে নিয়ে আগাপাশতলা সবাই মুড়ে রেখেছে। আলো বলতে দূরের আকাশের ওই মিটিমিটি তারাদের। সব মিলিয়ে জায়গাটায় গা-শিরশির করা একধরণের রহস্যময়তা ছিলই। আর আমিও তখন বেপরোয়া। যার ফলে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে, একসময় গা-ঢাকা ধরে টান মেরে একজনকে জাগিয়ে দিয়েছিলাম। লোকটা যে কে! যখন ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল, পাখির উড়াল-দেয়া ডানার মতো একজোড়া বাঁকানো গোঁফ দেখে, আমি তাকে চিনতে পারি—রাণা প্রতাপ সিং। সেদিন দুপুরেই গৃহস্থ বাড়ির মাটির দেওয়াল-জুড়ে একহাতে তলোয়ার, আরেক হাতে একমুঠো ঘাস ধরা চিত্রার্পিত রাণা প্রতাপকে নীল ঘোড়ার ওপর বসে থাকতে দেখেছি। 'মুঠো ভর্তি ঘাস কেন? ঘোড়ার খাবার নাকি!' আমার এই অজ্ঞতায় যারপরনাই বিরক্ত হয়ে, জাঠ রামলাল জানায়, 'না! যতদিন মুঘলদের না হারাতে পারবে, রাজপুত রাণা ততদিন ঘাস চিবোবে, তবুও নেড়েদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না।'

রাজস্থানের বীর রাণা প্রতাপ সিং, আরাবল্লির দুর্ধর্ষ পাহাড়ি ইঁদুর রাণা প্রতাপ সিং। আমি কম্বল ছেড়ে 'সরি' বলে সুড়সুড়িয়ে দু'তিনখানা বিছানা পিছিয়ে যাই। রাণা প্রতাপের মতো লোকটি জানি না কী ভেবে আবার শুয়ে পড়তে পড়তে আমার দিকে ঘুরে তাকাল। আমি কি অন্ধকারে তখন একজোড়া জোনাকির নীল আলোর হঠাৎ জ্বলে-ওঠা দেখতে পেয়েছিলাম?

সারাদিন এত গা-পোড়ানো গরম গিয়েছে! রাতে পাথরের গুহা-ঘর ছেড়ে যার যার দড়ির

আমার দু'মাসের দাম্পত্য জীবন দেখতে দেখতে কখন যেন ঘরে-বাইরে বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। সিদ্ধার্থ ও আমার মাঝখানে জ্বলছে রাবণের চিতার দাউদাউ আগুন। ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে লঙ্কাকাণ্ডের ভয়ে আমি আবার পিছিয়ে আসি।

চারপেয়ে, কম্বল-চাদর নিয়ে খোলা আকাশের নীচে সবাই বেরিয়ে আসে। শুরুতে উৎসব উৎসব মনে হলেও মাঝরাত্তিরে শ'খানেক বিছানার ভেতর আমি আমার শোবার জায়গাটি হারিয়ে ফেলি। খুঁজতে খুঁজতে একসময় মনে হল, চারদিকে রাজপুতানার বীর যোদ্ধারা সব মরে পড়ে গিয়েছে। জানি না, সিদ্ধার্থ কোথায়।

একরকম জোর করে মে মাসের কুকুর-খেদানো গরমে সিদ্ধার্থ আমাকে রাজস্থানে নিয়ে গিয়েছিল। রেজিস্ট্রি করার পর, দু'মাসের মাথায়, ওর কাজের সূত্রে গেলেও, সেই ছিল আমাদের কলকাতার বাইরে প্রথম কোথাও যাওয়া। সকালে জেগে উঠেই ট্রেন থেকে দেখেছিলাম, মাইলের পর মাইল ধু-ধু বালি, একটা-দুটো কাঁটা গাছ, বাবলার ঝোপ—এখানে-সেখানে। এই প্রথম আমার মরুভূমি দেখা, সিদ্ধার্থ তা জানে। তাই শুনতে পেলাম আপার বাঙ্ক থেকে নামতে নামতে সে বলছে, 'কী কেমন দেখছো, আসতে তো চাওনি।'

'চাই-নি-ই তো!'

'না এলে দেখতে পেতে?'

'দেখতাম না।'

'বাহ বাহ তাইতো! মরুভূমি কী এমন দেখার জিনিস।' বলতে বলতে ট্রেনের টয়লেটে গিয়ে ঢুকল সে।

আমি জানলার বাইরে তাকিয়ে এবার উটের কাঁটাগাছের পাতা-খাওয়া দেখছি। খানিকটা যেতে লম্বা লম্বা গলা দুলিয়ে, এগিয়ে এল একপাল বাহারি উট। সিদ্ধার্থ টুথব্রাশের জল ঝাড়তে ঝাড়তে ট্রেনের কামরায় ঢুকে যেন-বা গলাও ঝাড়ল, 'তোমার পূর্বপুরুষেরা তো আরব-পারস্য থেকে আসা বেদুইন। রাজস্থানের মরুভূমি তুমি আর কী দেখবে।'

তারপর একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চলল টানা চার রাত...

'তোমার পূর্বপুরুষেরা মরুভূমির বেদুইন। রাজস্থানের কালবেলিয়ারা যেমন।'

'তোমাকে কে বলেছে? আমি জানি, আমাদের বংশতালিকায় আছে, মায়ের দিক থেকে আমরা সরাসরি সিডিউল কাস্ট থেকে কনভার্টেড মুসলিম। আর বেদুইন যদি হয়েও থাকি বাবার দিক থেকে, বেশ তো।'

'তুমি রাজস্থানে আসতে চাওনি।'

'চাইনি।'

'কেন?'

'তুমি তোমার কাজে এসেছ। আমি কারও লেজ ধরে কোথাও যেতে চাই না— তাই।'

'সরে শোও। আমি এক দুই তিন গুনব।'

চলে আসার আগের রাতে, একখানা দড়ির চারপেয়ে। কোথায় যে সরে শোব! আমি ওর গোনাগুনতির ধাক্কায় বিছানা থেকে উঠতে যাব, সিদ্ধার্থ যে স্বামী হিসেবে কতটা উদার, যেন সেটি প্রমাণ করতেই স্ত্রীকে চারপেয়ের সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে, চাদর-বালিশ নিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে গেল মেঝের ধূলি-ধূসর কার্পেটে। আমার সারা গায়ে তখন চাকভাঙা মৌমাছির অজস্র হুলের আক্রোশ। পাথরের ঘরের একমাত্র চৌখুপি ছাড়া কেবল দরজাটা খোলা। মাঝরাতে শীত পড়বে। তার আগে দুয়ার বন্ধ করার নিয়ম নেই। সিদ্ধার্থের নাক-ডাকার শব্দ কানে আসতেই আমি পা টিপে-টিপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।

বাইরে গোটাকতক চারপেয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। গতরাতের মতো গরম হলেও আজ বাইরে কোনও বিছানা পড়েনি। ওয়ার্কশপ শেষ। ভোরের আলো ফুটলে ফোক আর্টিস্টরা যে যার বাড়ির পথ ধরবে। তারা যাবে যোধপুর, জয়সলমীর, পুষ্কর— রাজস্থানের প্রত্যন্ত আর সব গ্রামে গ্রামে। এখনও তাদের কয়েকটি ঘরে আলো জ্বলছে, সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের টুং-টাং আওয়াজ। পাশাপাশি আড়াআড়ি ঘরগুলোর মাঝখানের চিলতে পথে লোকজনের আনাগোনা। আমাকে এ-অবস্থায় দেখে ফেললে ভূত ভেবে তারা আবার চেঁচিয়ে না-ওঠে, দাঁড়িয়ে তো আছি নিমগাছের তলায়। এছাড়া শুনেছি, আরাবল্লি পাহাড় থেকে নীলগাই দলবেঁধে কলতলায়, নর্দমায় জল খেতে আসে। তারা আসে কাঁটাঝোপের অন্ধকারে গা-মিশিয়ে, বালির ওপর নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে। হোক না নিরীহ প্রাণী, বন্য তো বটে।

আমার দু'মাসের দাম্পত্য জীবন দেখতে দেখতে কখন যেন ঘরে-বাইরে বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। সিদ্ধার্থ ও আমার মাঝখানে জ্বলছে রাবণের চিতার দাউদাউ আগুন। ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে লঙ্কাকাণ্ডের ভয়ে আমি আবার পিছিয়ে আসি। বাইরে তবু স্বস্তি। নীলগাইয়ের

নিঃশব্দ গতিবিধি ছাড়া। দুঃখ যে, গতরাতের সারবন্দি বিছানার গোলকধাঁধা আজ আর নেই। নিজের বিছানা খুঁজতে খুঁজতে একসময় রাণা প্রতাপকে জাগিয়ে তোলা, আমি এখন চাইলেও আর পারছি না।

তারায় তারায় ভরা বিশাল আকাশের নীচে গতকাল ছিল আমার প্রথম রাত্রিবাস। স্লিপিং ব্যাগ বিছিয়ে, পায়ের কাছে ভোর-রাতের কম্বল আরও অনেকের দেখাদেখি ভাঁজ করে রেখে, সিদ্ধার্থ ও আমি শুয়ে পড়েছিলাম। শুরুতে শোয়ার জায়গা নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তারপর কোন ফাঁকে, সে দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার তখন মনে হল, আমি এখানে আটকা পড়ে গিয়েছি, কোনওদিন দেশে ফিরতে পারব না। কী করে যে কোথায় চলে এলাম! আর কেন যে! সিদ্ধার্থের ঘুমন্ত মুখ আমার ভীষণ অচেনা লাগছিল।

দূরে কোথাও বাজনা বাজছে। খানিক পর কারা যেন গাইতে শুরু করল 'দমাদম মসত ক্যালেন্দর' গানটি। রুনা লায়লার মতো করে একবারেই না, অনেকটা জিগির তুলে, কাওয়ালির ঢঙে এরা গাইছিল। এ-অবস্থায় সিদ্ধার্থের পাশে শুয়ে না থেকে, আমি ভাবলাম, নিশাচর পাখির ডালে ডালে ওড়াউড়ি অনেক ভালো।

মানুষ তো মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে। আমি কি তা-ই দেখতে পাব বলে, গতরাতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলাম?

সারাদিন রাণা প্রতাপকে আর কোথাও দেখা গেল না। রাজস্থানে বাঁকানো-মোচড়ানো গোঁফের অভাব নেই। কিন্তু চায়না-ব্লু চোখের কেউ, যেমনটা কিনা দেওয়ালচিত্রে ছিল, ওয়ার্কশপের চৌহদ্দিতে থাকলে, আমি শ'খানেক লোকের ভেতর ঠিকই তাকে চিনতে পারতাম। সে কি দিনের বেলাটা দেওয়ালের গায়ে গা-জড়িয়ে থেকে, রাতের অন্ধকারে নীল ঘোড়ায় চড়ে খটখটিয়ে বেরিয়ে আসে? আরাবল্লি পাহাড়ের দিকে কান পাতলে কয়েকশো বছরের পুরনো সেই অশ্বক্ষুরধ্বনি আজও বুঝি শোনা যাবে। মানুষের পরাধীনতা যে চিরন্তন নয়, তার আশ্বাসবাণী যেন ভেসে আসে, ছায়া-ছায়া দূরের ওই পাহাড় থেকে।

এখন আরাবল্লির মাথায় একখানা ভাঙা চাঁদ ঝুলে আছে। সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই এখনও ঘুমিয়ে। কাল রাতে রাণা প্রতাপকে জাগিয়ে দিয়ে, আরও কিছুটা সময় এলোপাতাড়ি ঘোরার পর বিছানাটি যখন খুঁজে পেয়েছিলাম, সিদ্ধার্থ তখনও ঘুমোচ্ছিল। নাকি ঘুমের ভান করছিল সে? সারাদিন ওয়ার্কশপে লেকচার দিতে দিতে একেকটা সময় অন্যের বলার পালা আসে যখন, আমি ওকে ঠিক সেই সময়টায় হিসেব করে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছি। দিনদুপুরে। যেন

দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে, শরীর টান টান করে, নীচে যখন নিজেকে এক ঝটকায় ছুঁড়ে দেওয়ার কথা, তা না করে কুয়োর বেদি থেকে নেমে কী করব, কোথায় যাব যখন ভাবছি, তখন পিছন থেকে কে একজন সমস্ত শরীর দিয়ে জাপটে ধরে আমাকে। পিছন ফিরে পাখির উড়াল দেওয়া ডানার মতো বাঁকানো গোঁফের একটুখানি আমি কেবল দেখতে পেলাম।

ও বলবে, সবাই শুনবে। সবাই যখন বলবে, ও তখন ঘুমোবে, না হয় ঘুমের ভান করবে।

কাঁটাগাছে শনশন আওয়াজ। ওখানে বাতাস বইছে। ধীরে ধীরে ঠান্ডা হচ্ছে ধরিত্রী। ভোর হতে খুব বেশি হয়তো দেরি নেই। আমি না-পেরে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। এই যে অনীহা ঘরে ফেরার, আমার ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে, সে কি কেবল লঙ্কাকাণ্ডের ভয়ে? আর কিছু নয়? আমি অন্ধকারে বড়সড় একখণ্ড পাথরের গায়ে হঠাৎ যেন হোঁচট খেলাম। ভেতরের মানুষটি বাগে পেয়ে এবার আমাকে ঘিরে হাহাকার শুরু করে। তার কান্না এমন একজন ক্ষুধার্তের, যার পাতে খাবার রেখে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল অনন্তকাল ধরে।

আমি ভয় পেয়ে পাগলের মতো ছুটতে শুরু করি। ছুটতে ছুটতে ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াই।

ঘরের ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিয়েছে সিদ্ধার্থ। আমি কী করব বুঝতে না পেরে শুরুতে লোহার পাল্লায় আস্তে আস্তে বারকয়েক টোকা দিই। বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটিয়ে সময় দৌড়ে চলে যাচ্ছে। আমার মাথায় দাউদাউ আগুন। রাজস্থানের খটখটে শুকনো গরমেও কপাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম ঝরছে। আর খানিক আগের সেই মর্মভেদী হাহাকার, এখন গলা চিরে যেন বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে চিৎকার করতে করতে। শ'খানেক লোকের ঘুমন্ত উপস্থিতির কথা ভেবে, আমি আক্রোশের ধারালো ছুরি খাপবন্দি করি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। সিদ্ধার্থ কোনও সাড়া দিচ্ছিল না। সব মিলিয়ে নিস্তব্ধতা কয়েক দণ্ডই কেবল, তারপরই ছুরিটা যেন বন্য উল্লাসে ঝিলিক মেরে বেরিয়ে আসে। আমি ধৈর্যের খাপ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজায় ঘা মারতে থাকি— হাতে, পায়ে, দু'চারবার মাথায়। পিছনের ঘরের দরজা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে খুলে যাওয়ার পরও করাঘাত আমার থামে না। একসময় ঘুরে তাকিয়ে দেখি, দরজা বিঘতখানেক ফাঁক করে উল্টোদিকের ঘর থেকে কে একজন আমাকে দেখছে। আমি দ্রুত পায়ে আঙিনা পেরিয়ে বেরিয়ে যাই। কী অপমান! সিদ্ধার্থ যদি এখন তার সর্বস্ব দিয়েও ডাকে, আমি ওই ঘরে আর ফিরব না।

প্রথমে ভেবেছিলাম নিরুদ্দিষ্ট আমার এই যাত্রা। সঙ্গে কেউ নেই, কিছু নেই। এত রাতে কোথায় যাব জানি না। ওয়ার্কশপ ক্যাম্পাসের বাইরের জলশূন্য পরিত্যক্ত কুয়োটা কী জানি কেন, সামনে দেখে আমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ি। এখানে আসার দিন, এর ওপর নাগরদোলার মতো কপিকলের বাতাসে ঘোরা, টাঙা থেকে দেখেছিলাম। সিদ্ধার্থ তখন তর্জনী তুলে বলেছিল, 'ওই, ওখানে হল গিয়ে তোমার গন্তব্য।' তাই কি? আমি ততক্ষণে কুয়োর পাথরের গোল বেষ্টনীর ওপর উঠে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু ওর এই একটিমাত্র কথা, যা সেদিন ছিল দিক-নির্দেশনা মাত্র, সেটি এখন মনে পড়তেই প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে আমি বেদির বাইরে ছিটকে পড়লাম।

দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে, শরীর টান টান করে, নীচে যখন নিজেকে এক ঝটকায় ছুঁড়ে দেওয়ার কথা, তা না করে কুয়োর বেদি থেকে নেমে কী করব, কোথায় যাব যখন ভাবছি, তখন পিছন থেকে কে একজন সমস্ত শরীর দিয়ে জাপটে ধরে আমাকে। আমার সামনে অতল অন্ধকূপ। পিছন ফিরে পাখির উড়াল দেওয়া ডানার মতো বাঁকানো গোঁফের একটুখানি আমি কেবল দেখতে পেলাম। তারপর আমার কানের ওপর, দূরের ওই আরাবল্লির ঘোড়ার খটখট আওয়াজ, মানুষের অনুচ্চারিত ভাষা-ধ্বনি হয়ে অবিরাম ঝরতে লাগল।

উদ্ধারপর্বের পর, এই ভেবে আমার চোখ জলে ভরে উঠল যে, যে ছুটে এসেছে সে রাণা প্রতাপ সিং হলেও, দরজা খুলে সিদ্ধার্থ তো বেরিয়ে আসেনি! ওর কাজ তবে আমাকে মৃত্যুর দিকে দুহাতে ঠেলে দেওয়ার?

ছয় বছর আগে, রাজস্থানের জলশূন্য পরিত্যক্ত কুয়োর ধারে, আজ ভাবতে বেশ অবাক লাগে, রাতের শেষ প্রহর আমি কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছিলাম। আর সেইসঙ্গে মাত্র দুমাসের পুরনো বিবাহিত জীবনের খোলসটাও আমার গা থেকে খসে পড়েছিল।

লেমিংয়ের অন্তর্জলি যাত্রা

রাজস্থান থেকে কলকাতা ফেরার পর বুলবুলির একগুচ্ছ রঙিন ছবি আর লম্বা চিঠি এল। চিঠিটা পড়ে আমি ছবিগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার দেখতে থাকি। বুলবুলি সুইডেনের প্রথম শীতের চড়াই ভেঙে, এখন রোদ-ঝলমল গ্রীষ্মের উতরাই তরতরিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে।

লুন্‌ড্ থেকে মাল্‌মো লোকাল ট্রেনে দশ মিনিটের পথ— আগের চিঠিতে ও লিখেছিল। সমুদ্রের এপারে মাল্‌মো, ওপারে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন। যখন খুশি ফেরিতে এপার-ওপার করা যায়। তাও ৪৫ মিনিটে। এবারের জুমক্যামেরায় ওর শাটার টেপার শুরু মাল্‌মোর সি-বিচ থেকে। তারপর কোপেনহেগেনের ওয়াকিং স্ট্রিটের উন্মত্ত কালো গায়ক, সাদা বাজনদার। সমুদ্রের সবুজ জলরাশিতে ফ্রেমের চারভাগের তিনভাগ ডুবিয়ে, মাথার দিকে দূরের ভাসমান স্পিডবোট ধরা হল, পাখির ছুটন্ত শুভ্র পালক নিঃসীম সবুজতায় কতটা বিস্ময়কর, সেটা দেখাতেই কি? বুলবুলির কাঁচা হাত, আনাড়ি চোখ তারপর হান্স অ্যাণ্ডারসনের মৎস্যকন্যার অলৌকিক সেই লেজটার ওপর। কোপেনহেগেনের উপকণ্ঠে পায়ের পাতা-জলে লেজ ডুবিয়ে, পাথরের চাঁইয়ে বসে আছে যে, সে একদিন পুরুষের বিশ্বাসঘাতক প্রেমের কাছে যে হেরে যাবে, সেটি না বুঝে পাতালের রাজপ্রসাদ থেকে জিব খসিয়ে ডাঙ্গায় উঠে এসেছিল— ছবিতে তার এখন চোখের কাছ থেকে মুণ্ডুটাই কাটা। তাই হয়তো চিঠিতে লিখেছে, 'খুঁত ধরতে যেও না প্লিজ।' কিংবা 'মৎস্যকন্যার হারানো লেজের গুরুত্ব আমার কাছে অনেক বেশি। সেটা ধরতে গিয়ে মাথাটা না-হয় কাটাই পড়ল— ক্ষতি কী।' অপরাজেয় বুলবুলির অতিচেনা কৈফিয়ত। সবচেয়ে দুর্বোধ্য যা, তা হল আস্ত একরিল ছবির কোথায়ও নিজে না থেকে, স্বর্গের নন্দনকাননের টোপ ফেলে আমাকে যে কোন তীরে সে টেনে তুলতে চাচ্ছে, কে জানে। তার ওপর চিঠিতে আছে, 'রানি, জেনেশুনে তুমি এরকম একটা কাজ করলে? উফ, আমি ভাবতে পারছি না। আগুনে ঝাঁপ দেওয়া ঢের ভালো ছিল। তা বলে অগ্নিপরীক্ষায়! দুমাসে কী বুঝছ?' আমার বিপন্নতাকে যতটা পারা যায় উসকে দিতে— ব্যস এটুকুই। বাকিটা লুন্‌ড্ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি পর্যন্ত যেখানে যেখানে গিয়েছে এবং শীত শুরুর আগে যাবে যেখানে, সেসব নিয়ে।

বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে ইউরোপ নিয়ে ওর এই মাতামাতি, শ্বেত জনবসতি যে, তবু আমি মেলাতে পারি না— বুলবুলিই তো! যে নাকি পাহাড়ের পাদদেশের ইঁদুরজাতীয় প্রাণী লেমিংয়ের মতো, যেখানে শীত নেই, রোদ নেই, খাবারের কষ্ট নেই, এমন এক অজানা কল্পিত রাজ্যের অভিমুখে ছুটতে চেয়েছিল এই ভেবে যে, এরকম কোনও জনপদের তোয়াক্কা না করে, সমুদ্র অবধি এই লেমিংরা পৌঁছে যায়। তারপরও থামে না ওরা। মৃত্যু ছাড়া কেউ তাদের থামাতে পারে না। বুলবুলিরও-তো থামার কথা নয়, স্বর্গে যদি উঠেও যায় সেখানেও।

আমরা আসলে আশির দশকের শেষাশেষি দ-মার্কা ভূখণ্ডের বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে যেতে চাইছিলাম, পাহাড়-সমুদ্র-মরুভূমি যেখানেই হোক, কোনও এক জায়গায়। লেমিংদের মতো দানাপানির কষ্ট আমাদের ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের হল-পর্ব শেষ হলে, মাথার ওপর থেকে ছাদ নয়, আজন্মের আকাশটাও সরে গিয়েছিল। আমরা তখন বেজায় হিমশিম খাচ্ছিলাম। সারাদিন খুঁজে খুঁজে বাড়িভাড়া পাওয়া যায় না। যদিও পাওয়া যায় ওখানে আবার পাড়াপড়শির কৌতূহল। একবার তো কথা নেই বার্তা নেই, বিকেলে ঘরে ফিরে কাপড় ছাড়ছি, পাশের ফ্ল্যাটের গিন্নি হামাগুড়ি দেওয়া বাচ্চা নিয়ে ভিজিট করতে এলেন। 'দুদিন ধরে আসব আসব করি, আসা হয় না।' কোল থেকে বাচ্চাটিকে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে উনি বিছানায় বসতে বসতে বললেন, 'আহা মেয়ে দুটি একা একা কী খায়, না-খায়... এই পল্টু খবরদার ছাই খাস না। ওমা অ্যাশট্রে দেখি! বাড়িতে পুরুষ লোক তো নাই। কে খায় গো?' একদিন আমি বাড়িতে নেই, ঠোঁটকাটা বুলবুলি বাড়িউলির মুখের ওপর ওইরকম এক প্রশ্নের জবাবে বলে দিল, 'কেন আমরা! আমরা খেতে পারি না?'

কথাটা প্রতিবেশী মহিলার মাধ্যমে চাউর হয়ে গিয়েছিল দুদিন আগেই। বাড়িউলির ঘটনার দিন, রাতদুপুরে দরজা-জানালায় দমাদ্দম ইট পড়ল। আমরা তো ভয়ে কাঁপছি, এই বুঝি বাড়ি-ছাড়ার নোটিস ঝুলিয়ে রাতকাপড়ে উঠে আসবেন প্রবল পরাক্রান্ত বাড়িওলা। ওমা, পরদিন নোটিসের বদলে আকর্ণ হাসি ঝুলিয়ে, কড়া পারফিউম মেখে সেই ইনি এলেন, স্পষ্টতই বউ-বাচ্চাদের চোখে ধুলো দিয়ে। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি এমন সময় আসতে লাগলেন, যখন আমাদের দুজনের একজন বাড়ি থাকি না। অথচ একমাসও হয়নি, আমি নামমাত্র বেতনের যে চাকরিটা তখন করতাম, দুমাসের ভাড়া অগ্রিম নেওয়ার ছলে সেই অফিসে এসে আমার ডেজিগনেশন, অফিস-টেবিল এমনকি কিচেনটাও ঘুরে ঘুরে তিনি দেখে গিয়েছিলেন, বিয়ের আগে কনের জাতকুল দেখার মতো করে। এখন আমরা কুলটা! ঘরে অ্যাশট্রে আছে যে। অন্যদিকে বাড়িওলার বক্তব্য হচ্ছে, রাতদুপুরে পাড়ার পুরুষেরা যদি দলে দলে চড়াও হয়, তিনি তখন আমাদের বাঁচাতে দোনলা বন্দুকের ট্রিগার টিপবেন। তার বিনিময়ে আমাদেরও তো কিছু-না-কিছু করা দরকার, আর সেই বোঝাপড়াটা সারতেই দিন নেই রাত নেই যখন-তখন তার বরবেশে আসা-যাওয়া। কোথায় আমরা কৃতজ্ঞতায় লেজ নেড়ে কুঁই কুঁই করে তার পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ব, তা না, একদিন বুলবুলি ছবির ফ্রেম তুলে বাড়িওলার মাথায় কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। আমি তখন অফিসে। বুলবুলি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বিস্তারিত জানায়। তারপর এই বলে কথা শেষ করে যে, ঘরের দরজায় এখন বাড়িওলার চাইনিজ তালা ঝুলছে আর গেটের সামনে

শহীদ মিনারের চাতালটা অন্ধকার, অফ সিজন তো, বাতি জ্বালানো হয়নি। আমরা সিমেন্টের ঠান্ডা বেদিতে '৫২-র পর, এই প্রথম দুজন শহীদ হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। আমরা গুলি খাইনি, মাতৃভাষায় কথা বলা ছাড়া আমাদের আর কোনও অবদানও নেই, তবু নিজেদের শহীদ ভাবতে এতটুকু অসুবিধা হল না।

পাড়ার বাছা বাছা ডজনখানেক মাস্তান। কয়েকজন আবার শহর চষে বেড়াচ্ছে, আমাদের দেখামাত্র ফলায় গেঁথে তুলে নিয়ে যাবে বলে। শেষোক্তটি জনশ্রুতি, যা নাকি ঢাকার আকাশে-বাতাসে অনেকদিন পাক খেয়ে ঘুরেছিল।

সেই রাতে, আমরা বুঝতে পারছিলাম না কোথায় যাব, কী করব। বুলবুলির সঙ্গে ঢাউস একখানা ব্যাগ। বাড়িওলার মাথায় বাড়ি মেরে, কাছেপিঠে যা যা ছিল, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সে তাতে তুলে নিয়েছে। ব্যাগে কার কী আছে, জিপার খুলে দুজনের কারোরই দেখার ইচ্ছে হল না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ব্যাগটা পালা করে বয়ে বেড়াতে লাগলাম।

ক'মাস আগেও যে হোস্টেলের আমরা আবাসিক ছাত্রী ছিলাম, সূর্যাস্তের পর ঘণ্টা পিটিয়ে সেখানে মেয়েদের খোঁয়াড়ে পোরা, এখন তার উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। ভাবখানা এমন যে, এ-দৃশ্যটি আমরা এই প্রথম দেখছি, আগে কখনও দেখিনি। আসলে দেখিইনি তো। আমাদেরও যে তখন পোষা মুরগির মতো ঠেলেঠুলে ওতে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। আর পিছন থেকে শেয়াল-বেজি নয়, তাড়া করত সূর্যাস্ত আইন আর আমাদের পোষমানা স্বভাব।

'কেন যে আরও আগে হল ছাড়িনি!' সেদিকে তাকিয়ে বুলবুলি বিড়বিড় করে বলে।

আমি দেখি, সূর্যাস্ত আইন, মুরগির খোঁয়াড়ের বদলে ওর প্রতি সেই বিকেল থেকে তিলে তিলে রাগ জমে এখন আমার গলা পর্যন্ত উঠে আসছে। মুখ খোলামাত্র দলা পাকিয়ে সেটি ছিটকে বেরিয়ে গেল, 'হল ছেড়ে যেতামটা কোথায় শুনি?' আমি ওকে বলি, 'পথে পথেই তো এখন ঘুরে মরছি।'

'তখনও পথেই ঘুরতাম।' বুলবুলির নিস্পৃহ কণ্ঠ আমাকে কেমন ভয় পাইয়ে দেয়। আজ দুপুরে ও যা করেছে, মনে হল এখন ওইরকম একটা কিছু করে বসতে পারে। আমাকে ফেলে ও হনহনিয়ে একদিকে চলে গেলে, এই খোলা আকাশের নীচে আমি একা একা করবটা কী? তাই একরকম হাতজোড় করেই তাড়াতাড়ি বললাম, 'বুলবুলি কতক্ষণ আর পথে পথে ঘুরব, চল না শহীদ মিনারে গিয়ে বসি।'

এই প্রথম তর্ক না করে আমার প্রস্তাবটি ও সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল।

শহীদ মিনারের চাতালটা অন্ধকার, অফ সিজন তো, বাতি জ্বালানো হয়নি। আমরা সিমেন্টের ঠান্ডা বেদিতে '৫২-র পর, এই প্রথম দুজন শহীদ হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। আমরা গুলি খাইনি, মাতৃভাষায় কথা বলা ছাড়া আমাদের আর কোনও অবদানও নেই, তবু নিজেদের শহীদ ভাবতে এতটুকু অসুবিধা হল

ছোট্ট একটা আয়না সামনে ধরে রাস্তার আলোয় ঠোঁটে লিপস্টিক চড়াল একজন। গালে রুশ-ব্রুশ বুলোচ্ছে যে, তার হাতে কোনও আয়না নেই, পাশের মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে ওকে ডিরেকশন দিচ্ছে। পালাক্রমে এভাবে ওরা সাজগোজ সেরে এক ঝাঁকুনিতে শরীরটা তুলে বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়াল।

না। এই শহরে আমাদের ডজনখানেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, নিজেদের আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি, এছাড়া দুজন না হোক একজনের তো একটা চাকরিও আছে— তারপরও এখানে আমাদের বাঁচার উপায় নেই। এই যে নেই, থাকবে না অর্থাৎ আমরা বাঁচতে পারব না, তাতেই একধরণের শহীদীভাব আমাদের ভেতর জেগে উঠল। সত্যি বলতে কী, এখানে আসার আগে আমাদের এই জীবন-বাজি-রাখা লড়াইয়ের কোনও নাম ছিল না। কেন করছি, কীসের জন্য করছির চেয়েও বড় কথা, আমাদের এই যে প্রাণান্তকর বিড়ম্বনা অনেকের কাছেই যা অর্থহীন-ফলাফলশূন্য, এমনকি নিজেরাও নিশ্চিত ছিলাম না শেষ পর্যন্ত এ থেকে কী পাব, শহীদী সীমারেখা অর্থাৎ কী আর হবে, মরে যাব, শহীদ হব— আমাদের পথের এই শেষটুকু দেখিয়ে দিতে শহীদ মিনার মশাল জ্বালিয়ে দিল। মশার তাড়া না খেলে কে জানে আমরা হয়তো সেদিন এই আত্মতৃপ্তিতে সেখানে ঘুমিয়েই পড়তাম।

দুজন একসঙ্গে মশার কামড়ে টিকতে না পেরে খানিকক্ষণ পর উঠে বসি। অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের মুখোমুখি যে-কটা কংক্রিটের ধাপ শহীদ মিনারের চত্বরে ওঠার, ওখানে তিনজন মেয়ে এখন বসে বসে সাজগোজ করছে। ছোট্ট একটা আয়না সামনে ধরে রাস্তার আলোয় ঠোঁটে লিপস্টিক চড়াল একজন। গালে রুজ-ব্রুশ বুলোচ্ছে যে, তার হাতে কোনও আয়না নেই, পাশের মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে ওকে ডিরেকশন দিচ্ছে। পালাক্রমে এভাবে ওরা সাজগোজ সেরে এক ঝাঁকুনিতে শরীরটা তুলে বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়াল।

পিছন ফিরে হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়ে, বাকি দুজনকে হাত তুলে দেখায় একজন। খানিক গোল হয়ে তাদের মধ্যে শলাপরামর্শও চলে। তারপর অন্ধকারে শরীর দুলিয়ে ললিত ভঙ্গিতে তাদের এগিয়ে আসতে দেখে আমরা আবার শুয়ে পড়ি। আমাদের মাঝখানের দূরত্ব আর মাত্র সাত-আট হাত। ভূত দেখার মতো তাদের একজন সেখানে চমকে থমকে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে বাকি দুজন। তাদের শরীরের দুলুনিও যেন অদৃশ্য কোনও সাপুড়ের বাঁশির সুরের সঙ্গে হঠাৎ থেমে গিয়েছে। দলনেত্রী ফণা তোলে। 'এহ-হে, দু-দুটাই মেয়েছেলে,' বলে ঘাড় বেঁকিয়ে বিষ-ঢালার মতো করে একদলা থুতু ছিটায় সে। আমরা দুজন খিলখিলিয়ে হেসে উঠি। আমাদের চোখের চশমা, বুলবুলির চুলের বয়কাট, আমার পনি-টেল, তদুপরি পুরুষের ধরণের পোশাক-আশাক, অন্ধকারে তাদের বিভ্রান্ত করেছিল।

তিনজন অদূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায় একটাই। সিগারেটের আগুন অন্ধকারে ঘুরতে থাকে একজনের হাত থেকে আরেকজনের হাতে ত্রিভুজাকারে। হঠাৎ প্রকাশ্য দিবালোকে না হোক, ঘরের বাইরে, রাতের বেলায় বুলবুলি ওদের দেখাদেখি সিগারেট জ্বালায়। যেন মৌচাকে মোক্ষম একটা ঢিল পড়েছে, ওরা সঙ্গে সঙ্গে ভনভনিয়ে আমাদের দিকে তেড়ে এল। 'তোমরা পুলিশের ক'গণ্ডা টাকা দ্যাছেন যে, আমাদের জায়গাটা অরা আপনাদের দিয়া দেলো?'

'পাঁচগণ্ডা।' আমি অন্ধকারে হাতের পাঁচ আঙুল তুলে দেখাই। বুলবুলি ভোঁস ভোঁস করে সিগারেট টানছে। ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমিও তাতে টান দিই।

'একটা বিহিত করতেই অয়। পুলিশ শালারা মরেছে নাকি, কনে গেল?' একজন অসহায়ভাবে চারপাশে তাকায়। অন্যজন ফোড়ন কাটে, 'টাকা পাইয়্যে মৌজ করতে নেগেছে।' তৃতীয় জন অকস্মাৎ গর্জে ওঠে, 'এই মাগিরা যা, এইহান আমাদের জাগা।'

'আমাদেরও', শুয়ে শুয়েই আমরা বলি।

'কী-ই'— সে কোমর বেঁধে এগিয়ে আসতে চাইলে বাকি দুজন দুপাশ থেকে তাকে টেনে ধরে। আমরাও আত্মরক্ষার স্বয়ংক্রিয় তাগিদে ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছি। তারপর কী যে হত, যদি না দুজন পুরুষ 'এপথে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি'-র চালে এগিয়ে না আসত, কে জানে। মেয়ে তিনজন আমাদের ছেড়ে কার আগে কে যাবে প্রতিযোগিতায়, এমন পড়িমরি করে পুরুষ দুজনের দিকে ছুটল যে, এখন হাতাহাতি-ঝগড়াঝাঁটি যা হওয়ার, আমরা বুঝতে পারলাম, তাদের নিজেদের মধ্যেই হবে।

'দেখলে তো রানিবাই, হোক না ফ্লোটিং, তবু তাদের যাওয়ার জায়গা আছে। আমরা না আকাশে, না মাটিতে। বিয়ে করো, না হয় বেশ্যা হয়ে যাও বুঝলে?'

আমি ব্যাগটা কাঁধে তুলে বুলবুলিকে বললাম, 'চলো, আজ রাতের মতো কোনও হোটেল-টোটেলে গিয়ে উঠি। কালকের কথা কাল ভাবব।'

হোটেলের চৌকো ঘরটিতে একটা দরজা ছাড়া জানলা, ভেন্টিলেটর কিচ্ছু নেই। তাও আমাদের ঘর দিয়েছে, হাতে ব্যাগ ছিল বলে। আশ্চর্য যে এমন একটি বন্ধ ঘরের একপাশের দেওয়াল জুড়ে কোনও দেশ-মহাদেশের নয়, গোটা পৃথিবীর ৬ বাই ৫ ফুটের বিশাল মানচিত্র। আমরা ক্ষুদা-নিদ্রা ভুলে, দরজার দু-দুটো ছিটকিনি তুলে দিয়ে, মানচিত্রটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে ডবল বিছানার ওপর পেতে দিলাম। বুলবুলি পেন্সিল নিয়ে বসল। 'এই যে দেখছ বাল্টিক সাগর, তার পাড়ে স্টকহোম।' এতটুকু শুনে আমি ভাবলাম, বুলবুলি বুঝি আমাকে ভূগোল শেখাচ্ছে। ওমা তারপর দেখি ও বলছে, 'ওখানে অ্যাডমিশন না পেলে ওই যে দক্ষিণে সমুদ্র থেকে সামান্য একটু দূরে লুন্ড্, যদিও

আমরা ক্ষুদা-নিদ্রা ভুলে, দরজার দু-দুটো ছিটকিনি তুলে দিয়ে, মানচিত্রটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে ডবল বিছানার ওপর পেতে দিলাম। বুলবুলি পেন্সিল নিয়ে বসল। 'এই যে দেখছ বাল্টিক সাগর, তার পাড়ে স্টকহোম।'

এই ম্যাপটিতে নেই, সেই লুন্ড্ই সই। জানো, শহরটা খ্যাত কেবল ইউনিভার্সিটির জন্য!'

আশ্চর্য আমি যেন ওকে চিনতে পারছি না, নতুন দেখছি। একদিনে এত পরিবর্তন! টোয়েফল দিচ্ছিল জানতাম, ও তো ফ্রেঞ্চ ভাষাও শিখছে। ম্যাপ দেখতে আমার ভালো লাগে। হাতের তালুর মতো রেখাগুলোর দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়েও আমি থাকতে পারি। এখন ম্যাপটা একদিক থেকে টেনে ধরে, কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিল। বুলবুলি আজ আমাকে সব বলবে, এমন পণ করে পেন্সিলের ছুঁচলো ডগাটা এবার ও আটলান্টিকের ওপর রাখল।

'তুমি কী ভেবেছ আমি লুন্ডের মতো একটা ছোট্ট জায়গায় পড়ে থাকব? না রানি। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এই বান্দা চলে যাবে খোদ আমেরিকায়। তারপর...'

আমি চিৎকার করে কথার মাঝখানে ওকে থামিয়ে দিই, 'আর আমি, আমি কী করব?' অসহায়তায় আমার গলার স্বর মাঝপথে ভেঙে যায়।

'তোমার তো সব ঠিকঠাক। অফিস দিল্লি পাঠাচ্ছে ফিল্ম-কোর্স করতে।'

'ও তো মাত্র তিন মাসের।'

'তিন মাসের জন্য তো কী। তুমি থেকে যাবে, ফিরবে না। তোমার এই রোমান্টিক মনটা কোন দিনের আর কীসের জন্য শুনি? কাজে লাগাও, বুঝলে কাজে লাগাও। সমস্যা হল, তোমার তো আবার বাঙালি না-হলে হবে না...'

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। সহস্রাধিক পাতা। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

তৃতীয় মুদ্রণ। ₹৩৫০

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগঅন করুন

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** info@swarnakshar.in

ভ্রমণ কথা

সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ

অথবা বল্গাহরিণের খোঁজে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২০০৬-এর জুনের গোড়ায় গিয়েছিলাম মস্কোয়, ওয়ার্ল্ড এডিটর্স ফোরামের নিমন্ত্রণে। সেই সুযোগে, সম্মেলনের শেষে, আমাদের দৈনিক টিভি প্রোগ্রামের জন্য মস্কো আর সেন্ট পিটার্সবুর্গের ছবি তুলে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ট্রেনে চড়ে বসলাম। যাব হেলসিংকি।

সেখান থেকে আবার ট্রেনে, এবার চললাম কোমিয়োকি নদীর তীরে সুমেরুবৃত্ত-ঘেঁষা ছোট্ট শহর রোভানিয়েমি।

এভাবেই ট্রেনে বাসে ক্রমশ পৌঁছে গেলাম নর্থ কেপ। সুমেরুবৃত্তের ভেতরে ৭১ ডিগ্রি ১০ মিনিট ২১ সেকেন্ড উত্তরে।

হেলসিংকি থেকে রওনা হয়েছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের শহর হ্যামারফেস্ট দেখব বলে। নিয়তি নিয়ে গেল আরও উত্তরে, মনুষ্যবসতিহীন নর্থ কেপে। পথভ্রষ্টতার সে এক পরমাশ্চর্য প্রাপ্তি। সেখান থেকেই পরে সামান্য দক্ষিণে এসে পৌঁছেছিলাম হ্যামারফেস্টে।

হেলসিংকি থেকে বা আরও ঠিকমতো বলতে গেলে, রোভানিয়েমি থেকে হ্যামারফেস্ট পর্যন্ত এক অসাধারণ যাত্রাপথ। পথই সেখানে প্রকৃতির রূপকথা। এই ভ্রমণকথা সেই পথযাত্রার বিবরণ। তার বেশি কিছু নয়।

২

সেই নর্থ কেপে বাসে যাওয়া যায় শুনে মন আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। যদি হ্যামারফেস্টই যাব, তাহলে তারও উত্তরে নর্থ কেপ যাব না তাই কি হয়? কিন্তু সমস্যা হল রাত সাড়ে দশটায় পৌঁছে সেখানে থাকব কোথায়? সারারাত সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে শুধু সূর্যদর্শন করে নর্থ কেপের ঠান্ডায় কাটাব কী করে? খোঁজ খোঁজ, কী উপায়? যারা যায় তারা কী করে? পৃথিবীর নানা দেশ থেকে কৌতূহলীরা নর্থ কেপে আসে মধ্যরাতের সূর্য দেখতে। তারা ঘুমোয় কোথায়? যদি নাও ঘুমোয়, যদি বসে বা দাঁড়িয়েও থাকে, তারই বা কী ব্যবস্থা?

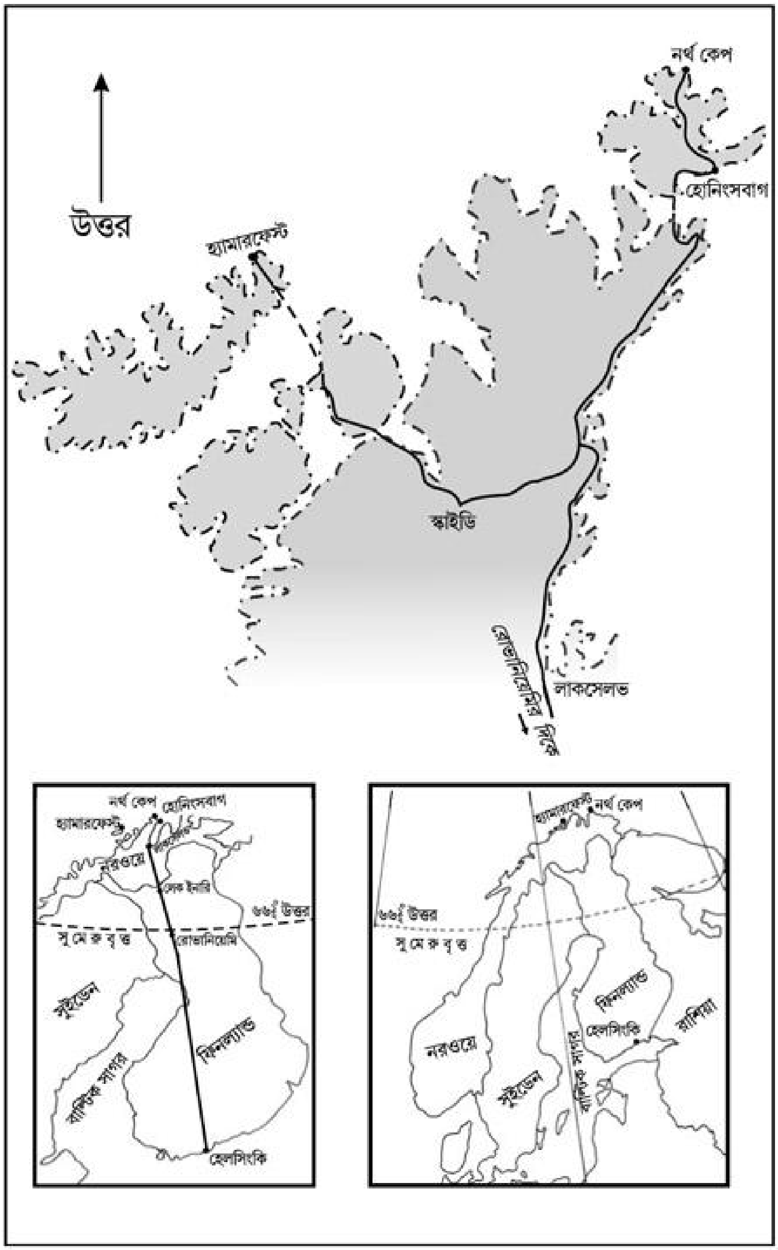

ওই বাসই নর্থ কেপ থেকে রওনা হবে রাত ১টায়। ৩৫ কিলোমিটার নেমে এসে বাসটা বাকি রাতটুকু কাটাবে হোনিংসবাগে। তারপর ভোর ৫টায় হোনিংসবাগ ছেড়ে আবার ধরবে রোভানিয়েমির রাস্তা। হোনিংসবাগে হোটেল নেই? হোনিংসবাগে রাতটুকু থাকার একটা ব্যবস্থা হয় না?

আরও তথ্য খুঁজতে খুঁজতে জানা গেল বিদেশের পর্যটকরা চার্টার্ড প্লেনে সোজা এসে নামেন হোনিংসবাগে, হ্যামারফেস্টের কিছুটা উত্তরে। সেখান থেকে ট্যুরিস্ট কোচে নর্থ কেপ। মধ্যরাতের সূর্যদর্শন সেরে নেমে আসেন হোনিংসবাগে। ওসলো, বারগেন ইত্যাদি কয়েকটি জায়গায় বিমান বদলেও হোনিংসবাগ পর্যন্ত আসেন অনেকে।

আমরা যাব বাসে, আমাদের রাতের ব্যবস্থা কী হবে? ওই বাসই নর্থ কেপ থেকে রওনা হবে রাত ১টায়। ৩৫ কিলোমিটার নেমে এসে বাসটা বাকি রাতটুকু কাটাবে হোনিংসবাগে। তারপর ভোর ৫টায় হোনিংসবাগ ছেড়ে আবার ধরবে রোভানিয়েমির রাস্তা।

হোনিংসবাগে হোটেল নেই? হোনিংসবাগে রাতটুকু থাকার একটা ব্যবস্থা হয় না? নেটে খুঁজতে খুঁজতে ছোট একটা হোটেল পাওয়া গেল। মাটকা ভেক্কার মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হেড ফোন চড়িয়ে কম্পিউটার-ফোনে আমাদের জন্য ঘর বুক করে দিলেন। তবে যেদিন নর্থ কেপ পৌঁছব সে রাতের জন্য নয়, সেদিন কোনও ঘর খালি নেই। পরদিনও হল না, অতএব তার পরদিন।

এ তো দেখছি ঘরে যাইতে কাল মোর হৈল অফুরান!

ঘর ঠিক হলে তবে তো পথের ব্যবস্থা। বাসের বুকিং। ঘরের তারিখের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাত্রার তারিখ ও পথে বিরতির মেয়াদ ঠিক হল। সেইমতো রোভানিয়েমি থেকে ইনারি। ইনারি থেকে লাকসেলভ, লাকসেলভ থেকে নর্থ কেপ। নর্থ কেপে সূর্যদর্শন ও রৌদ্রোজ্জ্বল সুমেরুর আকাশ ও সমুদ্রের চিত্রগ্রহণ সেরে হোনিংসবাগে ফেরা।

বাসের সিট বুক করতে হবে এই যাত্রাপঞ্জি মতো। এতদূর এগিয়ে জানা গেল বাসে আগাম সিট বুক করা যায় না। বাসে উঠে ড্রাইভারকে পয়সা দিয়ে টিকিট নিতে হয়।

বেশ, তাহলে আমাদের যাত্রাসূচি জানিয়ে একটা ই-মেল করে দিলেই তো হয় বাস কোম্পানিকে যে— ওই ওই জায়গা থেকে ওই ওই তারিখে আমরা নিশ্চয়ই বাসে উঠব। বুকিং না নিক, শুধু আমাদের পথিমধ্যে যাত্রাবিরতি ও পুনর্যাত্রার তারিখগুলো জানিয়ে রাখতে তো দোষ নেই!

ফিনিশ ভাষায় লেখা সেই ই-মেলের একটা কপি আমি চেয়ে নিয়েছিলাম।

রোভানিয়েমিতে বাসের ড্রাইভারকে সেটা দেখিয়ে কবে, কোথায় আমাদের নামাতে হবে, কবে, কোথা থেকে আবার আমরা বাসে উঠব, ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম। বার্তার বাঁদিকে যাত্রার তারিখ ও ডানদিকে ভাড়ার অঙ্ক রোমান হরফে লেখা, ফলে আমারও বুঝতে অসুবিধে হল না।

সকলের কাছে এসে ভাড়া নিয়ে টিকিট দিচ্ছে, আমাদের পেরিয়ে চলে গেল, ফিরলও

লেক ইনারি

> **এখানেই ফিনল্যান্ডের আদিবাসী সামি উপজাতির মানুষের সঙ্গে দেখা হল। হোটেলের খাতায় নাম-ধাম লিখতে লিখতেই চোখে পড়ল, জিনসপ্রধান যুগেও তাদের চিরাচরিত পোশাক পরা একদল সামি যুবক উচ্চকণ্ঠে ভদকা সেবন করছে। আদ্যিকাল থেকে ল্যাপল্যান্ড কিন্তু বল্গা হরিণ আর এই হরিণ-পালক সামি উপজাতির মানুষদেরই ছিল।**

আমাদের সিট পার হয়ে, কিন্তু কই, আমাদের দুজনের টিকিটের ভাড়া তো নিল না! সোজা গিয়ে ড্রাইভারের আসনে বসে বাস ছাড়বার উপক্রম করছে।

আমি-ই উঠে গিয়ে ভাড়ার টাকা বাড়িয়ে দিলাম, সে শুধু 'নো' 'নো' করে। ভাড়া নেবার পক্ষে সবরকম যুক্তি-তক্কো হার মেনে গেল। আমার সহযাত্রিণীর উদ্যোগও বৃথা গেল, কিছুতেই তাকে টিকিটের দাম নিতে রাজি করা গেল না।

রোভানিয়েমিতে সকলের সঙ্গে আমাদের বাক্সও বাসের পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সারাদিন বাসযাত্রার পর লেক ইনারিতে নেমে বাক্স বের করে নিজেই বয়ে নিয়ে বাসস্টপ থেকে দশ-পনেরো পা দূরে আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল। পরশু আবার এই সময় এখান থেকে আমাদের তুলে নেবে। যাব লাকসেলভ। ইনারি থেকে দুশো কিলোমিটারের মতো।

ইনারিতে ইনারি হ্রদের তীরে ছোট্ট হোটেল— নামও ইনারি হোটেল।

এখানেই ফিনল্যান্ডের আদিবাসী সামি উপজাতির মানুষের সঙ্গে দেখা হল। হোটেলের খাতায় নাম-ধাম লিখতে লিখতেই চোখে পড়ল, জিনসপ্রধান যুগেও তাদের চিরাচরিত পোশাক পরা একদল সামি যুবক উচ্চকণ্ঠে ভদকা সেবন করছে। আদ্যিকাল থেকে ল্যাপল্যান্ড কিন্তু বল্গা হরিণ আর এই হরিণ-পালক সামি উপজাতির মানুষদেরই ছিল। সামিদের জীবন-জীবিকা, ঘরদরজা, রীতিনীতি সবই তাদের নিজস্ব। এখনও ল্যাপল্যান্ডের কোথাও কোথাও রয়েছে, সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। সাবেকি পোশাক পরা বেশ কয়েকজন সামি যুবক-যুবতীকে ইনারির রাস্তায় ঘাটে দোকানে বাজারে রেস্তোরাঁয় বারে দেখেছি।

সামিদের হস্তশিল্প নিয়ে ল্যাপল্যান্ডে অনেকেই এখন আগ্রহী হয়েছেন। এর রক্ষণাবেক্ষণ, গবেষণা ও প্রচারেও নেমে পড়েছেন কেউ কেউ। এঁদের মধ্যে শিক্ষিত আধুনিক সামি যেমন আছেন, তেমনই এই উপজাতির অন্তর্ভুক্ত নন এমনও আছেন অনেকে। সামিদের আদি ও আসল জীবিকা রেইনডিয়ার লালনপালনের ব্যাপারেও এখন সরকারি উদ্যোগ ও সহযোগিতা দেখা যাচ্ছে বলে শুনলাম।

তাই বলে উন্মুক্ত প্রান্তরে, সবুজ পাহাড়ে পালে পালে বল্গা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে দেখতে পাব না? রাস্তার এপারে আমাদের হোটেল, ওপারে কাছাকাছি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছোট ছোট কয়েকটা দোকান। সবই সামি উপজাতির সাবেকি হস্তশিল্পের।

বল্গা হরিণ দেখতে হলে সামিদের গ্রামেই যেতে হয়। হস্তশিল্পের একটা দোকানে ঢুকে মালকিন মহিলাকে মনের ইচ্ছাটা বুঝিয়ে বলতেই তিনি মহা উৎসাহে জানালেন যে তিনি নিজের বাড়িতেই বল্গা হরিণের লালনপালন করেন। কাল সকালে যদি আসি পালে পালে বল্গা হরিণ দেখা কোনও ব্যাপারই নয়।

কাল ইনারি ছেড়ে আরও একটু উত্তরে লাকসেলভ যেতে হবে শুনে মহিলা বললেন, 'দাঁড়ান, এখনই আমার স্বামী তাঁর গাড়ি নিয়ে চলে আসবেন, তাঁর গাড়িতে আমরা এখনই যেতে পারি।'

মহিলার সুদর্শন স্বামী এলেন বটে, কিন্তু তাঁর পক্ষে এখনই বাড়ি ফেরা সম্ভব নয়।

মহিলা তাতেও দমলেন না। তক্ষুণি কাকে ফোন করে ফিনিশ ভাষায় কী বললেন জানি না, ফোন নামিয়ে রেখে যা বললেন তার অর্থ, তাঁর এক বন্ধু বল্গা হরিণ আর হরিণ-পালক সামিদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। সেই মহিলা এখনই আমাদের নিয়ে যেতে গাড়ি নিয়ে এসে পড়লেন বলে। তবে গাড়ির তো একটা খরচ আছে। সে-বাবদ সামান্য তিরিশ ইউরো আমাদের দিতে হবে। সেটা কি খুব বেশি?

সন্ধের মুখে কে না কে এরকম হুট করে বল্গা হরিণ দেখাতে কোথায় না কোথায় নিয়ে যেতে আসছে, মন বলল, যাওয়া উচিত নয়।

বললাম, 'কালই এখান থেকে চলে যাব। এখন আর যাওয়া ঠিক হবে না।'

মহিলা তক্ষুণি একটা কাগজে বন্ধুর ফোন নম্বর লিখে দিয়ে বললেন, 'এটা রাখুন, আজ রাতে বা কাল সকালেও যদি যাবার কথা ভাবেন, একটা ফোন করে দেবেন, তক্ষুণি গাড়ি নিয়ে আপনাদের হোটেলে চলে আসবে।'

সন্ধেবেলা আমাদের ছোট্ট হোটেলের ছোট্ট ডাইনিং হল কাম রেস্তোরাঁয় একজনের বেকড স্যামন দুভাগ করে দুজনের রাতের আহার সারতে বসেছি, দেখলাম দুটো টেবিল বাদে সামিদের হস্তশিল্পের দোকানের সেই মহিলা ও তাঁর স্বামী স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে বিয়ার সহযোগে আড্ডা দিচ্ছেন বা আলোচনা করছেন— হয়তো সামি উপজাতি বা তাদের

বল্গা হরিণের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

যাই হোক, ইনারিতে এসেও ল্যাপল্যান্ডের বল্গা হরিণ আমার স্বপ্নেই রয়ে গেল।

পরদিন ঠিক পাঁচটা পাঁচে সেই বাস কোম্পানির বাসই এল, কিন্তু সেই ড্রাইভার আসেনি। আজকের চালক শ্মশ্রুগুম্ফময় বড়সড় চেহারার সাহেব। ভাড়া নিতেও দ্বিধা করলেন না। আমি রোভানিয়েমি থেকে নর্থ কেপ ও সেখান থেকে হোনিংসবাগ ফিরে আসার পুরো ভাড়া দিতে গেলাম।

ড্রাইভার কিংকর্তব্যবিমূঢ় গলায় বললেন, 'আপনারা আসলে যেতে চান কোথায়?'

'নর্থ কেপ, হোনিংসবাগ হয়ে হ্যামারফেস্ট।'

'এবাস সেখানে যাবে না। হ্যামারফেস্ট এপথেই পড়ে না।'

শেষপর্যন্ত তিনি ইনারি থেকে নর্থ কেপ পর্যন্ত ভাড়া হিসেব করে নিয়ে সেইমতো প্রিন্ট আউট দিলেন। লাকসেলভ থেকে নর্থ কেপ পর্যন্ত এই টিকিটেই যাওয়া যাবে তাও লিখে দিলেন। নর্থ কেপ যেতে পথে তিনটে টানেল পড়বে, সাগরপিঠের চেয়েও নীচ দিয়ে চলে গেছে সেই সুড়ঙ্গ, তার একটা সাত কিলোমিটার দীর্ঘ, সেই তিন সুড়ঙ্গ পারানির কড়িও এই ভাড়ার মধ্যে ধরা আছে।

আগে তো নর্থ কেপে পৌঁছই, তারপর হ্যামারফেস্টে যাবার রাস্তার খোঁজ করব।

বাস বেশ জোরে চলছে। দুজনে রাস্তার দুদিকে চোখ রেখেছি। যদি কোথাও বল্গা হরিণ চরতে দেখা যায়। ল্যাপল্যান্ডের নিসর্গ দেখে চোখ ভরে গেছে, কিন্তু এই অপরূপ নিসর্গের সন্তান সেইসব বল্গা হরিণের দল কোথায় গেল? ফিনিশ ল্যাপল্যান্ডে দেখা পেলাম না, এবার ফিনল্যান্ডের সীমান্ত পেরিয়ে চলেছি নরওয়েতে।

নরওয়ের লাকসেলভে রাস্তার ধারেই ছোট্ট হোটেল। রাস্তার ওপারে অদূরে পাহাড়ের কোলে-বুকে মেঘ গা হাত পা এলিয়ে দিয়েছে।

ঘর বুক করার সময়ই বলা ছিল দোতলা বা তিনতলায় ঘর হলে যদি লিফট না থাকে তাহলে বাক্স বইতে একটু সাহায্য করতে হবে। মস্কো সম্মেলনের কাগজপত্রে আমার বাক্স ওজনে ভালোই বেড়েছে। তার ওপর সহযাত্রিণীও পৃথিবীর সর্বোত্তর শহরের ঠান্ডার মোকাবিলা করতে তাঁর বাক্সের ওপর বিশেষ দয়া দেখাননি।

বাস থেকে হোটেলের সামনেই নামিয়েছে। হোটেলের দিকে দু পা এগিয়েছি কি এগোইনি এক নরওয়েইজীয় যুবক এসে দুহাতে আমাদের বিশাল বাক্স তুলে নিয়ে হোটেলে ঢুকে গেল। এই দুটো বাক্স ও আমাদের ক্যামেরা ইত্যাদিতে ভারি আরও দুটো হাতবাক্স নিয়ে ভদ্রলোক একটা লিফটে উঠতে উঠতে বললেন, 'এই লিফট গুড ফর দ্য গুডস ওনলি। আপনারা চড়লে শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছবেন বলা অসম্ভব।' বলে আমাদের সিঁড়ি দেখিয়ে দিলেন।

> আমি রোভানিয়েমি থেকে নর্থ কেপ ও সেখান থেকে হোনিংসবাগ ফিরে আসার পুরো ভাড়া দিতে গেলাম। ড্রাইভার কিংকর্তব্যবিমূঢ় গলায় বললেন, 'আপনারা আসলে যেতে চান কোথায়?' 'নর্থ কেপ, হোনিংসবাগ হয়ে হ্যামারফেস্ট।' 'এবাস সেখানে যাবে না। হ্যামারফেস্ট এপথেই পড়ে না।'

রাতে ডিনারে কী পাওয়া যায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে জানলাম আমাদের সেই মালবাহক আসলে এই হোটেলের কুক।

একজনের জন্য মুরগির একটা পদ, আরেকজনের এক প্লেট সালাদ। নৈশাহার সেরে জনহীন রাস্তায় এক চক্কর ঘুরে এসে আমি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মানচিত্রে মন দিলাম।

পরদিন লাকসেলভ ছেড়ে যাব, দুপুরে খাদ্যতালিকায় মনোমতো ব্যঞ্জনের অসাক্ষাতে কী খাওয়া যায় মনস্থির করতে পারছি না। মালকিন বা ম্যানেজার বা পরিচারিকা যথাসাধ্য আমাদের খাদ্যরুচি বোঝবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় গতকালের মালবাহক-কাম-রন্ধনশিল্পী এসে বললেন, 'কাল তোমাদের খেতে কষ্ট হয়েছে। আজ তোমাদের জন্য আমি পাঁচরকম ব্যঞ্জন রেঁধে আনছি। ভাজা, সেদ্ধ, ঝোল, তাজা সালাদ— সব একটু একটু। দ্যাখো তো ভালো লাগে কিনা।'

'কত দাম পড়বে?'

'মাথাপিছু দেড়শো ক্রোনার দিও।'

'দাম একটু বেশি হয়ে গেল।'

'দুজনের দুশো দিও।'

খেয়ে মন ভরে গেল। বেগুনি, পেঁয়াজি, মুণ্ডহীন হেরিং মাছভাজা, গ্রিল্ড স্যামন (স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সব দেশেই বলে স্যালমন), সালাদ, একটু ভাত, একটু মুরগি, একটু বোধহয় ডালও ছিল।

বাস আসবার পাঁচ মিনিট আগে আমাদের বাক্সপ্যাঁটরা দোতলা থেকে নামিয়ে হোটেলের সামনেই বাসস্টপে রেখে দিয়ে বললেন, 'আমি কাজ ফেলে এসেছি। এদিকে আমার নজর থাকবে, বাস আসামাত্রই চলে আসব। নর্থ কেপ থেকে ফেরার ব্যাপারে ড্রাইভারকে বুঝিয়ে দেব।'

আজ আবার সেই কিশোর ড্রাইভার। ওকে দেখে ভারি আনন্দ হল। ও-ও খুব খুশি। আজ বয়েস জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। ওর নাকি ২৪ চলছে। আমরা ভেবেছিলাম সতেরো-আঠেরো! বাস থেকে বাইরের ছবি তুলব বলে ওর পাশের সিটে এসে বসেছি।

একসময় আমাকে বিশ্রীরকম চমকে দিয়ে ছেলেটি বলে উঠল, 'লুক লুক, রেইনডিয়ার!'

বাস এত জোরে ছুটছে যে বিপজ্জনকভাবে উঠে দাঁড়িয়েও বহুদূরে বনের ধারে ছাগলছানা বা খরগোশের মতো একপাল চতুষ্পদ ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না।

পথের দুধারের দৃশ্য দ্রুত বদলে গেল। একটু পরেই রাস্তার যা রূপ হল তা ভাষায় লেখার চেষ্টা বৃথা। একধারে পাহাড়, আরেক ধারে সমুদ্র। সমুদ্র কখনও খাঁড়ি, কখনও অসীম। ভিডিও ক্যামেরায় সেই অপার্থিব আর্কিপেলাগোর নির্নিমেষ ছবি তুলছি। সূর্য যখন সরাসরি ক্যামেরার লেন্সে এসে পড়ে বা সামনের কাচে আগুন ধরিয়ে দেয় তখন আমার চোখ আর ক্যামেরার লেন্স দুটোই বন্ধ। জেগে থাকে শুধু অন্তর।

সৌন্দর্যের এ কী রূপ! সুন্দর যেন এখানে পরীর দলের মতো আকাশ থেকে নেমে আপনমনে খেলা করছে।

এরকম বেশ কয়েকঘণ্টা চলার পর কুয়াশায় চরাচর লুপ্ত হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই এরকম হয়। কখনও ক্ষণিক, কখনও অনেকক্ষণ।

সেই লুপ্ত চরাচরে ড্রাইভার স্টিয়ারিং ছেড়ে ডানার মতো দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে তার অল্প ইংরিজিতে বারবার বলতে থাকে— 'হোয়্যার ইজ রোড? হোয়্যার উই গো? হোয়্যার উই গো?'

এরই মধ্যে আকাশ রাঙিয়ে চিরপরিচিত রামধনু উঠতে দেখে খেয়াল হল চারপাশের এই অপরূপ সৌন্দর্য স্বর্গের মতো অলৌকিক নয়, এ তো মর্ত্যেরই এক বাস্তবতা!

যখনই দুষ্পার কুয়াশায় সব ঢাকা পড়ে যায়, যাত্রীরা স্তব্ধ, তখন শুধু আমাদের সারথির সকৌতুক গলা শোনা যায়— 'হোয়্যার উই গো?'

সত্যি, পথই যদি অদৃশ্য, তাহলে কোথায় চলেছি আমরা?

কুয়াশা খানিকটা ফিকে হতে দেখা যায় ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী পথ চলে গিয়েছে দূরে।

নর্থ কেপ

কখনও পাহাড়ের কোল ঘেঁসে, কখনও পাহাড়ের সুড়ঙ্গ ধরে। এভাবেই হোনিংসবাগ পার হয়ে এগিয়ে চললাম নর্থ কেপের দিকে।

কখনও রাস্তার এপাশে, কখনও ওপাশে, কখনও বা দুপাশেই, যেন স্বপ্নের জগৎ। সত্যিই যেন একইসঙ্গে স্বপ্ন আর জাগরণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। ধ্বংস-হত্যা হিংসা-ঘৃণাময় পৃথিবী যেন অন্য সে গ্রহে ফেলে এসেছি। যেন আগের জন্মের ঘটনা।

টোল ট্যাক্স জমা দিয়ে এবার পথের শেষটুকু। রাত ঠিক সাড়ে দশটায় পৌঁছে গেলাম ৭১ ডিগ্রি ১০ মিনিট ২১ সেকেন্ড উত্তরে, সুমেরু মহাসমুদ্রের কূলে নর্থ কেপে। মহাসমুদ্র থেকে হাজার ফুট খাড়া উঠে এসেছে। এই ঊষরভূমি প্রথম জরিপ করেছিলেন ইতালির ফ্রান্সেসকো নেগ্রি। নর্থ কেপে তিনিই প্রথম পর্যটক। এসেছিলেন ১৬৬৪ সালে।

বিরাট একটা পাহাড়ের মাথা কেটে সমতল করে দিলে যেমন দেখায় জায়গাটা দেখাচ্ছে অনেকটা সেইরকম একটা চত্বরের মতো। মনে হয় যেন ভূমণ্ডলের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছি। তা তো হবার নয়। তবু মনে হয় যেন মর্ত্যে দাঁড়িয়েই মহাকাশের স্পর্শ পাচ্ছি। কোথায় পড়ে আছে আমাদের নীচের অন্ধকার পৃথিবী!

মনুষ্যবসতির বাইরে এরকম একটা পোড়ো পাহাড়ি জমির গুরুত্ব যে কতটা, নানা দেশের পর্যটকদের ভিড় দেখেই তা মালুম হয়। এরই মধ্যে মা ও শিশুর ভাস্কর্য, নানা দেশের শিশুদের তৈরি দেশ-দেশান্তরের সীমান্ত ছাপানো সুখ-শান্তি-সহযোগিতাকামী স্তম্ভ, এসবও রয়েছে।

রাত ১২টায় এই ঊষরভূমির চারপাশের আকাশ আর মহাসমুদ্র জ্বালিয়ে সূর্য ঝলমল করছে!

দেখছি আর ছবি তুলছি, সহযাত্রিণীর ভয়, বাস ছেড়ে দেবে না তো? চাঁদের পিঠের মতো ন্যাড়া চত্বরে এখানে-ওখানে কয়েকটি স্তম্ভ ও দেওয়াল, তাতে কিছু চিত্র ও ভাস্কর্য। এছাড়া ওই পাথুরে চত্বরে চোখে পড়বে ৫ হাজার বর্গফুট 'নর্থ কেপ হল'। খাবার, পানীয় ও স্যুভেনিরের দোকান ওই হলের মধ্যে। ওর ভেতর দিয়েই যাতায়াতের পথ। প্রায় দৌড়ে সে পথ পেরিয়ে আরও দ্রুত পা চালিয়ে অন্যান্য বাসের মধ্যে আমাদের বাস খুঁজে পেলাম একেবারে শেষ মুহূর্তে। ড্রাইভারের দুহাতে দুটি প্লাস্টিক ব্যাগ। মুখ হাসিতে, মন খুশিতে ভরা। ছেলে বা মেয়ের জন্য একটা পুতুল কিনেছে। কিছু খাবারদাবারও দেখা যাচ্ছে। আমার প্রতি তার বিশেষ সন্তোষের ভাব। নর্থ কেপে নামবার সময় আমি জোর করে তার হাতে ৫০ নরওয়েইজিয়ান ক্রোনার গুঁজে দিয়েছিলাম। রোভানিয়েমি থেকে ভাড়া তো কাউকেই গছাতে পারিনি, তাই এই ঋণমুক্তি।

রাত দুটোয় পৌঁছলাম হোনিংসবাগ। নর্থ কেপ থেকে ৩৫ কিলোমিটার পিছিয়ে। হোনিংসবাগ প্রায় ৭১ ডিগ্রি উত্তরে। হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে দুই বালিকা শুধু আমাদের জন্যই জেগে আছে।

নর্থ কেপ হল

ঘরের চাবি নিয়ে সসঙ্কোচে রাতে খাবারের কথা জিজ্ঞেস করে এক প্যাকেট পোট্যাটো চিপস ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না।

সমুদ্রের খাঁড়ির ধারে ছোট্ট হোটেল। ছোট্ট ঘর। তার মধ্যেই বাথরুমের লাগোয়া সাবেক ফিনিশ রীতির কাঠের আলাদা সাওনা ঘর। শুধু এই ঘরের অতিথির সাওনা স্নানের জন্য।

ভারতীয় মতে পরদিন, সাহেবি মতে সেদিনই, সকালে হোনিংসবাগ পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখে ভারি ভালো লাগল। ছোট্ট জায়গা, অল্প ঘরবাড়ি, সবই কাঠের, সব কটিই রঙিন। কোনওটি লাল, কোনওটি সবুজ, কোনওটি নীল, কোনওটি বেগুনি। কালো রঙের বাড়িও দেখলাম। সাদা রংও দেখেছি। অসংখ্য সি-গাল। মানুষের সংখ্যা সে-তুলনায় সামান্য। ভুল করে মনে হতে পারে এ জনপদ বুঝি আসলে সি-গালদেরই দেশ। জলের ধারে, জলে ঘেরা এ বুঝি কোনও জনপদও নয়, এ যেন এক জলপদ। যদি শহর হত, বলা যেত জলসই শহর। এখানকার প্রাচীন বাসিন্দারা একে শহর ভাবতেই ভালোবাসেন, এদের দাবি পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের শহর হ্যামারফেস্ট কেন হতে যাবে, তাদের হোনিংসবাগ নয় কেন? সমুদ্রের ধারে একঝাঁক সি-গালের ছবি তোলার ফাঁকে হোনিংসবাগ-হ্যামারফেস্টের এই দ্বন্দ্বমধুর সম্পর্ক নিয়ে এক বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলে যে যুক্তিজাল জানা গেল তা এই— হোনিংসবাগ ৭০°৫৮'৬০" উত্তরে, হ্যামারফেস্ট ৭০°৩৯'৪৮" উত্তরে। অতএব অধিক উত্তরে হওয়া সত্ত্বেও হোনিংসবাগ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের শহর নয় কেন? হ্যামারফেস্টের লোকেদের নাকি বক্তব্য— হোনিংসবাগ তো শহরই নয়। মানুষের ঘরবাড়ি আছে, সুপার মার্কেট আছে, দ্বিস্তর রাস্তা আছে, তবু এটা শহর হবে না কেন? তবে দেখে ভালো লাগল, এই তর্কে কারও মনে কোনও তিক্ততা নেই।

হ্যামারফেস্ট যাবার রাস্তার খোঁজ নিয়ে জানলাম, হোনিংসবাগ থেকে সারাদিনে বেশ কয়েকটা বাস যায় হ্যামারফেস্ট। বেলা তিনটেয় একটা বাস আছে। আমাদের হোটেল খাঁড়ির পাড়ে, অতএব একতলার রাস্তায়। বাস চলে ওপরের রাস্তায়। বাসস্টেশন হোটেল থেকে খুব একটা দূরে না হলেও, হোটেলের মেয়েটি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিল।

এই অঞ্চলের বাসের সময়সূচির একটা পুস্তিকায় আমি হ্যামারফেস্টের বাস ছাড়ার যে জায়গাটা দেখেছিলাম, সেটা আমাদের হোটেল থেকে ওপরের রাস্তায় উঠে বাঁদিকে কিছুটা এগিয়ে বন্দর এলাকায়। ট্যাক্সি ড্রাইভার সেকথা শুনে বললেন, 'না, না, আপনাদের যেতে হবে বাস টার্মিনাসে। সব বাস সেখান থেকেই ছাড়ে।'

যথারীতি টার্মিনাসে পৌঁছে দেখা গেল

কোথাও কোনও বাস নেই। ড্রাইভারের সোৎসাহ প্রস্তাব, 'বাস এলে আমি উঠিয়ে দেব, ততক্ষণ এই ট্যাক্সিতেই আপনারা শহরটা ঘুরে দেখুন। এই আমি মিটার বন্ধ করে রাখলাম।'

শেষপর্যন্ত তিনি আমার সেই চেনা বন্দর এলাকায় আমাদের পৌঁছে দিলেন। সেখানে ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন অফিসে আমাদের বাক্স রাখার ব্যবস্থাও দেখিয়ে দিলেন। ভাড়া নিলেন সেই মিটার বন্ধ করার আগে যা উঠেছিল সেইটুকু।

ডাঙায় বাস দাঁড়িয়ে আছে। জলে বিরাট জাহাজ। বাস আসছে, ছেড়ে যাচ্ছে। এখানেই ট্যুরিস্ট ইনফোর পাশেই স্যুভেনির শপ। স্ক্যান্ডিনেভীয় উপকথার সহাস্য ডাইনি বুড়ি সব দোকানে থাকবেই। নরওয়ে, ফিনল্যান্ড— সব জায়গাতেই এই ডাইনি বুড়ির নানান মূর্তি। দেখে ভয় লাগে না, মজা লাগে।

হোনিংসবাগ থেকে হ্যামারফেস্ট যেতে মাঝে এক জায়গায় বাস বদলাতে হল। হ্যামারফেস্ট পৌঁছলাম সন্ধের মুখে। জলস্থল সূর্যের আলোয় একেবারে হোলি খেলছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের শহর ও গুরুত্বপূর্ণ উপকূলশহর হিসেবে হ্যামারফেস্টের খ্যাতি হলেও এর আয়তন কিন্তু মাত্রই ৮৪৪ বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা দশ হাজারেরও কম। তবে পর্যটকদের বেশ ভিড়, বছরে প্রায় আড়াই লাখ মানুষ আসেন হ্যামারফেস্ট দর্শনে।

সেই হ্যামারফেস্ট। ম্যাপে জায়গাটা দেখলে বুক হিম হয়ে আসে। সুমেরু মহাসাগরে ছোট্ট একটা শোলার টুকরোর মতো ভেসে আছে। এখানে যাব বলেই এবার বেরিয়েছি। নিজের চোখে দেখব আর সুমেরুবৃত্ত ভ্রমণের একটা ভিডিও চিত্র তৈরি করব— এই বাসনা।

অসীম সমুদ্রের তীরে মাঝারিমানের বড় হোটেল। সামনেই নীরব, নির্জন পুলিশ ফাঁড়ি, অল্প এগিয়ে বন্দর। পুরো ডানদিক জুড়ে সুদীর্ঘ সবুজ পাহাড়, হ্যামারফেস্টের প্রাকৃতিক প্রাচীর।

ভারি সুন্দর, ঘরোয়া শহর দেখেই সারাদিন কেটে গেল। রাত বলে কিছু নেই, সারারাতই আকাশে দিনের আলো। শুধু দুঃখ, একটাও তারা নেই। অন্ধকার না থাকলে তারা থাকে কী করে! সামনেই পূর্ণিমা, তবু চাঁদ নেই।

পরদিন ফিরে যাব। যেতে হবে ওসলো, সেখান থেকে ভিয়েনা। ভিয়েনা থেকে আমাদের দেশে ফেরার বিমান। দুজন যাব দুই বিমানে।

আসবার যে রাস্তা জেনেছি, সে পথে গেলে তো আবার সেই রোভানিয়েমি হয়ে হেলসিংকি। তাহলে নরওয়ের আর কোথাও যাওয়া হয় না। বিশেষ করে নরওয়ের বিখ্যাত সেই দীর্ঘ পাহাড়ঘেরা সমুদ্রোপকূল-সংলগ্ন সব শহর বা ত্রয়োদশ শতকের রাজধানী বারগেন না দেখেই

> হোনিংসবাগ পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখে ভারি ভালো লাগল। ছোট্ট জায়গা, অল্প ঘরবাড়ি, সবই কাঠের, সব কটিই রঙিন। কোনওটি লাল, কোনওটি সবুজ, কোনওটি নীল, কোনওটি বেগুনি। কালো রঙের বাড়িও দেখলাম। সাদা রংও দেখেছি। অসংখ্য সি-গাল। মানুষের সংখ্যা সে-তুলনায় সামান্য। ভুল করে মনে হতে পারে এ জনপদ বুঝি আসলে সি-গালদেরই দেশ।

ফিরে যাব?

বল্গা হরিণও দেখা হল না।

যাকেই বলি, নিস্পৃহ উত্তর, ওই পাহাড়ে তারা চরতে আসে।

তবু ফিরতে হবে। লক্ষ্য এখন একটাই। ফেরার পথে যাতে বেশি বেশি শহর বন্দর জনপদ দেখতে দেখতে যাওয়া হয়।

যেপথেরই হদিশ পাই, সেপথেই বহুবার বাস বদল অথবা কোস্টাল স্টিমার।

কোস্টাল স্টিমার? রাশিয়া-নরওয়ের সীমান্তশহর কির্কিনেস থেকে রওনা হয়ে হ্যামারফেস্ট হয়ে বারগেন যায় এরকম কোস্টাল স্টিমারের খোঁজ পাওয়া গেল। আরও আনন্দের কথা, আজই বেলা বারোটায় একটা স্টিমার হ্যামারফেস্টে আসবে, ১২টা ২০ মিনিটে ছেড়ে যাবে বারগেনের পথে।

ট্যুরিস্ট ইনফোতে গিয়ে খোঁজ করি, টিকিট কোথায় পাওয়া যায়? সহজ উত্তর— 'স্টিমারে উঠে টিকিট কাটতে হয়।'

'যদি সিট না থাকে?'

ট্যুরিস্ট ইনফো, মানে ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশনের ছেলেটি কম্পিউটার খটখটিয়ে বলল, 'দাঁড়ান, এদের অফিসে ফোন করে আপনাকে জানাচ্ছি।'

ফোনে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে ছেলেটি বলল, 'ওই তো জাহাজ ঢুকছে। এখনই নোঙর করবে। আপনি ভেতরে গিয়ে খোঁজ করলে ঠিক তথ্য জানতে পারবেন।'

ইনফো অফিসের ঠিক বাইরেই স্টিমারঘাটা। কোথায় স্টিমার! এ তো ছ-সাততলা বিরাট জাহাজ। ছেলেটিই পৌঁছে দিয়ে গেল।

জাহাজে ঢুকে শুনি আমরা ট্রমসো পর্যন্ত যেতে পারি। ট্রমসো থেকে অন্য দুজন যাত্রীর বুকিং আছে। তবে ট্রমসো থেকে পরদিন একই সময় অন্য জাহাজে বারগেন যেতে পারব।

ট্রমসো এখান থেকে একটা স্টপ। ট্রমসো পৌঁছবে রাত ১টা ৫-এ। বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে ট্রমসোয় সারারাত সারাদিন অপেক্ষা করে পরদিন আবার রাত ১টা ৫-এ জাহাজ ধরা খুব সহজ হবে না।

তবু এছাড়া আর উপায়ই বা কী। হোটেলে ফিরেই পরিকল্পনাটা বিশদ করার সময় দেখা গেল জাহাজ ছাড়ার আর মাত্র ১০ মিনিট বাকি। হোটেল থেকে জাহাজঘাটা বা স্টিমারঘাটা যাই হোক, পাঁচ মিনিটের পথ। আর পাঁচ মিনিটে কোনওক্রমে গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া কি একেবারেই অসম্ভব?

ঘরে এবিষয়ে প্রবল দ্বিমত।

এইসব কথার মধ্যেই মেয়েলি গলায় 'হাউস কিপিং' শুনে দরজা খুলে দেখি কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের একটা মেয়ে রুম মেক-আপ করতে এসেছে। যদি অনুমতি দিই তাহলে বাথরুম ধুয়ে-মুছে, তোয়ালে, বিছানার চাদর বদলে সে এখনই ঘরটাকে গুছিয়ে দিতে পারে।

একেও একবার বল্গা হরিণের কথা জিজ্ঞেস করে দেখা যায় না?

মেয়েটি হাতে গ্লাভস পরে বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছিল, আমার প্রশ্ন শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, বাড়ি থেকে কাজে আসবার পথে আজ সকালেই সে পাহাড়ের মাথায় একদল রেইনডিয়ার চরতে দেখেছে।

'আমাদের দেখাতে পারো?'

'আশা করি, পারব।'

'কখন?'

'বিকেল পাঁচটায় আমার কাজ শেষ হবে। আমি এসে আপনাদের নিয়ে যাব। ঠিক পাঁচটা দশে আপনাদের দরজায় নক করব।'

মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে জানলাম, বাড়ি সুইজারল্যান্ডে। প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কোর্স শেষ করেই এখানে এসে হোটেলের ঘর বাথরুম ধোয়া-মোছা, সাজানো-গোছানোর কাজ নিয়েছে। স্কুলে বাচ্চাদের পড়ানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে হোটেলের বাথরুম পরিষ্কার করার কাজে কেন? না, পৃথিবীটা দেখে বেড়াতে চায়। এখানে আসবার পথে রাশিয়া খুব ভালো করে বেড়িয়ে এসেছে। গ্রীষ্মকালটা হোটেলের কাজ করে প্রথমেই যাবে কাজাখস্তানে। তারপর নেপালে। তারপর...

এলি, যে হরিণ দেখাতে নিয়ে গেল

হ্যামারফেস্ট পাহাড়ের মাথায় বল্গা হরিণ

হ্যামারফেস্টে পাহাড়ের মাথায় সুমেরুবৃত্তের প্রচণ্ড রোদ্দুরে রাত দশটার পরেও আমরা একপাল বল্গা হরিণের বিচরণ দেখতে থাকি। পরদিন কোস্টাল স্টিমার-লাইনের অন্য একটি স্টিমারে, অর্থাৎ সাততলা জাহাজে, জায়গা পেয়ে গেলাম। এবার বারগেন পর্যন্তই যাওয়া যাবে। হ্যামারফেস্ট থেকে পাঁচদিনের পথ।

মস্কো, সেন্ট পিটার্সবুর্গের খুঁটিনাটি বর্ণনায় তার উচ্ছ্বাস থেকেই তার দেখার চোখ আর দেশ-ভ্রমণের খিদে টের পাওয়া যায়। রাশিয়া থেকে নরওয়ে এসেছে দু-দেশের সীমান্তশহর কির্কিনেস হয়ে। কির্কিনেস নাকি এক আশ্চর্য সুন্দর জায়গা।

ঠিক পাঁচটা দশে দরজায় টোকা। আমরাও তৈরি হয়েই ছিলাম। কিন্তু মনে মনে একেবারেই প্রস্তুত নই। ওই উঁচু পাহাড়ে চড়া কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?

আধঘণ্টা ওপরে ওঠার পর নীচে সমুদ্র ও সমুদ্রতীরবর্তী সরু রাস্তায় ছুটন্ত গাড়ির সারি দেখার পর আমার সহযাত্রিণী একতরফা সিদ্ধান্ত নিলেন যে আর ওঠা উচিত নয়। এখান থেকে মানে মানে নীচে ফিরে যেতে পারলেই যথেষ্ট।

আমার দুশ্চিন্তাও নেই, ক্লান্তিও নেই, কষ্টও নেই। ছবি তোলার আনন্দে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে বসবার পাথর বা কাঠের বেঞ্চি পাওয়া যায়, ফলে দরকার হলেই দুজনেই জিরিয়ে নিচ্ছি।

পথপ্রদর্শিকার নাম এলিয়েনা। বলল, 'আপনারা 'এলি'ই বলবেন।'

দুজনের জিভ খুব তেতো লাগছে শুনে এলি তার জলের বোতল আমাদের দিয়ে বলল, 'অনেকক্ষণ জল না খাবার জন্য জিভ এরকম তেতো হতে পারে।'

জল খেয়ে কথাটার সত্যতা মানতেই হল।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে কি? এলির পাহাড়ে ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস আছে। দরকার হলে ও আমার বা আমার যাত্রাসঙ্গিনীর পাহাড়ি ঘোড়া হয়ে যেতে পারে।

মেয়েটির কথায়, ব্যবহারে আমাদের প্রতি তার যত্নের পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ।

পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে হঠাৎই একসময় আবিষ্কার করলাম, গাইড নিরুদ্দেশ। আমি গলা তুলে ওর নাম ধরে যতই ডাকি, সে ডাক বেশ জোরে আমাদের কানেই ফিরে আসে।

ওই যে দূরে একা হেঁটে যাচ্ছে। কী ব্যাপার? কাছে গিয়ে দেখি, এদিক-ওদিক কী খুঁজছে, গলায় গুনগুন স্বরে গান।

'একটু গলা খুলে গাও, আমাদের শোনাও।'

'আমি রেইনডিয়ার খুঁজছি।'

'না পেলে কী আর করবে? তুমি গান শোনাও।'

'আমার গান আপনারা পরে টেলিভিশনে শুনবেন। এখন রেইনডিয়ার না দেখাতে পারলে আমার বড্ড খারাপ লাগবে। আপনাদের এতদূর নিয়ে এলাম!'

মেয়েটি আবার কোথায় হারিয়ে গেল। একটু পরে ফিরে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল। ওর ইঙ্গিতে আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। বেশ খানিকটা যাবার পর হঠাৎ দেখি অদূরে একপাল বল্গা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে!

হ্যামারফেস্টে পাহাড়ের মাথায় শেষপর্যন্ত রেইনডিয়ারের পাল দেখার এই আনন্দ এমনই আকস্মিক যে দুয়েক মুহূর্ত ক্যামেরা বার করতেই ভুলে যাই। এ যেন এক পরম আনন্দ! সব দেখারই একটা স্থান-কাল-বিষয় থাকে তো! তার সঙ্গে দেখবার তৃষ্ণাও মিলে গেলে সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

হ্যামারফেস্টে পাহাড়ের মাথায় সুমেরুবৃত্তের প্রচণ্ড রোদ্দুরে রাত দশটার পরেও আমরা একপাল বল্গা হরিণের বিচরণ দেখতে থাকি।

পরদিন কোস্টাল স্টিমার-লাইনের অন্য একটি স্টিমারে, অর্থাৎ সাততলা জাহাজে, জায়গা পেয়ে গেলাম। এবার বারগেন পর্যন্তই যাওয়া যাবে। হ্যামারফেস্ট থেকে পাঁচদিনের পথ। এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় কাজ বলতে, পাহাড়বদ্ধ খাঁড়ির অপরূপ শোভা দেখা আর একেকটি বন্দরে নোঙর ফেলা আর তোলার মাঝখানে এক-আধঘণ্টায় হঠাৎই একেকটা অচেনা শহর ঘুরে আসা। কোনও বন্দরে রাত তখন ১টা। কোনও বন্দরে রাত ৩টে। কোথাওবা ভোর ৫টা। পাঁচদিন ধরে শুধু চোখভরে দেখা আর ক্যাসেটভরে ছবি তোলা।

কিন্তু সে একেবারে আলাদা আখ্যান।

ছবি: লেখক

শেষ

প্রথম প্রকাশ 'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৬

ল ঘু ভা ষ - গু রু ভা ব

মৃত্যু : জীবনের প্রথম পাঠ

পবিত্র সরকার

পর্ব : ৩

অলীক অমরত্ব: জন্মান্তর, পূর্বজন্ম ইত্যাদি

আমরা দেখেছি যে, রবীন্দ্রনাথ যেধরণের জন্মান্তরের কথা বলেন, ধর্মীয় জন্মান্তরবাদ তত কাব্যিক নয়। আমার মতে জন্মান্তরের ধারণা মূলত গালগল্প দিয়ে তৈরি, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু মানুষ

আমাদের এই একটিমাত্র পৃথিবী, কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে একটিমাত্র গ্রহ, যেখানে জীবন নামে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। কেন ঘটেছে তার উত্তরটা তৈরি করে দিয়েছেন চার্লস ডারউইন...।

এই গালগল্প তৈরি করেছে নিজের ব্যাকুল প্রয়োজনে, এই তীব্র প্রশ্ন থেকে যে, আমার এই একটা জীবনই কি একেবারে শেষ কথা, এর আগে বা পরে কি আর কিছু নেই? বলা বাহুল্য, এই ভাবনা মানুষ ভেবেছে মৃত্যু ব্যাপারটাকে খানিকটা পরিণত দৃষ্টিতে দেখার পর। বিচ্ছিন্ন আকস্মিক ঘটনা হিসেবে নয়, জীবনের একটা চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি হিসেবে বোঝবার পর। মানুষ যখন তার অনন্য সম্পদ ভাষা পেয়েছে তখন তার mythopoeia বা গল্প তৈরির ক্ষমতাও জন্মেছে, কাজেই সে ভেবেছে জীবন একটিমাত্র জন্ম ও মৃত্যুর সীমানায় ছিন্ন হয়, তার বিস্তার আরও বেশি।

একথা মানুষের কেন মনে হল? একটা কারণ তো ছিল তার ভেতরে, সে মৃত্যুটাকে চরম পরিসমাপ্তি বলে মেনে নিতে চায়নি, এটুকুর মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে তা কি সহজে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়? আরেকটা উৎসাহ পেয়েছে সে বাইরে থেকে, প্রকৃতিকে দেখে। দেখেছে, প্রকৃতিতে, সূর্য রাত্রে উধাও হয়, সকালে আবার ফিরে আসে। চাঁদও রাত্রে আসে, দিনে কিছুটা আড়ালে চলে যায়। গাছপালা মরে যায়, আবার একই গাছ না হলেও তা থেকে অন্য গাছ গজায়। এথেকে আদি ও আধাখেঁচড়া দার্শনিক মানুষের মনে নিশ্চয় একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মেছিল যে, কোথাও একটা ধারাবাহিকতা আছে, শেষ হয়েও সব যেন শেষ হয় না, সব আবার ফিরে আসে। হয়তো অন্য রূপে, অন্য চেহারায়। একটা অন্তহীন চক্রের আভাস যেন তার মনে গড়ে উঠেছিল।

এপর্যন্ত ঠিকই ছিল সব, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা এই বোধটারই একটা চমৎকার কাব্যিক প্রকাশ দেখেছি। আমাদের এই একটিমাত্র পৃথিবী, কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে একটিমাত্র গ্রহ, যেখানে জীবন নামে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। কেন ঘটেছে তার উত্তর বিশ্বাসীরা একভাবে দেন, আমাদের মতো অবিশ্বাসীদের কাছে সে উত্তরটা তৈরি করে দিয়েছেন চার্লস ডারউইন, তাঁর 'দি অরিজিন অব স্পিসিজ' (১৮৫৯) বইয়ে। অর্থাৎ বিবর্তনের ফলে, যতই অপ্রত্যাশিত এবং আপতিক হোক, এই পৃথিবীতে প্রাণ এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের উদ্ভব ও বিবর্তন ঘটেছে।

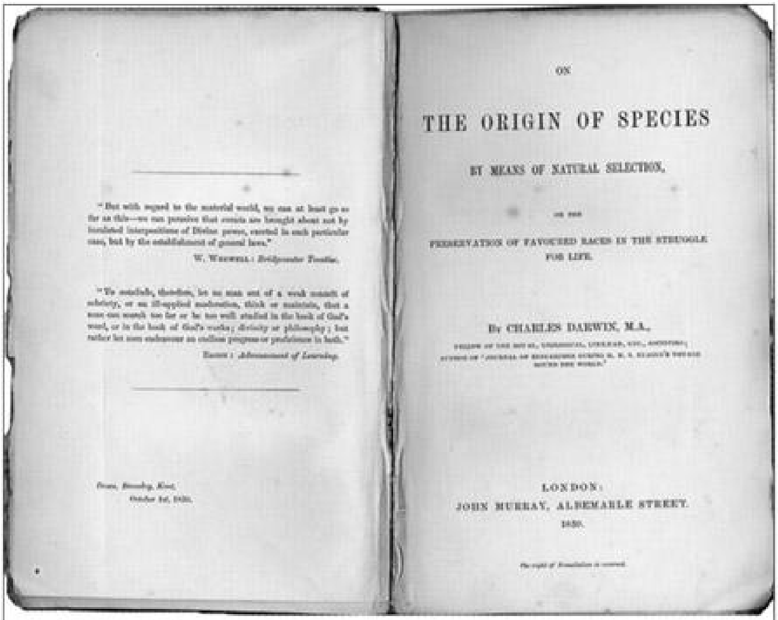
W. WHEWELL: Bridgewater Treatise.

BACON: Advancement of Learning.

ON
THE ORIGIN OF SPECIES
BY MEANS OF NATURAL SELECTION,
OR THE
PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE FOR LIFE.
By CHARLES DARWIN, M.A.
LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.
1859.

'দি অরিজিন অব স্পিসিজ'-এর প্রথম সংস্করণের মলাট

যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা বলবেন, 'ইয়ার্কি নাকি? সব এমনি এমনি হল? বিবর্তন নাকি অশ্বডিম্বের ফলে? একজন সৃষ্টিকর্তা না থাকলে এত সব হয় নাকি? বড্ড বেশি বুঝে ফেলেছ তোমরা, না-হ?'

যাঁরা এমন বলবেন তাঁদের কাছে আমাদের কিছু নির্বোধ ও বিনীত প্রশ্ন আছে। এক, কল্পনায় একজন সৃষ্টিকর্তার কথা আমরা ভাবতেই পারি, ঘড়ির যেমন একজন কারিগর থাকে। কিন্তু তিনি কোথায়? তাঁকে আমরা এখন আর দেখি না কেন?

উত্তর হবে, তুমি না দেখে থাকো, অন্যেরা তো দেখেছে। এত এত সব সাধুপুরুষ বলে গিয়েছেন তাঁরা দেখেছেন, তুমি কি তাঁদের মিথ্যেবাদী বলতে চাও?

তা কেন চাইব? শুধু নিজেকে ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসেবে ধরে নিয়ে এই আবদারটুকু করতে চাই যে, আমাকেও দেখা দিতে হবে। সামনে, হাজির হয়ে।

অনেকে বলবেন, তুমি এমন কী পুণ্য বা সুকৃতি নিয়ে এসেছ যে, ঈশ্বর তোমাকে দেখা দেবেন?

আমি বলব, আপনারাই বলেন তিনি অধমতারণ। আমার মতো তুচ্ছ লোকের একটা আবদার রাখবেন না?

আপনারা বলবেন, বিশ্বাসে মিলায় তিনি, তর্কে বহুদূর।

আমি বলব, তাহলে কি আপনাদের ঈশ্বর তর্ককে ভয় পান? যে তর্কের শক্তি আপনাদের মতে তাঁরই দেওয়া? তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান হলেন কী করে? আমার তর্ককে শাসন করতেই আমার কাছে এসে পৌঁছন তিনি। আমি তাঁকে নতমস্তকে মেনে নেব।

ব্যস, নাস্তিকতার এঁড়েতর্ক এখানেই থামাই। বুঝতে পারছি, আপনার বিশ্বাস নিয়ে আপনি থাকবেন, আমার অবিশ্বাস নিয়ে আমি। তার চেয়ে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মানুষের নিজের মধ্যে অনন্তের সন্ধানের কথাতেই ফিরে আসি।

আদিম মানুষ, আমাদেরই মতো, মৃত্যুকে সবকিছুর শেষ বলে মেনে নেয়নি। সে কল্পনার একটা স্বাভাবিক লম্ফ দিয়ে কল্পনা করেছে আত্মার, নিজের 'আমিত্ব'-এর বিস্তারের।

জন্মান্তর ছাড়াও মৃত্যুর পরবর্তী অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়, পৃথিবীর নানা সংস্কৃতির ধর্মীয় পুরাণে করা হয়েছে। তা হল, দেহহীন আত্মার। জীবন ও দেহের নানা পরিবর্তনের মধ্যে 'আত্মা'ই হল একমাত্র অপরিবর্তনীয় সত্তা...।

শেয়ালমুখো দেবতা আনুবিস (একেবারে ডানদিকে) এবং প্রেতলোকের অধিপতি ওসিরিস—খ্রিস্টের জন্মের ১৪০০ বছর আগে মিশরীয় পাথর খোদাই

সহজেই লক্ষে আসে, এই বিস্তার সে দুদিক থেকে কল্পনা করেছে। এক, এই জীবনের আগে, অর্থাৎ পূর্বজন্ম হিসেবে, আর এই জীবনের পরে, পরজন্ম হিসেবে। জন্মান্তরের রাস্তা তাই দুদিকে চলে যায়, পিছনের দিকে আর সামনের দিকে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আগের জন্ম নিয়ে মানুষের কল্পনা যত বেশিদূর বিস্তৃত হয়, পরজন্ম নিয়ে তত হয়েছে বলে জানা নেই। এর একটা বিচিত্র উদাহরণ দিই, তা সকলের কাছে গ্রাহ্য হবে কিনা জানি না। আমরা নানা গল্পে 'জাতিস্মর' ব্যাপারটার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, সত্যজিৎ রায়ের *সোনার কেল্লা* বাঙালিদের কাছে তার সবচেয়ে জনপ্রিয় উদাহরণ। এনিয়ে বিদেশে (এদেশেও) 'প্যারাসাইকোলজি' নামে একটা বিদ্যাও গড়ে উঠেছে। তার প্রত্যেকটি গল্পেই আগের জন্মের কথা এজন্মে স্মরণ করার ঘটনা আছে। লক্ষ করুন, বুদ্ধের 'জাতক'— কাহিনিও মূলত তাঁর পূর্বজন্মের গল্প। তিনি নির্বাণ লাভ করেছিলেন, ফলে তাঁর জন্মান্তর লাভের প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু এমন কোনও আধুনিক গল্প অন্তত আমি পড়িনি, যাতে এজন্মেই পরজন্মে কী হবে তা কেউ বলতে পারছে। অবশ্য আমি আর কতই বা পড়েছি! কিছু লোককথা শুনেছি অবশ্য। যেখানে কেউ বলছে, আমি পরজন্মে ওমুকের বাড়িতে ওমুকের ছেলে বা মেয়ে হয়ে জন্মাব। লোককথার বাইরে কোনও দৃষ্টান্ত থাকলে, ডাক্তার-মনোবৈজ্ঞানিকদের গবেষণাগারে এরকম কোনও 'কেসহিস্ট্রি'র কথা জানা থাকলে, বা আধুনিক কোনও গল্প-উপন্যাস কল্পবিজ্ঞান পাঠকেরা পড়ে থাকলে আমাদের দয়া করে জানাবেন। যুক্তির দিক থেকে যদি দেখি, তাহলে প্রথমটা সম্ভব হলে দ্বিতীয়টা সম্ভব হবে না কেন? এর উত্তরে বলা যেতেই পারে যে, আহা, ইহজন্মের কর্মফল শেষ হওয়ার আগেই পরজন্মে কী হবে বলা কারও পক্ষে সম্ভব হবে কী করে? আচ্ছা, মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছেও তো কেউ অন্তত বলতে পারত! প্যারাসাইকোলজি সম্বন্ধে আমার কোনও বিশেষ ব্যুৎপত্তি নেই, যাঁরা জানেন আমি তাঁদের দ্বারা শিক্ষিত হতে চাই।

যাই হোক, জন্মান্তর ছাড়াও মৃত্যুর পরবর্তী অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়, পৃথিবীর নানা সংস্কৃতির ধর্মীয় পুরাণে করা হয়েছে। তা হল, দেহহীন আত্মার। জীবন ও দেহের নানা পরিবর্তনের মধ্যে 'আত্মা'ই হল একমাত্র অপরিবর্তনীয় সত্তা, তা নানা জন্মের মালা গেঁথে তোলবার সুতো। কোনও কোনও লোকপুরাণে ঘুমের মধ্যে আত্মার সাময়িকভাবে দেহ থেকে ছুটি নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসার

কথা আছে, কিন্তু দেহের মৃত্যুর পর আত্মার কী দশা ঘটে, সেটা নিয়েই বেশির ভাগ ধর্মের মাথাব্যথা। কারণ, আগে যেমন বুঝেছি, আমার আমিকে আমি এই বিলয়হীন আত্মার মধ্যেই স্থাপন করে নিশ্চিন্ত হতে চাই। আত্মার শেষ নেই তো আমারও শেষ নেই। আত্মার চেতনাই জন্মান্তরের সমস্ত ধারণার ভিত্তি, যদিও নানা লোকপুরাণে আত্মা আছে অথচ জন্মান্তর নেই, এমন বিশ্বাসও লক্ষ করা যায়। মৃত্যুর পর দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে আসে, তারপর তা কোনও একটি মৃতদের উপনিবেশে চলে যায়। ইংরিজিতে সেই জায়গাটার সাধারণ নাম otherworld, underworld ইত্যাদি। গ্রিক পুরাণে হেদেস বা হাদেস, আসিরীয় পুরাণে 'যেখানে গেলে আর ফেরা যায় না'। সেখানে আত্মারা গিয়ে জমা হয়, কিন্তু আর কোথাও যায় না। সর্বত্রই ভালো মানুষের পুরস্কার কিংবা 'না-শাস্তি'র ব্যবস্থা আছে, আর খারাপ লোকেদের আত্মা-অবস্থাতেও শাস্তির ব্যবস্থা আছে। মিশরে আত্মাদের এই মৃত্যুপুরীতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত শেয়ালমুখো দেবতা আনুবিস, সে আত্মাদের নিয়ে যেত ওসিরিস বা ওসাইরিসের কাছে। তিনিই ছিলেন প্রেতলোকের অধিপতি, তিনিই ছিলেন বিচারকর্তা, তাঁর হাতেই আত্মাদের সমর্পণ করা হত। তিনি বিচার করে ভালো আত্মা আর মন্দ আত্মার জন্য যথাবিহিত শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। সেখানে তো দেবতা আমেমাইত পাপীদের হৃৎপিণ্ডই চিবিয়ে খেয়ে নিত। গ্রিক-আসিরীয় দুদলই যেখানে আত্মাকে একটা ছায়াশরীর ও বায়বীয় হিসেবে কল্পনা করে সেখানে আত্মা কীভাবে শান্তি পায় জানি না। ব্যাবিলনীয় পুরাণে কখনও আত্মা প্রথমে বাদুড়ের রূপ ধরে উড়ে যায় এমনও বলা হয়েছে। আর যেহেতু তারা ওই মৃত্যুলোক ছাড়া আর কোথাও যায় না, জন্মান্তর হয়ে পৃথিবীতেও আসে না, মৃত্যুলোকের জনসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সম্ভবত ছায়া দিয়ে তৈরি বলেই আত্মার সংখ্যাবৃদ্ধিতে মৃত্যুলোক গিজগিজ করতে করতে একসময় ঠাসাঠাসি হয়ে ফেটে পড়ে না, কিংবা আত্মায় আত্মায় ঠেলাঠেলি, মারামারি আর প্রাণঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় না। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদের কাছে আত্মা ছিল আয়না বা জলে ছায়ার মতো। তাতেই তো রক্ষে, নইলে ভাবুন তো একবার অবস্থাটা! 'ওয়ান-ওয়ে ট্র্যাফিকের' মতো পৃথিবী থেকে মৃত লোকেদের আত্মারা এসেই যাচ্ছে, এসেই যাচ্ছে, এসেই যাচ্ছে, কিন্তু একটি আত্মাও মৃত্যুপুরীর পাঁচিল (বা কালো ঢেউয়ের নদী, বা পাহাড়ের গভীর গহ্বর ইত্যাদি) টপকে বেরোতে পারছে না, সেজায়গাটার তো ফাটো ফাটো অবস্থা হওয়ার কথা। জন্মান্তর হলে তবু কিছু আত্মা বেরিয়ে জায়গা করে দিতে পারত আত্মাদের পরবর্তী প্রজন্মদের জন্য। প্রাচীন টিউটনিক (ইংরেজ-জার্মানদের) পুরাণে মৃত্যুলোক শাসন করতেন এক দেবী, তাঁর নাম হেল বা হেলা। যে দেবতা বা দেবীই থাকুন, তাঁরা কেউ এর কোনও সুব্যবস্থা করেছেন বলে পড়িনি।

অবশ্যই ইউরোপ এবং ইউরোপের বাইরেকার নানা সংস্কৃতির বহু লোকপুরাণে আত্মার নানা রূপ ধারণের কথা আছে। ভূতপ্রেত তার একটি রূপ, প্রেতাত্মা কথাটা তো আমাদের পরিচিত। ভূত সম্বন্ধে লোকবিশ্বাস আর শাস্ত্রের বচনে অল্পবিস্তর তফাত আছে, আমরা বেশিরভাগ সময় লোকবিশ্বাসকেই মান্য করে চলি।

এসম্বন্ধে আমার নিজের একটি কৌতুককর অভিজ্ঞতার গল্পটা বলেই ফেলি। পশ্চিম বাংলায় স্কুলে স্কুলে বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর একটা ধুম পড়ে যায় শীতকালের দিকে। এই লেখক যখন একটা উঁচু পদে ছিল তখন তাকে এরকম কিছু প্রদর্শনীর উদ্বোধনে ডাকা হত। এইরকম একটি অনুষ্ঠানে ঘটেছিল ব্যাপারটা।

একটি ক্লাস এইট কি নাইনের ছেলে তাকে একটি যন্ত্রের আশ্চর্য কলাকৌশল বোঝাচ্ছে, এখানে টিপলে ওখানে ধোঁয়া ওঠে, এখানে আলো জ্বলে ওঠে, আরেক জায়গায় ফোয়ারা দিয়ে জল বেরোয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এই লেখক খানিকটা যথাবিহিত মনোযোগ দিয়ে শোনার পর হঠাৎ তার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি জেগে উঠল, সে ছেলেটিকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বলো তো বাবা, ভূত আছে কিনা?'

ছেলেটি একটু থমকে গেল যেন। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, আছে।'

লেখক তখন আবার জিজ্ঞেস করল, 'বেশ, ভূত তৈরি হয় কী করে?'

ছেলেটি বলল, 'ওই যারা অপঘাতে মরে, তারাই ভূত হয়।'

লেখক তখন অনুচিতভাবে, যেন ওইটুকু ছেলেকে খুব বাগে পাওয়া গিয়েছে, প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, এত যে কুকুর-বেড়াল মরে, হাতিরা ট্রেনে কাটা পড়ে, বাঘ-হরিণ চোরা শিকারিরা শিকার করে, তাদের ভূত হয় না? কিংবা ধরো এত যে মশা মারছি আমরা রোজ গায়ে চটাপট শব্দ করে, তাদের কি ভূত হয় না?'

ছেলেটি একটু থতমত খেয়ে গেল, কিন্তু এর মধ্যে এক দাদা এসে তাকে বাঁচাল, বলল, 'স্যার, ও ছেলেমানুষ, ও ঠিকমতো বলতে পারবে না।'

কিন্তু আমরা বড়রাই কি বলতে পারব? অন্য প্রাণীর ভূত নেই কেন, আত্মা নেই কেন? কিংবা আরও যাদের প্রাণ আছে, সেই গাছেদের ভূত নেই কেন, আত্মা নেই কেন? নাকি মানুষ নিজেদের মৃত্যু নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত ছিল যে, অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বেলায় আত্মা আর জন্ম-জন্মান্তরের কথা ভাবতে ভুলেই গিয়েছিলাম। বেচারাদের ভাষা নেই বলেই তো নিজেদের ভূত-ভবিষ্যতের কথা ভেবেই উঠতে পারেনি ওরা! সত্যি যদি ওদেরও ভূত তৈরি হত, আর মানুষ সেগুলি দেখতে পেত তাহলে কী গণ্ডগোলই না বাধত! অবশ্য গল্পে প্রাণীদের ভূতের দেখা প্রচুর পাওয়া যায়, এমনকি জাহাজের ভূত, রেলগাড়ির ভূত, বাসের গাড়ির ঘোড়াগাড়ির ভূত— সবকিছুরই কথা পাই। কিন্তু মানুষের স্থায়ী বিশ্বাসে, ধর্মে বা শাস্ত্রে ইতর প্রাণীদের ভূতের বা আত্মার কথা খুব একটা স্পষ্ট জায়গা দখল করে আছে এমন নয়। অবশ্য কিছু কিছু গাছের সম্বন্ধে আমরা গল্প পড়েছি যে তারা এদিক-ওদিক যায়, কিংবা রাত্রে মাটিতে শুয়ে পড়ে বা উঠে দাঁড়ায়। ডাইনিরাও গাছে চড়ে গাছ উড়িয়ে নিয়ে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। আমি অবশ্য সেসব চর্মচক্ষে দেখার সুযোগ পাইনি।

প্রশ্নটা হল কেন এসব ভূতের কথা শাস্ত্রে নেই। উত্তরটা সহজ, মানুষ নিজেকে নিয়ে যত ভাবে, অন্যদের নিয়ে তত ভাবে না। এতদিন সে ভেবে এসেছে অন্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড়জগৎ মূলত তার উপভোগ ও ব্যবহারের জন্য। মানুষ নিজের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে পৃথিবীর ওপর, অন্যরা তার কাছে তেমন ধর্তব্যই নয়।

অনেক দেবতা আর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষের কথা সব পুরাণেই আছে যারা জীবিত অবস্থাতে নানা রূপ ধারণ করতে পারে। আমাদের মহাকাব্যে আছে রাক্ষসদের মায়ার কথা, যারা অক্লেশে নানা রূপ নিতে পারত, রামায়ণে যেমন মারীচ হয়েছিল সোনার হরিণ, মহাভারতে ঘটোৎকচ নিজের দেহকে বিশাল করার কায়দা জানত। জ্যাঠামশায় হনুমানের মতো সেও আকাশে স্বচ্ছন্দে উড়তে পারত। মানুষের ক্ষেত্রে সে ক্ষমতাও খুব সুলভ ছিল না, এক দেবতার বর পেয়ে কিছু পৌরাণিক মানুষ ছাড়া। তবে মৃত্যুর আগেও একধরণের আত্মার কথা কল্পনা করা হয়েছে কোনও কোনও লোকপুরাণে। যেমন আদি আমেরিকান (আমরা যাদের 'রেড ইন্ডিয়ান' বলতাম) বিশ্বাসে এমনও আছে যে, জীবিত অবস্থাতেও একটি বিকল্প আত্মার অধিকারী হওয়া সম্ভব। শিশু যে মুহূর্তে জন্মাল, ঠিক সেই মুহূর্তে যদি একটি প্রাণীর বা গাছের জন্ম হয়, তবে সেই প্রাণী বা গাছের মধ্যে শিশুর একটি বিকল্প আত্মা লালিত হয়। কিন্তু জীবৎকালীন এই আত্মা নিয়ে অন্য ধর্মগুলি খুব বেশি ব্যতিব্যস্ত হয়নি। তাদের যত চিন্তা মৃত্যুর পরে আত্মার কী হবে তাই নিয়ে।

অবশ্য মৃত্যুর পরে কে কী হবে, তা সচরাচর

ইরাকের ব্রাদোস্ত পর্বতে প্রাচীন শানিদার গুহা

কারও ইচ্ছের ওপর নির্ভর করত না, তার একটা পদ্ধতি ছিল। প্রথমত তাকে মরতে হবে, মরে কোনও একটা মৃত্যুলোকে আসতে হবে, তারপর সে আদৌ অন্য কোনও দেহ পাবে কিনা, পেলে কোন দেহ পাবে, তা মৃত্যুলোকের কর্তৃপক্ষ ঠিক করবেন। তা জন্মান্তরের প্রথম ধাপ, কিন্তু অনেক ধর্ম শুধু ওইটুকু পর্যন্তই এগিয়েছে, তার পরের ধাপ, অর্থাৎ আরও জন্ম, তারপরে আরও জন্ম— এইরকম কোনও ধারাবাহিক আত্মা-ইতিবৃত্ত আর কোনও সংস্কৃতি তৈরি করেনি, হিন্দু, বৌদ্ধ বা এ-দুটি ধর্মের প্রভাবে চিনা জাপানিরা যেমন করেছে। বৌদ্ধধর্ম এর মধ্যে একটু বিশিষ্ট এই কারণে যে, এধর্মে শুধু গৌতমবুদ্ধের হাজার হাজার পূর্বজন্মের কথা আছে তা নয়, নিজের সাধনায় জন্মান্তর সম্পূর্ণ লোপ বা নির্বাণের কথাও আছে। বস্তুতপক্ষে নিরীশ্বর মৌল বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করেছে নির্বাণ। জন্মান্তরবাদ বৌদ্ধ দর্শনের একটি মূল স্তম্ভ, কারণ এরই ওপর বৌদ্ধধর্মের 'মুক্তি' বা নির্বাণের ধারণাটি স্থাপিত। সেখানে স্বর্গ নেই, পরলোক-প্রাপ্তি নেই, আছে জন্মের পর জন্মের 'ভবচক্র' পার হয়ে অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ লয় করে দেওয়া। হিন্দুর পুনর্জন্মবাদ আর বৌদ্ধ পুনর্জন্মবাদের মধ্যে আরও নানা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। আমাদের সেই কচকচির মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই।

কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল, দেহ অস্থায়ী আধার, আত্মা স্থায়ী, অন্তত দীর্ঘস্থায়ী। নানা রূপকের মধ্যে এই বিষয়টাই বারবার বলা হয়েছে। গীতায় যেমন বলা হয়েছে মানবশরীরের যেমন জামাকাপড়, তেমনই দেহ হল আত্মার জামাকাপড়। আত্মা স্থায়ী, দেহ অস্থায়ী। আত্মা জন্মের পর জন্মে নিজেকে নানা দেহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করবে, যতদিন না তার সম্পূর্ণ বিলয় হয়। বৌদ্ধধর্মে এই বিলয়ের তত্ত্বটি খুবই স্পষ্ট, তারই নাম নির্বাণ। হিন্দুধর্মে নানা পন্থা অনুযায়ী কখনও এর নাম 'মুক্তি', কখনও স্বর্গপ্রাপ্তি, কখনও ঈশ্বরের পাদপদ্মলাভ, বৈষ্ণবের কাছে বৃন্দাবনপ্রাপ্তি। পাপীদের কী হয় তার নানা বীভৎস বিবরণ নানা পুরাণে আছে, তার মধ্যে আমরা না হয় নাই গেলাম। দান্তের 'দিভিনা কোম্মেদিয়া' বা 'ডিভাইন কমেডি'-তে তৃতীয় সর্গে এইজন্য নরকের সদর দরজাতেই লেখা আছে, 'যারা এখানে ঢুকছ তারা সব আশা ছেড়ে এসো, (Abandon all hope, ye who enter)। এ-কাব্যে খ্রিস্টীয় নরকের দশটি অংশের মানচিত্রের মতো বর্ণনা আছে, কত ধরণের পাপ আর তার কী কী শাস্তি, তারও চমৎকার হিসেব আছে। খ্রিস্টীয় নরক বিষয়ে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লস্ট'ও মহাসুখে পড়ে দেখতে পারেন। মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্য*-তে তার খানিকটা অনুসরণ আছে। প্রখ্যাত সাঁওতাল সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ বোডিং দেখিয়েছেন, নরকের ধারণা সাঁওতালদের কাছেও এক ভয়ংকর শাস্তির এলাকার রূপ পেয়েছে। বেঁচে থাকতে যে ব্যক্তি লোকের দেনা শোধ না করে নরকে আসে, তার পিঠের চামড়া ছুলে নিয়ে তাতে নুন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই ক্ষত সময়ে সেরে গেলেও রেহাই নেই, আবার তার চামড়া ছাড়িয়ে আবার তাতে নুন ছিটানো হবে।

মৃত্যুর পরে দেহের সঙ্গে তার নিজস্ব আত্মার কী সম্পর্ক থাকে তা নিয়েও নানা ধর্মের নানা ভাবনাচিন্তা লক্ষ করি। তার বিশেষ প্রকাশ নানা ধর্মের শবের সৎকার বা অন্ত্যেষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে। আত্মা দীর্ঘকাল দেহের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চায়, এই বিশ্বাস থেকেই কবর বা সমাধি-প্রথার সৃষ্টি এবং এখনও পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যাপক ও জনপ্রিয় সৎকার-সংস্কার হল সমাধি প্রথা। পণ্ডিতদের অনুমান, নেয়ান্দরতাল মানুষের সময় থেকেই সমাধি-প্রথা চালু হয়ে যায়। ইরাকের শানিদার গুহাতে ষাট হাজার বছর আগেকার কবর আবিষ্কৃত হয়েছে, ফ্রান্সেও লা ফেরাসি অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে পঞ্চাশ হাজার বছর আগেকার কবর বা সমাধি। তা যে শুধু খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামে অনুসৃত হয় তা নয়, পৃথিবীর আরও নানা ধর্মে, এমনকি হিন্দুধর্মেও আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে। এর একটা দিক হল এই লোকবিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর আত্মারা সহজে সংসারের মায়ার বন্ধন কাটাতে পারে না, তাই তার সন্তান বা সম্পত্তির কাছাকাছি ঘুরঘুর করে, মনোজ মিত্রের *সাজানো বাগান* নাটকে বা *বাঞ্ছারামের বাগান* সিনেমায় যা খুব সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। এইজন্য আত্মার সন্তান বা প্রিয়জনের একবছর খুব সাবধানে, নানা সংযমের মধ্যে থাকতে হয়। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাহীন, শরীরচেতনাহীন অবস্থায় পৌঁছবার আগে আত্মার কিছু দৈহিক সংস্কার থেকে যায় একটা মধ্যবর্তী পর্যায়ে। এই আত্মা একটা বায়বীয় সত্তা হলেও, তার নানা বন্ধনময় মায়া এখনও কাটেনি, সে কোনও বিশুদ্ধ এক মানসিক অস্তিত্ব পুরোপুরি হয়ে ওঠেনি, তার দেহ না থাকলেও।

এটা হিন্দু প্রথা থেকেও বেশ বোঝা যায়। মৃত্যুর পরে মৃতের ছবির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্লেটে মিষ্টি ফল জল ইত্যাদি রাখার রেওয়াজ আছে অনেক বাঙালি হিন্দু বাড়িতে। আর যারা সমাধি দেওয়ার প্রথা মেনে চলে তাদের অনেকেই ভাবে বা ভেবেছে যে, দেহ প্রাণহীন হলে কী হবে, তার মধ্যে আত্মা বা প্রাণ ফিরে আসতেই পারে। তাই তারা দেহকে ধ্বংস করে না। খ্রিস্টীয় আখ্যানে যিশুর 'রেজারেকশন' বা পুনরুত্থান ঘটেছিল, সমাধিতে তার দেহ ছিল বলেই। এর সবচেয়ে স্থূল অথচ সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির দিক থেকে সবচেয়ে জটিল প্রকাশ দেখা যায় প্রাচীন মিশরে, যেখানে অত্যন্ত বিশদ প্রক্রিয়ায় মানুষের শব 'মমি' করে রাখা হত। অবশ্যই বিশেষ মূল্যবান সব মানুষের শব, অর্থাৎ রাজারাজড়াদের শব। সকলের এই কপাল হত না। ধরেই নেওয়া হত যে, পিরামিডের গভীরে রাজারানিদের দেহে কখনও হয়তো তাদের আত্মা ফিরে আসবে। সেজন্য তাদের রথ, মণিমুক্তা, রানি, দাসদাসী, প্রহরী সবাইকে কবর দেওয়া হত, এমনকি রাজার রক্ষিতাদেরও। বিলাসের আরও যত উপকরণ মানুষের উদ্দাম কল্পনা উদ্ভাবন করেছে, সব হাতের কাছে রেখে দেওয়া চাই।

পিরামিডের নীচে তুতেনখামেনের সমাধিতে একটা আস্ত পেটা সোনার কফিন ছিল, ছিল সোনার মুখোশ আর অজস্র মণিমুক্তাহিরেজহরত। কারণ বলা তো যায় না, মৃত শব আত্মা ফিরে পেয়ে কখন কী বা কাকে চাইবে সেবা বা উপভোগের জন্য! মিশরের পিরামিডের তলায় ঢুকে সেসব দেখে আসার সুযোগ এই অধমের হয়েছে।

নৃবিজ্ঞানীরা আমাদের দেখিয়েছেন, সমাধি বা কবর বিচিত্র ধরণের হয়েছে। সমতলের আদিবাসী আমেরিকানরা একসময় মৃতদেহ খোলা জায়গায় ফেলে রাখত, মুম্বইয়ের পারসিরা যেমন রাখত ছাদের ওপরে 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'-এ। সেখানে শকুন ও অন্যান্য পাখিরা শবের মাংস খেয়ে কঙ্কালটা রেখে গেলে মৃতের হাড়গোড় সযত্নে রক্ষা করা হত। ইন্দোনেশিয়া, মেলানেশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে ছিল এই প্রথা। তিব্বতে ছিল পাহাড়ের চুড়োয় মৃতদেহকে রেখে আসার প্রথা, হয়তো সেটা স্বর্গের কাছাকাছি ধরে নিয়েই। শুইয়ে, কাত করে, চিত করে, নানাভাবে কবর দেওয়ার প্রথা ছিল। কোরিয়াতে শবকে তিন মাস পর্যন্ত খোলা কফিনে রাখা হত একসময়, যদি এর মধ্যে তার আত্মা ফিরে আসে।

এই বীভৎস প্রথা আরেক চেহারায় দেখা দিয়েছিল ভারতের সতীদাহ ব্যবস্থায়। সেখানে কবর দেওয়ার উপায় নেই, কাজেই রাজা-জমিদারদের স্ত্রীদের সঙ্গে তাদের রক্ষিতাদেরও পুড়িয়ে মারা হত, কারণ ধরেই নেওয়া হত যে, রাজাদের বাসনা-কামনা মৃত্যুর পরেও অটুট থাকবে, তারা তো আর সাধারণ মানুষের মতো নয়! এমনকি সতীদাহ যখন উঠে গেল বা যেখানে ছিল না, সেখানে বিধবাদের ওপর যে নানা বাধানিষেধ চাপানো হত, এখনও হয়, তাতে বিধবাটির পুণ্যের সঙ্গে প্রয়াত স্বামীদেবতার মনস্তুষ্টির উপাদানও মিশে ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

বিপুল এবং ব্যাপক মতভেদের সম্ভাবনা মেনেও, এই লেখকের মতে, এগুলি মানুষের পরলোক সম্বন্ধে অজস্র বিচিত্র গালগল্প ও অন্ধবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অমানবিক সব প্রথা। আত্মা, ভূত, শবের পারলৌকিক বাসনা-কামনা— কিছুই বাস্তব ঘটনা নয়, বেঁচে থাকার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাই এর আদি উৎস। আমার 'আমি'র চেতনায় মৃত্যু চিরকালের মতো ছেদ টেনে দেবে, এ আমরা কিছুতেই মেনে নিতে চাই না, তাই 'আমি'কে 'আত্মা' নাম এবং অবিনাশী মাহাত্ম্য দিয়ে আমরা তাকে চিরত্ব দিতে চাই। এই আত্মপ্রবঞ্চনার মনস্তত্ত্ব অস্বাভাবিক কিছু নয়।

৬

অমরত্বের কল্পিত আশ্বাস: বংশপ্রবাহ, 'আমি'র বিস্তার

এই 'আমি' যে নিজেকে নিজের উত্তরপুরুষের মধ্যে বিস্তারিত এবং অব্যাহত দেখতে চাইবে, এও তো খুব স্বাভাবিক মানবিক কামনা। আত্মার ব্যাপারটা আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু আমার সন্তানদের আমি চোখে দেখি, স্নেহের বন্ধনে অনুভব করি, স্পর্শ করি আদরে বা শাসনে, তার জন্ম থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত অপরিসীম যত্নে উদ্বেগে উৎসাহে তাকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। কখনও তার সন্তান, কিংবা তারও সন্তানকে দেখে যাওয়ার সুযোগ হয়। এই ধারাবাহিকতা আমাদের কাছে জীবৎকালেই লভ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ নানা উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে পিতা বা পিতৃপুরুষ থেকে সন্তান-সন্ততির মধ্যে এই আমির বিস্তারটিকে আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে আনার চেষ্টা করেছেন। উপনিষদ থেকে যাজ্ঞবল্ক্যের একটি শ্লোক তাঁর অতিশয় প্রিয়:

ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

তাঁরই অনুবাদ: পুত্রকে কামনা করছ বলেই যে পুত্র তোমার প্রিয় হয় তা নয়, আসলে আত্মাকেই কামনা করছ বলে পুত্র প্রিয় হয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথ থামেন না, বরং তার 'তাৎপর্য'টিকে পরক্ষণেই জুড়ে দিয়ে বলেন, 'আত্মা পুত্রের মধ্যে আপনাকেই অনুভব করে বলেই পুত্র তার আপন হয় এবং সেইজন্যই পুত্রে তাঁর আনন্দ।' রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই এর একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও দেন, এই

পিরামিডের নীচে তুতেনখামেনের সমাধিতে একটা আস্ত পেটা সোনার কফিন ছিল, ছিল সোনার মুখোশ আর অজস্র মণিমুক্তাহিরেজহরত। কারণ বলা তো যায় না, মৃত শব আত্মা ফিরে পেয়ে কখন কী বা কাকে চাইবে সেবা বা উপভোগের জন্য!

সঙ্গের ছবিতে সেই ধনরত্নেরই একাংশ

(*শান্তিনিকেতন* উপদেশকালীন) পর্যায়ে তিনি এক 'পরমাত্মা'র মধ্যে সমস্ত আত্মার উৎস ও আশ্রয় কল্পনা করেন। আমরা তা গ্রহণ করি না, কিন্তু 'আমি'র সূত্রে যে পিতা পুত্র বা তাদের সন্ততিরা যুক্ত হয়, এটুকু না মানার কোনও কারণ নেই। যিশুখ্রিস্টের 'I and my Father is one' কথাটিও রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয়।

আমরা সবাই এক পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত হয়েছি কিনা তা ধর্মতত্ত্বের সিদ্ধান্ত, রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনও মহাপুরুষ একথা শিরোধার্য করতেই পারেন, কিন্তু আমরা সাধারণ বা

নিরক্ষর মানুষেরা একথাকে যাচাই করবার কোনও উপায় এখনও খুঁজে পাইনি। পরমাত্মা কে, কোথায় তিনি থাকেন, কীভাবে আমরা বেঁচে বা মরে তাঁর অংশ হয়ে যাই, এসম্বন্ধে কোনও প্রত্যক্ষ হাতে-কলমে জ্ঞানলাভের সুযোগ আমাদের নেই। কিন্তু সন্তান থেকে মানুষ যে আনন্দ পায় তা তো মিথ্যা নয়, সেটা আমরা সকলেই বুঝি। সম্পত্তির লোভে সন্তান মা-বাবাকে তাড়ায়, হত্যা করে, হয়তো অবৈধ প্রেমের জন্য মায়ের সন্তানহত্যার দৃষ্টান্তও পৃথিবীর নেতিবাচক ইতিহাস বেশ কিছু তৈরি করেছে, তবু সন্তানের জন্ম আনন্দময়, এটাই এখনও অধিকতর সত্য। বহুপ্রজ দরিদ্রের ঘরেও। নবজাতককে নিয়ে কত উৎসব সৃষ্টি করেছে মানুষের সমাজ।

অবশ্যই মানুষের সামাজিক ইতিহাসে এখানেও লিঙ্গ-বিভাগ এবং দুই লিঙ্গের অসমান মূল্যনির্ধারণ হয়ে গিয়েছে। পুত্রসন্তান আর কন্যাসন্তান জন্মের আনন্দে শুধু যে মাত্রাভেদ করা হয়েছে তা নয়, কন্যাসন্তানের জন্ম আনন্দের কিনা সে ব্যাপারটি নিয়েই নানা সংস্কৃতিতে নানা প্রশ্নচিহ্ন আছে। পুত্র জন্মানোর আনন্দ যে একটা বিশেষ আনন্দ, এবং কন্যার জন্ম যে সে অর্থে আনন্দই নয়, তার অজস্র দৃষ্টান্ত সাহিত্যে পাওয়া যায়। আরও নানা বিচিত্র জায়গায় তার উল্লেখ আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রেও বলা হয়েছে যে, যদি ভাষার নিয়মনির্দেশে শ্লোক রচনার সময় বৈয়াকরণ একটিমাত্র দল বা সিলেবলের সংখ্যাও কমাতে পারেন তবে তাঁর পুত্রমুখ দর্শনের আনন্দ হয়। আমাদের ভারতীয় ভাষায় 'কন্যামুখ দর্শনের আনন্দ' বলে কোনও কথা নেই। আবার 'পুত্রশোক' কথাটা অভিধানে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে আছে, কিন্তু 'কন্যাশোক' বলে কোনও শব্দ নেই। পর পর কন্যার জন্ম হতে থাকলে আগে তাদের নাম হত 'আন্নাকালী', আর পরে আরও পরিশীলিত 'ইতি', 'সমাপ্তি', 'সীমা' ইত্যাদি নাম জোটে মেয়েদের। অর্থাৎ এইটিতেই শেষ হোক। আর যেদেশে কন্যাভ্রূণ হত্যা একটি গোপন সামাজিক পোষকতা পায় সেদেশে এসম্বন্ধে বেশি বলা নিরর্থক।

বংশরক্ষা অবশ্যই হয় শুধু পুত্রদের দ্বারা। অন্তত প্রাচীন যৌথ সমাজ, এবং মাতৃপরিচয়ে সন্তানের পরিচয়ের প্রথা থেকে মানুষ যখন সরে এসেছে, মূলত কৃষিকর্ম ও পারিবারিক সম্পত্তির সংস্কৃতি শুরু হওয়ার পর থেকে যখন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, তারপর থেকে পুরুষ থেকে পুরুষে বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে, বাপ থেকে ছেলেয়। মেয়েদের সেখানে কোনও ভূমিকা ছিল না, এখনও বড় একটা নেই, যদিও এখন তাদের বাপ-মায়ের সম্পত্তির ভাগ স্বীকার করা হয়েছে। মনুসংহিতার 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' শ্লোকটি এবিষয়ে পরিষ্কার কথা বলে, কোনওরকম ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে যায় না, কিছু লুকোবারও চেষ্টা করে না। ভারতে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ বোধ হয় স্ত্রী-র গর্ভে প্রথমে মেয়ে জন্মালে স্বামীদেবতাটি তাকে বিশ্রাম না দিয়ে আরেকবার তার গর্ভে বীজ নিক্ষেপ করে; দ্বিতীয়বার কন্যা জন্মালে স্বামী স্ত্রীকে এবারও রেহাই দেন না, এইভাবে পুত্রলাভের পরিসংখ্যানগত সম্ভাবনার ফলোদয়ের জন্য স্ত্রীটিকে বারবার গর্ভধারণে বাধ্য করে। স্বামীর এই প্রশংসনীয় উদ্যমে বহু স্ত্রী সূতিকাগারে মরে গিয়ে জনসংখ্যা কিছুটা কমিয়েছেও বটে, কিন্তু অকারণ জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে তা যৎসামান্য।

লেভি স্ত্রোস বলে একজন পণ্ডিত বলেছেন, সংস্কৃতি ভাষাময়। কথাটা যে কত সত্য তা বুঝতে পারি যখন দেখি যে, যাদের ভাষা নেই তাদের এই বংশরক্ষা বিষয়ে কোনও বোধই জন্মায়নি। ধরুন বাঘ, হাতি বা বানরের নিশ্চয় সন্তানস্নেহ আছে, তা আমরা দেখতে পাই, গল্পে-উপন্যাসে পড়ি, কোনও কোনও প্রাণীর ক্ষেত্রে শিশুরা গোষ্ঠীর দায়, কিন্তু তাদের কারও কি সন্তানের সন্তান বা নাতি-নাতনিদের সম্বন্ধে কোনও আবেগ তৈরি হয়? আমি তো জানি না, হয়তো পশু-সমাজতাত্ত্বিকরা এবিষয়ে আলোকপাত করতে পারবেন। ফলে ভাষায় 'বংশ', 'রক্ষা', 'পুত্র', 'পিতা' এই ধারণাগুলি না উদ্ভূত হলে পূর্বপুরুষ উত্তরপুরুষের সংজ্ঞা না তৈরি হলে এই বংশরক্ষার বিষয়টাই দাঁড়াত না। ভাষাই সংযোগ রক্ষা করে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে। কালের সীমা অতিক্রম করে যায় ভাষা আর লেখা। আরও আছে নানা যোগসূত্র, কিন্তু তারাও ভাষার সাহায্য ছাড়া অচল। তাই পশুদের বংশরক্ষা নেই। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে তবুবা দুই প্রজন্মের মমতার একটা বন্ধন থাকে, কিন্তু তার বেশি থাকে কিনা সন্দেহ। গরুবাছুরের কথাই ধরুন। তাদের সন্তানস্নেহের নানা দৃষ্টান্ত বহু দেখেছি। সন্তানের জন্মের পর গোমাতার ব্যাকুলতা আমি লক্ষ করেছি, আপনারাও করেছেন। কিন্তু সে বড় হওয়ার পর মানুষের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা যখন সন্তান আর মায়ের মধ্যে তফাত তৈরি করে, তখন কতদিন সেই মমতা তারা বজায় রাখতে পারে? বেড়ালের মতো প্রাণী, বছরে যারা একাধিকবার সন্তানের জন্মদান করে, তাদের সন্তানদের জন্মের আগে আর পরে সাময়িক মমতা আমরা লক্ষ করি অবশ্যই। আমার মনে আছে আমাদেরই একটি বেড়ালের বাচ্চা মরে যাওয়ার প্রায় তিন মাস পরে মা-বেড়াল বাগানে একটি টুনটুনি পাখি মেরে বাচ্চাকে ডাকছিল অদ্ভুত এক স্বরে, যেন সে তার জন্য উপাদেয় খাদ্যের ব্যবস্থা করেছে, সে এসে এক্ষুনি তার ভাগ বুঝে নিক। এই বিলম্বিত মমতার চিহ্ন আমার কাছে মর্মস্পর্শী মনে হয়েছিল। কিন্তু তারপর? বাচ্চাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম যখন একের পর এক আসতে থাকে, আগের প্রজন্মের প্রতি থাকে তাদের সেই মমতা? চিনতে পারে মা আর সন্তানেরা পরস্পরকে? আর যারা স্তন্যপায়ী নয়, তাদের এনিয়ে কোনও মাথাব্যথাই নেই। মাছের কথা ভেবে দেখুন। কথায় বলে 'মাছের মায়ের পুত্রশোক!' যে মৎস্যমাতা হাজার হাজার ডিম ছেড়ে চলে যায়, তার কি বংশের কোনও ধারণা আছে? কোনও কোনও মাছ অবশ্য একটা সময় পর্যন্ত তার বাচ্চাদের কিছুটা রক্ষা করবার চেষ্টা করে, যেমন পাড়াগাঁর পুকুরে চিতল, বোয়াল মাছ বা শোল মাছ। চিতল মাছ যেখানে ডিম পাড়ে, প্রায়ই ঘাটের সিঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে, সেখানে কেউ পা ফেললে সেই পায়ে কামড় দিয়ে মাংস কেটে নিয়েছে বলে জানি। শোল মাছ শোলের পোনাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন নিয়ে ঘোরাফেরা করে। ডোবার জলে মেঘের ছোট টুকরোর মতো শোলের পোনার ঝাঁক দেখে আমরা বুঝতাম ডোবার ওইখানে একটা শোল মাছ আছে, সেটা তার এবং তার বাচ্চাদের পক্ষে খুব অনুকূল ব্যাপার হত না। কিন্তু কতদিন তারা রক্ষা করত তাদের? কতদিন থাকত তাদের মমত্বের বন্ধন?

পাখিরাও অণ্ডজ প্রাণী, এবং পাখিদের মধ্যেও সন্তানের প্রতি মমত্বের নানা দৃষ্টান্ত আমরা দেখি, রূপকথা, উপকথা, গল্পে তার নানা আখ্যান আমাদের জানা। কাকের বাসা বাঁধবার বিপুল তোড়জোড় দেখি, ধৈর্য নিয়ে ডিমে তা দেওয়া দেখি, শিশুকে রক্ষা করার নানা প্রয়াস দেখি, কিন্তু তারপরে? কিন্তু তাদেরও কি এক প্রজন্ম উত্তীর্ণ হয় বংশের ধারণা? কিংবা একবারের বাচ্চাদের স্মৃতি কি পরের বারের কিংবা তারও পরের বারের বাচ্চারা পর্যন্ত টিকে থাকে? পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ, এদের নানা প্রজন্মের মধ্যে ক'টি প্রজাতির আছে সন্তানস্নেহের ঘটনা? একটি প্রজাতিরও কি আছে সন্তানের সন্তানের (অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিক্রমের) বোধ? মায়ের কথা না হয় কিছুটা বোঝা গেল, কিন্তু এদের পিতার কোনও ধারণা কি আদৌ সম্ভব? পশুদের ক্ষেত্রে কোথাও পিতার বা মাতার গর্ভে বীর্যনিক্ষেপকারীর পরিচয়-সংক্রান্ত ধারণা আছে কি? তাদের সমাজব্যবস্থাই তাদের পিতার ধারণা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

মানুষের সমাজব্যবস্থা কালক্রমে যে রূপ নিয়েছে, তাতে পিতার স্থান ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে আছে মানুষের ভাষা। ভাষা ছাড়া পিতামাতার হোক, বংশগত

ধারাবাহিকতার হোক, কোনওরকম ধারণাই হওয়া অসম্ভব, এবং এখানেই মানুষের জিত, অন্যদের হার।

বংশরক্ষা তো একটা মানসিক ধারণা, এবং তা লোকবিশ্বাসে পুনর্জন্মের ধারণার সঙ্গেও কখনও যুক্ত হয়ে যায়। পূর্বপুরুষ উত্তরপুরুষের ঘরে এসে জন্ম নেয়, কেউ কেউ বলেও যায় যে, 'আমি তোমার ছেলে হয়ে বা মেয়ে হয়ে জন্মাব।' 'আমি' এইভাবে নিজেকে বিস্তার করতে চায় উত্তরপুরুষে। আমরা বলেছি যে, এই 'আমি'রই একটা আধ্যাত্মিকতা ছোঁয়া রূপ হল আত্মা, সে এই বংশগত বিস্তারকেও অতিক্রম করে যেতে চায়, নিরবধিকালে এবং নানা লোকে অব্যাহত থাকতে চায়।

বংশের স্থায়িত্বের আরেকটা বাস্তব বা কংক্রিট চেহারা আছে, তা হল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে। বাড়ি রইল, পুকুর বাঁশবাগান জমিজমা বনবনানী রইল, উত্তরপুরুষ ভাববে এসবের মধ্যেও আছে আমার ঠাকুরদা বা ঠাকুরদার বাবা, যেমন সে আছে রেখে-যাওয়া রুপোর হুঁকো-কলকে বা আসবাব দেয়ালঘড়ি বাদশাহি মোহরের মধ্যে। এইসব বাস্তব স্মৃতি অবশ্যই মৃত্যু ব্যাপারটাকে, মানুষের শারীরিক অনুপস্থিতিকে, সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিতে পারে না, কিন্তু আমরা ধরে নিই যে, এইসব ফেলে যাওয়া জিনিসগুলির মধ্যে তাঁদের একটা অদৃশ্য উপস্থিতি আছে। এ-আমাদের কল্পনামাত্র। তেমনই মৃতের জন্য আমরা যেসব স্মারক গড়ি, ছবি হোক, মূর্তি হোক, স্তম্ভ হোক, তাজমহলের মতো বিপুল সৌন্দর্যময় সৌধ হোক, তাতে আত্মার অধিষ্ঠান করে বা ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। অবশ্যই আমার মতো অবিশ্বাসীর কথা এই, বিশ্বাসীরা নিশ্চয় তাঁদের বিশ্বাস বহন করে চলবেন। ভূতের গল্পে ছবি বা মূর্তি নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের মতে সেও মানুষের গড়া শিল্প মাত্র, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এমনকি ভূতের ছবি ঠিক কীরকম, তা নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে হুবহু মতৈক্য নেই। পাশ্চাত্যে ভূত আগাগোড়া সাদা আলখাল্লা পরা একটা মূর্তির মতো, শুধু চোখমুখের জায়গায় কালো ফুটো, কিন্তু প্রাচ্যে অর্থাৎ আমাদের দেশে ভূত মূলত কঙ্কাল, যদিও অনেক সময় তারা শাড়ি জামাকাপড় পরে থাকে। মধ্যপ্রাচ্যের ভূত আবার অন্যরকম, তাদের থেকে কিছু ভূত পাশ্চাত্যজগৎ ধার নিয়েছে। Genii কথাটাই গিয়েছে আরবের 'জিন' থেকে। আমরাও জিন, 'মামদো' (সম্ভবত মুসলমান ভূত) কথাগুলি নিয়েছি ওই একই উৎস থেকে।

তাছাড়া পাশ্চাত্যে নানা ধরণের ভূত বা অপদেবতা বা উপদেবতা আছে। গোস্ট আছে,

> শিল্পের উৎকর্ষের ওপর শিল্পীর মরণোত্তীর্ণ আয়ুষ্কাল নির্ভর করে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যাদের কীর্তি তাদের জীবৎকালেই সীমাবদ্ধ, মৃত্যুর পরে সৃষ্টি বা কর্মের চিহ্ন হিসেবে তারা কোনও নিদর্শন রেখে যেতে পারেনি। কিন্তু বেঁচে থাকতে এরা কমবেশি স্মরণীয় কাজ করেছে, ভালো খারাপ দুই অর্থেই।

নামান্তরে তারা spectre। গুল আছে (এরা ভালো কাজ করে না, মড়া-টড়া খায়), গবলিন আছে, যারা নানারকম দুষ্টুমি করে। আছে 'এলফ', যারা ছোট্টখাট্ট দেখতে, মাথায় লম্বা ছুঁচলো কাপড়ের টুপি, অনেকটা সার্কাসের ভাঁড়ের মতো, তারাও নানারকম দুষ্টুমি করে বেড়ায়, কিন্তু মানুষের খুব ক্ষতি করে না। বরং উপকারও করে। বুড়ো দর্জি আর এলফদের উপকথা আপনারা অনেকেই নিশ্চয় পড়েছেন। পিক্সি খানিকটা পরিদের মতো। এরা সবাই যে মানুষ মরে হয় তা নয়, প্রেতাত্মা নয়। আমাদের ক্ষেত্রে যেমন আছে দেবতা আর মানুষের মাঝামাঝি নানারকম তির্যকযোনি, রাক্ষস, দৈত্য, দানব, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব ইত্যাদি। প্রেতাত্মাদের মধ্যে আমাদের আছে ভূত, পেতনি, ব্রহ্মদৈত্য, শাঁকচুন্নি, কন্ধকাটা, শঙ্খিনী ইত্যাদি অনেক রকমের ভূত ও পিশাচ। পিশাচরা বিলিতি গুলের সগোত্র, তারা শ্মশানে থাকে এবং নানা অরুচিকর কাজ করে। আমাদের মতে এরা সবই মানুষের কল্পনার সৃষ্টি, বা তার শিল্প।

৭

অমরত্বের কল্পিত আশ্বাস ঃ ২

অন্যের স্মৃতিতে 'অমরত্ব': কীর্তির্যস্য

শিল্প নিয়ে আলোচনার আগে আরেক ধরণের 'অমরত্বের' কথা বলি। দেহের নয়, আত্মার নয়, তা হল, মানুষের স্মৃতিতে একধরণের অমরত্ব। শিল্পের অমরত্বের সঙ্গে এর তফাত হল, শিল্প শিল্পীর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে, তার সূত্র ধরে শিল্পীর জীবন ও কর্মে পৌঁছে যাই আমরা। অবশ্যই শিল্পের উৎকর্ষের ওপর শিল্পীর মরণোত্তীর্ণ আয়ুষ্কাল নির্ভর করে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যাদের কীর্তি তাদের জীবৎকালেই সীমাবদ্ধ, মৃত্যুর পরে সৃষ্টি বা কর্মের চিহ্ন হিসেবে তারা কোনও নিদর্শন রেখে যেতে পারেনি। কিন্তু বেঁচে থাকতে এরা কমবেশি স্মরণীয় কাজ করেছে, ভালো খারাপ দুই অর্থেই। ফলে কবর-সমাধির স্মৃতিফলকের বা শ্মশানে স্মৃতিস্তম্ভের বাইরেও এদের কথা লোকে অনেকদিন মনে রাখে। সাধারণ লোকের জন্য স্মৃতিফলক যথেষ্ট, তাই অনেকের জোটে না। আগে বংশের পূর্বপুরুষেরা উত্তরপুরুষের স্মৃতিতে কাহিনির আকারে কিছুদিন জীবিত থাকত। 'আমার ঠাকুরদার বাবা একবার খালি হাতে একটা বাঘ মেরেছিলেন', 'আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা দেড়শোটি বিয়ে করেছিলেন', 'ডাকাতের সর্দার থেকে জমিদার হয়েছিলেন আমার দাদুর দাদু', 'কিংবা আমার প্রপিতামহ দেশে এগারো নম্বর বিধবা বিবাহ করেছিলেন'— এই সমস্ত গল্প বংশানুক্রমে চলে আসে। স্মরণীয় নারীদের নিয়েও গল্প কিছু চলে। তাঁরা তো জহরব্রত থেকে শুরু করে অনেক কিছুই করে এসেছেন, যুদ্ধ করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রফুল্লর মতো বীরত্ব দেখিয়ে পরে স্বামীর পদসেবা করেছেন। এইসব স্মরণীয় পূর্বপুরুষ বা পূর্বনারীদের কোনও স্থায়ী কীর্তি নেই। যাঁরা স্কুল-কলেজ করে যান, পুকুর কাটানো, মন্দির-মসজিদ প্রতিষ্ঠা, নদীর ঘাট বাঁধানো ইত্যাদি ভালো ভালো কাজ করেন, তাঁদের কাজই কিছুদিন তাঁদের স্মরণীয়তার ভিত্তি হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক কীর্তিমান মানুষের এই ধরণের কোনও স্থায়ী কর্ম নাও থাকতে পারে, তবু তাঁরা লোকের স্মরণে থেকে যান।

তাঁদের কাজ তাঁদের জীবনেই সমাপ্ত, কিন্তু সে কাজের মধ্যে কোনও একরকমের অসামান্যতা আছে। আগেই বলেছি, সেকাজ ভালো হতে পারে, মন্দ হতে পারে, আবার এ কাজ ভালো-মন্দ দুয়ের মিশ্রণও হতে পারে। মানুষ সাধারণভাবে চমকপ্রদ বা spectacular-এর ভক্ত, ফলে চমকপ্রদ কাজকর্ম করা মানুষ তার চোখে এক ধরণের 'হিরো' হয়ে ওঠে। এই তালিকার মধ্যে চোর-জুয়াচোর-পকেটমাররা পড়ে, খুনি-ডাকাতরা পড়ে, বিপ্লবীরা পড়ে, আবার সাধক, দানবীর, ত্যাগীরাও পড়ে। কীর্তির্যস্য সঃ জীবতি কথাটা এই অর্থেই সত্য হয়ে ওঠে। সে কীর্তি যেমনই হোক।

মনে করুন বিলেতের রবিন হুড বা বাংলার বিশে ডাকাতের কথা। তাঁরা সমাজবহির্ভূত প্রাণী, তাদের কাজ আইন মেনে চলা, সাধারণ

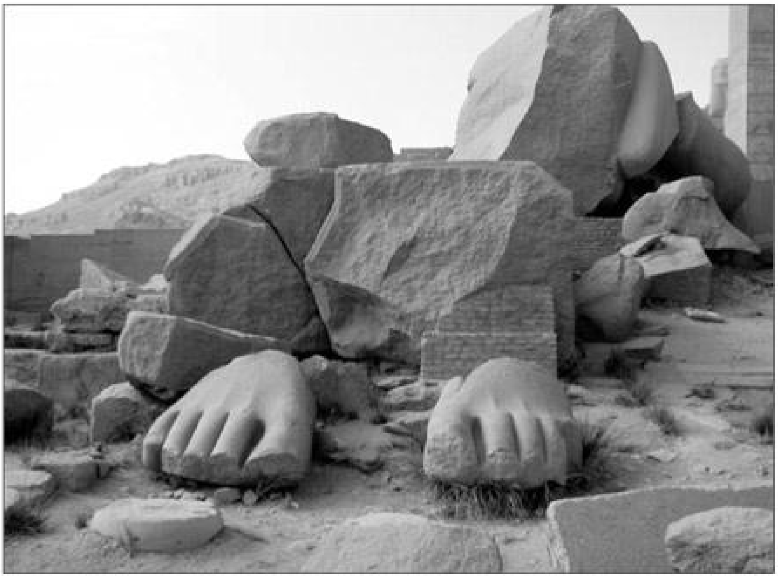

সঙ্গের ছবিতে ইজিপ্টের বালুকারাশিতে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে পড়ে থাকা দুটি পাথরের পা

সামাজিক মানুষের চোখে খুব প্রশংসনীয় নয়। প্রশাসক বা পুলিশের চোখে তো নয়ই। এ-দুজন তবু মন্দ কাজের সঙ্গে কিছু ভালো কাজও করেছেন বলে শোনা যায়। কিন্তু যাদের কাজের রেকর্ডে ভালো কাজ একটাও লিপিবদ্ধ করা যাবে কিনা সন্দেহ, তাদের কথাও মানুষ স্মরণে রাখে, লোককথায়, ব্যালাডে, ব্যালেতে, কবিতায়, গল্পে-উপন্যাসে, নাটকে, (পরে) চলচ্চিত্রে তাদের কথা বারবার বর্ণিত হয়। বীরদের কথা যেমন, জলদস্যু বা খুনিদের কথাও তেমনিভাবে। আমেরিকান কবি উইলিয়াম রোজ বেনেট কবিতায় স্তুতি করেছেন জেসি জেম্স নামে এক ডাকাতের, যে সবসময় দুটো পিস্তল নিয়ে ফিরত (two-gunned man), ঘুমন্ত শহরের মধ্য দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে বন্দুক ছুড়ে সবাইকে জাগিয়ে চ্যাঁচাত, I'm Jesse James! বলে, জঙ্গলের পথে নিরীহ লোকদের আটকে হিরের আংটি, সোনার ঘড়ি, ট্রেনে লাফিয়ে উঠে সরকারি ডাকের সোনা লুট করত, ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকার সিন্দুক তুলে নিয়ে যেত, আমেরিকার সৈন্যদল কিছুতেই তাকে ধরতে পারেনি। কবি বলছেন, সে বেঁচে আছে সূর্যাস্তের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। কবির তার সম্বন্ধে ভক্তির শেষ নেই।

এখন মুদ্রণ আর বৈদ্যুতিন মিডিয়ার অব্যাহত প্রতাপে এই ধরণের ইতিহাসের নথিরক্ষা খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে অমৃতলাল বসু দুঃখ করেছিলেন যে, 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়।' এখন আর সে দুঃখ ততটা জরুরি নেই, এখন ভিডিও, ফিল্ম সব ধরে রাখে নটনটীদের কীর্তিকলাপ, ফলে তাদের কাজের কিছু নমুনা অন্তত উত্তর-প্রজন্মের হাতে এসে পৌঁছয়।

অবশ্যই এমন একটা সময় ছিল যখন এসব কিছুই ছিল না। প্রথমে মানুষ ছবিতে বার্তা পাঠাল পরের মানুষকে, আমরা স্পেনের আলতামিরা গুহার ছবির কথা আগে বলেছি। তারপরে হয়তো এল মূর্তিকলা, তারপরে লেখা। তাতেই কি প্রার্থিত অমরত্ব আসে? শেলি তাঁর Ozymandias কবিতায় বলেছেন এক প্রাচীন দেশ দেখে আসা এক পথিকের মুখে শোনা একটি মূর্তির কথা, দূর অতীতের মহাপ্রতাপশালী কোনও ওজিমানডিয়াসের মূর্তি ছিল সেটি, কিন্তু বিস্তীর্ণ বালুকাপ্রান্তরের মধ্যে পাথরের মঞ্চের ওপরে তার দুটি বিশাল পা মাত্র দাঁড়িয়ে ছিল, কুঞ্চিত, অহংকারী ঠোঁটের মুখওয়ালা মাথাটা পড়েছিল বালুর মধ্যে, আর ভিতের সামনে লেখা ছিল, 'আমি ওজিমানডিয়াস, রাজার রাজা! হে শক্তিশালী, আমার কীর্তি দ্যাখো আর ভয়ে কুঁকড়ে যাও!' হায়, বালুর ওপর স্তম্ভে সেই দুটি দেহহীন পা, বালুর মধ্যে পড়ে থাকা সেই বিশাল মাথা ছাড়া আর কিছু নেই, চতুর্দিকে বালুর সমুদ্র। কবিতাটি পুরোটা উদ্ধৃত করতে লোভ হচ্ছে—

I met a traveller from an antique land
Who said: Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert...Near them, on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,
And wrinkled lip, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them, and the heart that fed;
And on the pedestal these words appear:
'My name is Ozymandias, king of kings;
Look on my works, ye Mighty, and despair!'
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away.

পাথরের মঞ্চের ওপরে তার দুটি বিশাল পা মাত্র দাঁড়িয়ে ছিল, কুঞ্চিত, অহংকারী ঠোঁটের মুখওয়ালা মাথাটা পড়েছিল বালুর মধ্যে, আর ভিতের সামনে লেখা ছিল, 'আমি ওজিমানডিয়াস, রাজার রাজা! হে শক্তিশালী, আমার কীর্তি দ্যাখো আর ভয়ে কুঁকড়ে যাও!'

আগেই বলেছি, এখন বৈদ্যুতিন নানা উপায়ে হয়তো মানুষের কীর্তিকে আমাদের দর্শন-শ্রবণের মধ্যে রাখতে পারে। কিন্তু এরও একটা সমস্যা ক্রমশ তৈরি হচ্ছে। সিডি, ভিডিয়ো সিডি, চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে মানুষের সৃষ্টির সঞ্চয় প্রতিদিন এত বেড়ে যাচ্ছে যে, সকলের সবকিছুতে ফিরে যাওয়ার সময় নেই। জানি না এখনকার দার্শনিকেরা এই তথ্য-বিস্ফোরণ ও জ্ঞান-বিস্ফোরণের বিষয়টা নিয়ে কতটা মাথা ঘামাচ্ছেন, কিন্তু আমি তুচ্ছ মানুষ তো, এনিয়ে একটু আতঙ্কিত থাকি। আমি জানি, বিশেষজ্ঞরা বিশেষ-বিশেষ জ্ঞান খুঁজবেন, কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য অবশ্যজ্ঞাতব্য অবশ্যদ্রষ্টব্য জ্ঞান ও তথ্যের পরিমাণই এত বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে যে, এরপর সাধারণ শিক্ষাই একটা গুরুতর দায় হয়ে দাঁড়াবে। কতটা জানব, আর কতটা জানব না, কতটা দেখব-শুনব আর কতটা দেখাশোনা বর্জন করব, তা নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

আশা করি, আমার এই আতঙ্ক অমূলক।

ক্রমশ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর স্বনির্বাচিত ৮

সন্ধিক্ষণের আঁকিবুকি

কে যেন বলেছিলেন, হাইডেগারই সম্ভবত, অপ্রকাশিত এবং প্রকাশিত সমান সমান থাকলে তবেই কবিতার মুক্তি? এখানে যে আটটি কবিতা অন্তর্গত হল তাদের মধ্যেও বোধহয় অধরার সেই সন্ধান আছে।

প্রথম দুটি কবিতা বুলেটিনের মতো দেখতে একটি শীর্ণ বইতে ('গোলাপ এখন রাজনৈতিক'/ ২০০৮) জায়গা করে নিয়েছিল। সময়টা ছিল শঙ্কিল, নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের থমথমে মুষলপর্বে: কাল মার্কসের স্বপ্নবীক্ষা কিউবার পরে নিরীক্ষাবিক্ষত হয়ে কলকাতায় মুখ থুবড়ে পড়ছে। বুদ্ধিজীবীরা পথে নেমেছেন, কবিতা হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক। এর পরের পর্বাঙ্গে আরববিশ্ব গণতন্ত্রে নতুন নোঙর খুঁজেও দিশাহারা। আর আমাদের এই ভূখণ্ডে তখন এক-একটি খণ্ডযুদ্ধ প্রলয়ের আকার না নিলেও মানুষজনের কাছে দলবাজির ব্যর্থতা নিজস্ব নগ্ন স্বরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়ে উঠছে। কী-আশ্চর্য, কোথাও আর রাজনৈতিক কবিতার লেশমাত্র নেই।

তার মানে এই নয় যে বাঙালি তার প্রতিবাদী সত্তা খুইয়ে বসেছে। বরং তার গহন তাৎপর্য এই যে সে বিশ্বের পটভূমিতে নিজেকে ঠাহর করে নিতে চাইছে হয়তো। আমার কথাই বলি, আমি এখন মধ্যপ্রাচ্যের মুক্তিআন্দোলনের দিকে উদ্‌গ্রীব তাকিয়ে আছি, মজে রয়েছি হাফিজ কিংবা রুমি-র বৈপ্লবিক মরমি গজলে। মনে হয় এই মর্জি থেকেই বেছে নিলাম সাম্প্রতিক কিছু কবিতা। প্রথম দুটি বেরিয়েছিল বাপী সমাদ্দার সম্পাদিত 'পূজা'য় (বইমেলা সংখ্যা ২০১৩), আর পরের চতুরঙ্গ ঠিক একই সময় প্রকাশিত হয় পার্থপ্রিয় বসুর 'চিত্রক' শীর্ষক বিজন, প্রচারভীরু কবিপত্রে।

অঘোষিত ইমার্জেন্সি

আজও জিতে গেছে ভারত, যদিও ধোনি
হরভজনকে কাজে লাগায়নি। দ্যাখো
কল-সেন্টারে চৌখস ইংরেজি
বলার দরুন কৃষ্ণচূড়ায় তেজি
মঞ্জরী এল, তাহলে তোমরা এখন
উৎসব করো, চাঁদ ও বিবস্বান,
ব্রিজের তলায় নিদ্রিত রিজওয়ান।

হায় রে অসভ্যতা

তুমি কি জানতে মেসোপটেমিয়া মানে
'নদীদের মাঝখানে'!

টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিসের ক্রোড়ে
যেখানে বরাতজোরে

গড়ে উঠেছিল সুমেরীয় সভ্যতা;
মাটিকে শোষণ ক'রে

আজ হয়ে আছে ধ্বংসের সাক্ষ্য তা।

আমরাও এক নদী অবলম্বনে
তুলসীতলার কোণে

ছিলাম কখনো, আর সেই গাঙ্গেয়
প্রশ্রয়ে গান গেয়ে

ধান কাটছিল কৃষাণ, সর্বনাশা
বিশ্বায়নের ঘোরে

তাকে খুইয়েছি নগর বানাতে গিয়ে,
এবং বাংলা ভাষা!

You're out! No, I'm not

মনে আছে আম্পায়ার
মার্ক বেনসন যেই
'caught behind the wicket'
বললেন সহজেই
তিলকরত্নে দিলশন
জানালেন তাঁর ব্যাট
বলটাকে একবারও
স্পর্শ করেনি, তাই
নট-আউট রয়ে গেছেন।

এভাবে এক-একবার
ইতিহাস গড়ে ওঠে,
তৃতীয় আম্পায়ার
তিলকরত্নেকেই
উইকেটে থাকবার
জানালেন নির্দেশ।

এভাবে এক-একবার
ইতিহাস নবায়নে
নির্মিত হতে চায়,
কিন্তু আমরা তার
টুঁটি চেপে ধরে, হায়,
তাকে মুছে ফেলি, তাই
এখনও দর্শকেরা
আমাকে প্রশ্ন করে
সেদিন কে জিতেছিল:
সিলোন, না ইন্ডিয়া?

মডেল

পড়োশির টালির ছাদে
বসে রয় শিল্পী যেন
সুচারু মিনিয়েচার—
নিদারুণ বাস-অ্যাক্সিডেন্ট,

বুটিদার পায়রা দুটো
এঁকে দেন মনঃপুত
কী ছিল তাঁর কপালে
রয়েছেন হাসপাতালে।

ফলত এলেন আরেক
ইতিহাসসিদ্ধ পুরুষ
লিখলেন এই পাখিদের
আহা রে ওদের মাথায়

গুণীজন তাঁর বদলে,
নাম তাঁর আল-বেরুনি,
বিবরণ, জুড়ে দিলেন:
কেন নেই লাল চিরুনি!

পড়োশির টালির ছাদে
বসে রয় অনঙ্কিত,
না পারে উড়তে ওরা
আলিসায় ঝরছে শিশির,

এখনও পায়রা দুটো
ওরা তাই জাতিচ্যুত,
না পারে বকম বকম,
স্টুডিয়োর সময় খতম।

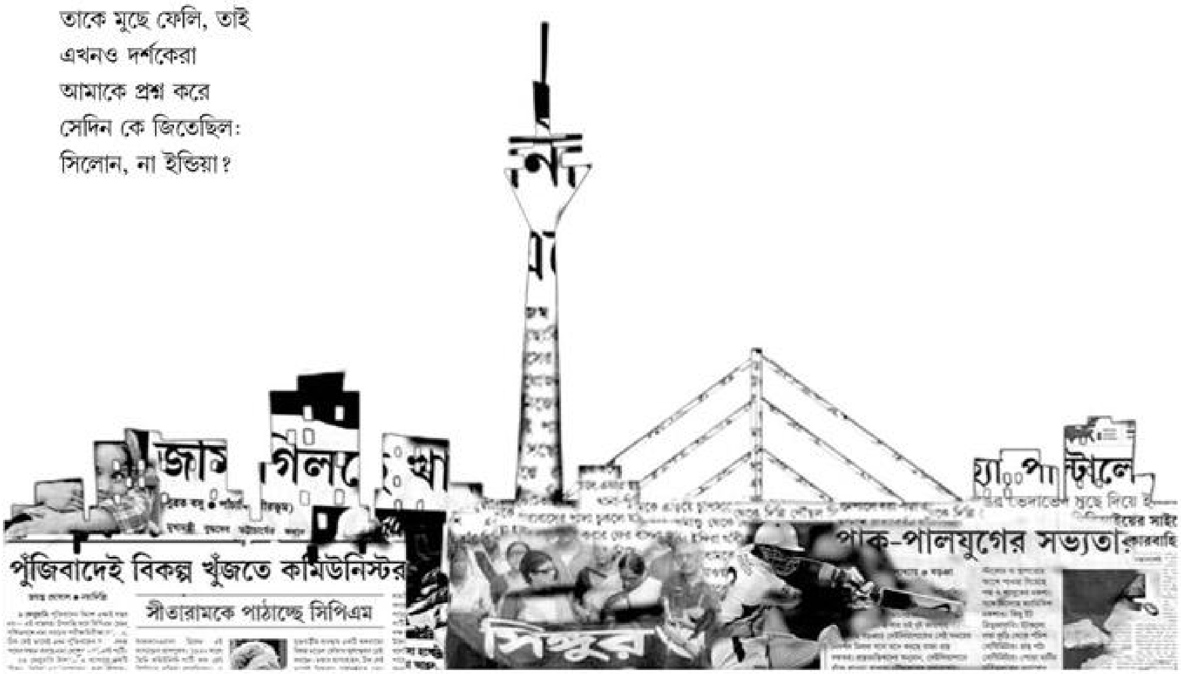

জুডাস একটি গাছের নাম

এক-একজন বিশ্বাসঘাতকের শোচনীয় শেষ দশার সরেজমিন সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেই জুডাসের মৃত্যুর জায়গাটা চোখে পড়ল : এর নাম 'রক্তাক্ত একর'। মরবেন বলেই কি এটুকু জমিন তাঁর অবৈধ সঞ্চয় থেকে সময়মতো তিনি খরিদ করে রেখেছিলেন?

অদূরেই একটি বিশীর্ণ তরু আমার নজরে এল : দেখতে-শুনতে অনেকটা সন্ধ্যামালতীর মতোই পেলব। শাখাপ্রশাখাগুলি তার এতই স্পর্শকাতর যে একটি চড়ুইপাখির ভরও সইতে পারে না, বেঁকেচুরে ভেঙে যায়। এই তবে জুডাস নামের সেই গাছ যার ডালে ঝুলে পড়ে সেই বিশ্বাসঘাতী আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল?

তার তাৎপর্য বুঝি এই যে জুডাস প্রতীকী আত্মহননের মুদ্রায় এমন একটি গাছ বেছে নিয়েছিল যেন শেষ পর্যন্ত না মরে যায়? তাহলে কি ধরে নিতে হবে যীশুকে ধরিয়ে দেওয়ার পরেও তার শোচনা পর্যাপ্ত হয়নি? অতোশত জানি না, তবে এটা অন্তত ঠাহর করে নিতে পারি ওই সংবেদনশীল গাছের ডালপালা নিজেদের নিভৃত তেজঃপুঞ্জ সংকলন করে জুডাসকে মৃত্যুর দিকেই *ঠেলে* দিয়েছিল।

সেই থেকে গাছেদের ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক বলে শ্রদ্ধা করি।

সোনালি মাঝখানটা দিয়ে

আলপথের ওপর দিয়ে মায়ের কাছে এক্ষুনি ফিরলাম।

ফেরার পথে মেরুন মেঘে
জ্বলতেছিল একখানি মোম
সুসংযত তারই আলোয়
পার হচ্ছিলাম যোজন যোজন।

বাবার চলে যাবার পরে আমার আসা এবার এই প্রথম।

মা-র হাতে আর নোয়াটা নেই
চোখে পড়তেই মশাল জ্বালি
মশকরার, মাকে বললাম:
'তুমিই আমার নোয়াখালি।'

মায়ের খিন্ন শরীরটাকে
বুকে জড়িয়ে খেয়ায় তুলি,
সমবেদনায় ডুকরে ওঠে
ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলি।

তখন আমার চোখের ওপর
আগের মোমের সলতে দুটি
জ্বলতে থাকি, পার হয়ে যাই
সোনালি মাঝখানটা দিয়ে।

আমায় তখন বৌদ্ধ ভেবে
মঠে তুলল ব্রহ্মচারী,
মাকে নিল না, যেহেতু তিনি
নিতান্তই একটি নারী!

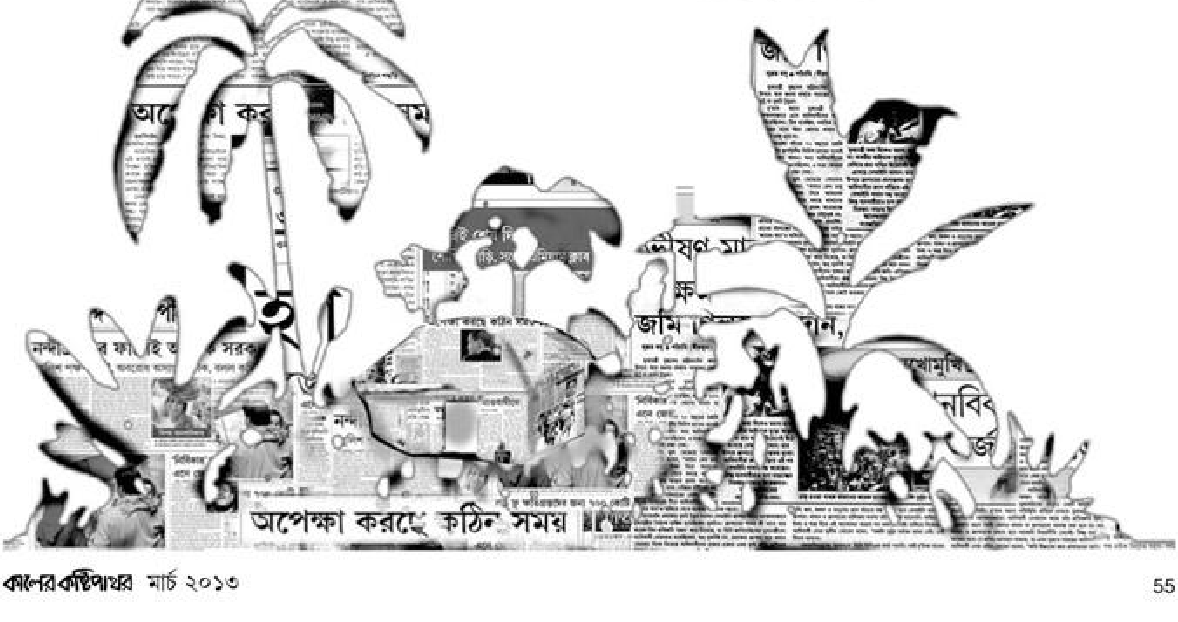

না-ছুঁয়ে বলা

থাকে শুধুই
আকাশি দূর—
যে-নারী তার
শাঁখাসিঁদুর
নবোঢ়া নাম
ঘুচিয়ে দিয়ে
ছুঁল আমার
কাঁধ, কনুই,
কী করে তাকে
আমিও ছুঁই!

তাকে না ছুঁয়ে
বলেছিলাম:
থাকে শুধু এ
হৃদয় জুড়ে
আকাশি দূর
বোরোবুদুর
যেখানে কিনা
একের পরে
আরেকজন
বুদ্ধ এসে
কী-ভালোবেসে
ওষ্ঠাধরে
জ্যোৎস্না জ্বেলে
শূন্যতার
আরতি করে

তার উত্তরে
সে বলেছিল:
এসব কথা
আমি মানি না।

নতুন খবরের অপেক্ষায়

মোহিত চলে গেছে। আনন্দের
শরীর ভেঙে গেছে একেবারেই।
অরিন্দম, শোনো, আমার হাতে
এছাড়া আর কোনো খবর নেই।

এছাড়া আর কোনো খবর নেই?
কে বলে এরকম মিথ্যে কথা!
আজ তো সকালেই পড়ছিলাম
রুদ্ধনিশ্বাসে 'গণদেবতা'।

এছাড়া আর কোনো খবর নেই?
সে কথা সাতিশয় গর্হনীয়—
কেননা আজ ভোরে আমার প্রিয়
বন্ধু আর কবি শঙ্খ ঘোষ

কুলু-মানালি থেকে কলকাতায়
আবার ফিরেছেন, আজই দুপুরে
দুজনে দেখা হলে কলেজ স্ট্রীটে
তখুনি শুরু হবে অতর্কিতে

বিশ্বকবিতার সংকলন।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা

ঘরে বসেই উপভোগ করুন
দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ।
ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব
আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক
পেঙ্গুইন-অ্যালবাট্রসের ভিড়ে,
বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের
পাঁচ পাহাড়ে
₹১০০

আফ্রিকার জঙ্গলে

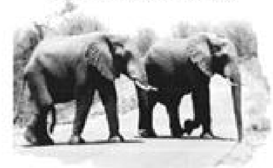

আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে
বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার
আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা

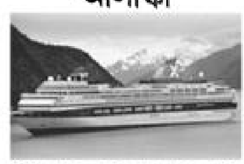

ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়,
হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি

চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড।
ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন।
ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া।
ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া।
মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া।
চেক রিপাবলিক। নেপাল।
নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়

জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়।
হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া।
অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ।
কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

কবিতা-পরিচয়

'আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়': সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অশ্রুকুমার সিকদার

যে পান্থনিবাসে যাই দ্বার বন্ধ, বলে, 'ঐ যে রুগ্ন ফুলগুলি
বাগানে রয়েছে শুধু, এখন বসবেন?' কেউ মুমূর্ষু অঙ্গুলি
আপন উরসে রেখে হেসে ওঠে, পাতা ঝরানোর হাসি, 'এই অবেলায়
কেন এসেছেন আপনি, কি আছে এখন? গত বসন্তমেলায়
সব ফুরিয়েছে, আর আলো নেই, দেখুন না তার ছিঁড়ে গেছে,
সব ঘরে
ধুলো, তালা খুলবে না এ জন্মে; পরিচারিকার হাতে কুষ্ঠ!'
ভগ্ন কণ্ঠস্বরে
নেবানো চুল্লীর জন্য কারো খেদ, কেউ কেউ আসবাববিহীন
বুকের শীতের মধ্যে শুয়ে আছে, মৃত্যু বহু দূর জেনে, চৈত্রে রুক্ষদিন
চিবুক ত্রিভাঁজ করে, প্রতিটি সরাইখানা উচ্ছিষ্ট পাঁজরা ও রক্তে
ক্লিন্ন হয়ে আছে
বাগানের কুসুমগুলি মৃত, গন্ধহীন, ওরা বাতাসে প্রেতের মতো নাচে।
আমার আগের যাত্রী রূপচোর, তাতার দস্যুর মতো বেপরোয়া,
কব্জি শক্তিধর
অমোঘ মৃত্যুর চেয়ে কিছু ছোট, জীবনের প্রশাখার মতো ভয়ংকর
সেই গুপ্তচর পান্থ আগে এসে ছেঁচে নিলো শেষ রূপ রস—
ক্ষণিক সরাইগুলি, হায়! এখন গ্রীবায় ছিন্ন ইতিহাস, ওষ্ঠে,
চোখে, মসীলিপ্ত পুঁথির বয়স,
আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়, জুতোয় পেরেক ছিল,
পথে বড় কষ্ট, তবু ছুটে
এসেও পারি না ধরতে, ততক্ষণে লুট শেষ, দাঁড়িয়ে রয়েছে সব
ম্লান ওষ্ঠপুটে।

'যে পান্থনিবাসে যাই দ্বার বন্ধ'— পান্থনিবাস পড়ামাত্রই পুরনো অভ্যাসবশে রূপক হাতড়াতে ইচ্ছা যায়; কেননা পান্থশালা শুনেছি আমরা জীবনের রূপক, যেখানে ক্ষণকালের জন্য আমরা আসি এবং চিরকালের জন্য যাকে ছেড়ে যাই। কিন্তু এখানে পান্থনিবাস জীবনের রূপক নয়, রূপক বটে, তবে কীসের রূপক সেকথা অনুমান করার জন্য অপেক্ষা করা যাক। ইত্যবসরে শুধু লক্ষ করি, এখানে পান্থনিবাস একটি নয়, বহু— 'যে পান্থনিবাসে যাই' অর্থাৎ যে-যে পান্থনিবাসে যাই। লক্ষণীয় নবম চরণের 'প্রতিটি সরাইখানা' এবং চতুর্দশ চরণের 'ক্ষণিক সরাইগুলি' বাক্যাংশে ক্ষণস্থায়ী জীবনের রূপক 'ক্ষণিক সরাই' মনে হতে পারে, কিন্তু জীবন যেহেতু জীবনগুলি নয়, সে-কারণে এই পান্থনিবাসগুলি জীবনের রূপক নয়।

কে 'বলে'? 'কেউ মুমূর্ষু অঙ্গুলি/ আপন উরসে রেখে হেসে ওঠে'— এই 'কেউ' কে? ভগ্ন কণ্ঠস্বর নেবানো চুল্লির জন্য যার খেদ সে-ই বা কে? স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। পরে তার পরিচয় পাব; আপাতত কবির প্রধান অভিপ্রায় এক পাংশু পাণ্ডুর নীরক্ত ক্ষয়ের ছবি ফুটিয়ে তোলা। এই পান্থনিবাসের দ্বার বন্ধ, বাগানে ফুলগুলি রুগ্ন, আঙ্গুল মুমূর্ষু, 'হেসে ওঠে, পাতা-ঝরানোর হাসি'। যে এসেছে সে 'অবেলায়' এসেছে। 'আলো নেই', 'তার ছিঁড়ে গেছে,/ সব ঘরে ধুলো,/ তালা খুলবে না এ জন্মে; পরিচারিকার হাতে কুষ্ঠ!' কণ্ঠস্বর ভগ্ন, চুল্লি, নেবানো— অবলুপ্ত অতীত নিয়ে কারও খেদ। আসবাবহীন শূন্য ঘর বড় ঠান্ডা হয়, পরিত্যক্ত এইসব সরাইখানায় আসবাব নেই। 'কেউ কেউ আসবাববিহীন/বুকের শীতের মধ্যে শুয়ে আছে,— বুকের খাঁচা আসবাববিহীন অর্থাৎ তাতে হৃৎপিণ্ড তথা হৃদয় নেই, রক্তচলাচল তথা অনুভূতি নেই, উত্তাপ নেই বলে শীতল। এখানেও যেন মৃত্যু (Death) এবং জীবন-মৃত্যুর (Life-in Death) মধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় শেষোক্ত জয়ী হয়েছে; সেই জীবন-মৃত্যু রমণীর ত্বকের রং ছিল কুষ্ঠরোগীর মতো সাদা, আলোচ্য কবিতার জীবন্মৃত পরিবেশে 'পরিচারিকার হাতে কুষ্ঠ'। 'মৃত্যু বহু দূরে'— মৃত্যুর নিস্তার এই জীবন্মৃত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে না— শীতে জীবন্মৃত, 'চৈত্রে রুক্ষ দিন'-এ ও জীবন্মৃত। 'চৈত্রে রুক্ষ দিন চিবুক ত্রিভাঁজ করে'— কী অর্থে তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়— 'কিছু লাইনের কোনোই মানে থাকে না': এটি কি সেই জাতীয় লাইন? নাকি চৈত্রের রুক্ষ দিনে দীর্ণ হয়ে যায়, তাই কবির চোখে চিবুকের ত্রিভাঁজ হওয়া? সরাইখানাগুলি যে পরিত্যক্ত, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মলিন, সেই কথাই উচ্ছিষ্ট পাঁজরা ও রক্তের ক্লিন্নতার মধ্য দিয়ে আবার এসেছে। প্রথম স্তবকের প্রথম চরণে ফুলগুলি ছিল রুগ্ন, ওই স্তবকের শেষ চরণে সেই 'কুসুমগুলি মৃত, গন্ধহীন', ওরা 'বাতাসে প্রেতের মতো নাচে', অথচ মাঝখানে বলেছেন 'মৃত্যু বহু দূরে'। মৃত্যু বহু দূরে হওয়া সত্ত্বেও রুগ্ন ফুলগুলি কেন মৃত কুসুম হয়ে গেল, প্রশ্ন জাগে। এই ক্ষয়গ্রস্ত জীবন, এই জীবন্মৃত অবস্থা, একি মৃত্যুর নামান্তর বলেই 'মৃত্যু বহু দূরে' হওয়া সত্ত্বেও কবি শেষপর্যন্ত রুগ্ন ফুলগুলি যে বস্তুত মৃত সেই কথা জানিয়ে দিলেন? মরা পাপড়িতে গন্ধ থাকে, কিন্তু এই পাংশু ক্ষয়গ্রস্ত কুসুমে গন্ধেরও সম্বল নেই, সেই মৃত কুসুম সুবাসহীন। মৃত কুসুমগুলিই বাতাসে প্রেতের মতো নাচে, না, পাতা-ঝরা, মৃত ফুল-ঝরা ডালগুলি প্রেতের মতো নাচে? এই প্রেতনৃত্যে নশ্বরতার এবং শূন্যতার হাহাকার যেন মিশে আছে।

'গত বসন্তমেলায় সব ফুরিয়েছে': স্বভাবতই অনুমান হয় আগে সবকিছু ছিল, ফুল সুহাস ছিল, ডালে পাতা এবং পান্থশালায় আলো এবং জ্বলন্ত চুল্লি ছিল। এখন নেই, কেননা 'আমার আগের যাত্রী রূপচোর', তারই লুণ্ঠতরাজে এই ম্রিয়মাণ অবস্থা। 'চোর' এবং পরবর্তী 'গুপ্তচর' শব্দের মধ্যে সন্তর্পণে গোপনে আসার ইশারা আছে, কিন্তু সে ইঙ্গিতকে অগ্রাহ্য করে 'তাতার দস্যুর মতো বেপরোয়া' আগের দুর্নিবার যাত্রী। প্রথম স্তবকে যে-পুষ্প রূপের রূপক— সেই পুষ্পগুলি সেখানে রুগ্ন বা মৃত, কারণ ইতিপূর্বে 'রূপচোর', চোরের মতো নয়, দস্যুর মতো সেই রূপ হরণ করে নিয়ে গিয়েছে। এই রূপচোর তাতার দস্যুর মতো— তাতার

দস্যুরা, আমাদের শোনা আছে, বন্যার জলের মতো সমৃদ্ধ জনপদে আবির্ভূত হয়ে লুটতরাজ করত এবং নিয়ে যেত বীর্যশুল্কা রূপসি মেয়েদের। 'অমোঘ মৃত্যুর চেয়ে কিছু ছোট',— মৃত্যু যতটা অমোঘ ততটা অমোঘ নয় রূপের হন্তারক, কিন্তু প্রায় ততটাই অমোঘ। 'অমোঘ মৃত্যুর চেয়ে কিছু ছোট', এই বাক্যের সঙ্গে তুলনীয় প্রথম স্তবকের 'মৃত্যু বহু দূরে'। এই 'রূপচোর' মৃত্যু নয়, মৃত্যুর প্রতিবেশী। রূপচোর যখন প্রায় মৃত্যুর মতো অমোঘ তখন তার মধ্যে এক বলীয়ান লুটেরার দৃপ্তভাব আছে এবং সে 'জীবনের প্রশাখার মতো ভয়ংকর'। এখানে একটি চমৎকার প্রতিতুলনা আছে,— 'মৃত্যুর চেয়ে কিছু ছোট' এবং সঙ্গে সঙ্গে 'জীবনের প্রশাখার মতো ভয়ংকর'। সেই পূর্বগামী 'গুপ্তচর পান্থ'— যেমন শাখাপ্রশাখা আলো-বাতাস থেকে প্রাণরস শোষণ করে বা শাখামূল মৃত্তিকা থেকে, তেমন সে ছেঁচে নিলো সব রূপ রস'। 'ছেঁচে নিলো' বললে পেষণ করে রস বের করা বোঝায়, কবির অভিপ্রেত সম্ভবত সেঁচে নিল শুষে নিল এই দুই অর্থান্তরের আভাসও। পরের চরণে আমরা জেনে গেলাম পান্থশালা— সরাইখানা এই কবিতায় কীসের রূপক। 'সেই গুপ্তচর পান্থ আগে এসে ছেঁচে নিলো শেষ রূপ রস/ক্ষণিক সরাইগুলি, হায়'! রূপ-রস— এই সবই ক্ষণিক নশ্বর পান্থশালা।

২

একবার মনে হচ্ছিল আমার, এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নবীন কবির সম্পর্কের কথা। এই কবিই তো অভিমান করে বলেছেন: রবীন্দ্রনাথ নিজে থেকে আমাদের হাত ছেড়ে চলে গেলেন;— এটি সেই অভিমানের কবিতা। কবি বিলম্বে এসেছেন, 'যে পান্থনিবাসে যাই দ্বার বন্ধ'— এখানে আমি রবীন্দ্রনাথের একটি লাইনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম, 'বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার' ('দুঃসময়', চিত্রা)। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কত কুসুমের সমাবেশ, তাঁর কবিতায় ও সাহিত্যসম্বন্ধীয় আলোচনায় কতবার রূপ-রসের কথা পাই। তাঁর অর্থে শেষ রূপ-রসের কবিতা তিনিই লিখে গেছেন— ছেঁচে নিয়েছেন 'শেষ রূপ রস'। মনে হচ্ছিল আমার, রবীন্দ্রনাথই সেই রূপচোর, সার্বভৌম প্রতিভার অধিকারী বলেই তিনি 'তাতার দস্যুর মতো বেপরোয়া' এবং তাঁর 'কব্জি শক্তিধর'। তিনি পূর্বসূরি: 'আগে এসে' জীবনের প্রশাখার মতো শোষণশক্তিতে পৃথিবীর শেষ রূপ-রস ছেঁচে নিয়ে নিজের রচনাবলিতে সঞ্চারিত করেছেন। তারপর এল 'অবেলা', যে-অবেলার

রবীন্দ্রনাথ জীবনের সৌন্দর্যগুলি অপহরণ করে নিয়ে গেছেন এবং করে নিজের রচনাবলি মনোহারী করে সাজিয়েছেন। অবেলা-প্রকোপে সেই সৌন্দর্য আর অবশিষ্ট নেই; রূপ-রস নামক ক্ষণিক সরাইগুলি এখন মুমূর্ষায় আক্রান্ত, ধুলো-কুষ্ঠ-অনালোকে মলিন, কুসুম মৃত এবং গন্ধহীন।

বর্ণনা সুনীল অন্য কবিতায় দিয়েছেন—

অতিরিক্ত অবিশ্বাস মানুষের পাশাপাশি হাঁটে
মানুষ না প্রতিবিম্ব? অবিশ্বাস না মায়ার শোক?
আমার নিঃসঙ্গ জাগা অবেলায় অস্থির ললাটে
গম্ভীর ধ্বনির মধ্যে ভেসে রয়, মানুষ ও মেয়েদের
পাশাপাশি হাঁটে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের সৌন্দর্যগুলি অপহরণ করে নিয়ে গেছেন এবং করে নিজের রচনাবলি মনোহারী করে সাজিয়েছেন। অবেলা-প্রকোপে সেই সৌন্দর্য আর অবশিষ্ট নেই; রূপ-রস নামক ক্ষণিক সরাইগুলি এখন মুমূর্ষায় আক্রান্ত, ধুলো-কুষ্ঠ-অনালোকে মলিন, কুসুম মৃত এবং গন্ধহীন। এই কবি বিলম্বে এসেছেন, অবেলার জটিলতা তাকে সাবলীল এগোতে দেয় না, 'জুতোয় পেরেক ছিল, পথে বড় কষ্ট'; 'ততক্ষণে লুট শেষ', ওষ্ঠপুট ম্লান; এখন রূপ-রস নিয়ে কবিতা লেখার উপায় নেই, কেননা সেই সরাইখানাগুলি 'উচ্ছিষ্ট পাঁজরা ও রক্তে ক্লিন্ন হয়ে আছে'। তাই বোধহয় তিক্তবিরক্ত হয়ে সুনীল অন্য কবিতায় লিখেছেন, 'তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্ররচনাবলী লুটোয় পাপোশে'।

এই কবিতার অভিপ্রায় এ-কথা বলতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু কয়েকটি শব্দে বাধা পাই, বিশেষ করে কবিতাটির নামকরণে। যদি সুনীল বলতেন, 'আমার খানিকটা দেরি হয়ে গেছে',— তাহলে উক্ত অর্থ ধরে নিতে বেশি বিঘ্ন হত না। কিন্তু কবি বলছেন, 'আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়'। তাহলে সব ক্ষেত্রে দেরি হয়ে যায়— এইটিই বক্তব্য, শুধু রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথের তুলনায় দেরি হয়ে গিয়েছে; এইকথা অভিপ্রেত নয়? তিনি এক অসংশোধনীয় লেট-লতিফ এবং তাঁর মতো আমরা সকলেই অসংবরণীয় লেট-লতিফ। এ কি তবে বিরহের হাহাকারে-ভরা প্রেমের কবিতা? নারীদেহের সৌন্দর্যসূচক প্রত্যঙ্গ-কয়েকের কথা পাঠককে এইদিকে এগোতে ইশারা করে— অঙ্গুলি, উরস, চিবুক, গ্রীবা, ওষ্ঠ, চোখ এবং সব অঙ্গকে রম্যতায় আলোকিত করে যে সেই হাসি। যৌবনে রমণীর অঙ্গে-অঙ্গে যে-রূপ এবং অন্তরে যে-রসের সঞ্চার— তাই পান্থশালা এবং যৌবনের রূপ-রস যেহেতু ক্ষণস্থায়ী তাই পান্থনিবাসগুলি ক্ষণিক সরাইখানা। 'যে পান্থনিবাসে যাই দ্বার বন্ধ'— যৌবনের রূপ-রস নেই, অবসিত যৌবনারা তাই প্রণয়ীর আত্মনিবেদন গ্রহণে অক্ষম। বাক্যটির মধ্যে যৌনচিত্রকল্পও যেন উঁকি দেয়। কে 'দেয়', কে 'হাসে' এখন তার পরিচয় জানি। সেই ব্যর্থযৌবনারা বলে অতীতে যৌবননিকুঞ্জবনে এখন শুধু রুগ্ন ফুল। 'কেউ মুমূর্ষু অঙ্গুলি/আপন উরসে রেখে হেসে ওঠে, পাতা ঝরানোর হাসি...'— আঙুল মুমূর্ষু লাবণ্যহীন, উরসও হয়তো শিথিল, হাসিতে ঝরা-পাতা শীতের ম্লানতা। প্রশ্নের ভঙ্গির মধ্যেও নায়িকার ব্যর্থতার হাহাকার রয়েছে 'এই অবেলায়/কেন এসেছেন আপনি, কি আছে এখন?' 'গত বসন্তমেলায় সব ফুরিয়েছে', এখন নায়িকারা নিঃস্ব, আলো নেই; সুর নেই কেননা তার ছিঁড়ে গিয়েছে। যৌবনের তাপ, রূপের ঐশ্বর্য নিবে গিয়েছে বলে 'নেবানো চুল্লীর জন্য কারো খেদ'। খেদের কণ্ঠস্বর ভাঙা, কারণ তার মধ্যে সব-হারানো অশ্রুজড়ানো শূন্যতার হাহাধ্বনি মিশে আছে। 'আসবাব-বিহীন/বুকের শীতের মধ্যে শুয়ে আছে'— অবসিত-যৌবনের শীত, 'মৃত্যু বহু দূরে জেনে'ও যৌবন চলে গিয়েছে সুতরাং মৃত্যু অবশ্যই আসছে— সেই নশ্বরতার শীত, প্রণয়ীর আলিঙ্গন নেই বলে শীত, আসবাববিহীন ঘর যেমন শীতল তেমনি এইসব রমণীরা বক্ষপিঞ্জরে আজ হৃৎপিণ্ড বা হৃদয় নেই বলে শীতার্ত। 'চিবুক ত্রিভাঁজ' কেন?— এই রমণীরা কি যৌবনের তনুতা হারিয়েছে? সচ্ছল মেদের প্রকোপে এখন কি তাদের চিবুকে তিন-তিনটে ভাঁজ? শীর্ষ মুমূর্ষু আঙুলের সঙ্গে চিবুকের ত্রিভাঁজ মানায় না। 'প্রতিটি সরাইখানা উচ্ছিষ্ট পাঁজরা ও রক্তে ক্লিন্ন হয়ে আছে'— রূপ-রসের ক্ষণিক সরাইগুলিতে যৌবনে ক্ষণকালের জন্য যারা আশ্রয় নিয়েছিল, পর-উপভুক্ত হয়ে এখন তারা 'উচ্ছিষ্ট'। যৌবন-উপবনের 'কুসুমগুলি

মৃত, গন্ধহীন' যৌবনবেদনারসে মন্থর দিনগুলির যেহেতু অবসান হয়েছে। তর্পণ বিনা প্রেত যেমন অতৃপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি যৌবন গিয়েছে বটে, কিন্তু একদিন যৌবন ছিল সেই স্মৃতি থেকে তাদের নিস্তার নেই— সেই ব্যর্থ যৌবনের স্মৃতির মৃত কুসুম 'বাতাসে প্রেতের মতো নাচে'।

কিন্তু তাহলে রূপচোর আগের যাত্রীটি কে? সে কি যৌবনে সঠিক সময়ে আসা পূর্বপ্রণয়ীর দল— যারা এই রূপসিদের রূপ-রস 'ছেঁচে নিলো' 'তাতার দস্যুর মতো'? এ অর্থ সংগত নয়, কারণ আগের যাত্রী সম্বন্ধে কোথাও বহুবচনের ব্যবহার নেই। সংগত নয়, কারণ সে-ক্ষেত্রে রমণীদের যৌবন তো ব্যর্থ হয়নি, নিজ বপুকে তাহলে ব্যর্থ ভাবার কোনও কারণ ঘটে না। বিগতযৌবনারা তাহলে অন্তত পূর্বমিলনের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এই লুটেরা তাই পূর্বপ্রণয়ীর দল নয়, তাহলে 'খেদ' থাকত না। সময়ই সেই রূপচোর পূর্বপ্রণয়ী— সময় সর্বদাই 'আগের যাত্রী', তার সঙ্গে দৌড়প্রতিযোগিতায় কেউ আমরা পেরে উঠি না। সময়ের অত্যাচারেই তারা 'উচ্ছিষ্ট', অঙ্গুলি মুমূর্ষু, বিশুষ্ক উরস, তার ছিঁড়ে গিয়েছে, হৃদয়ের নেবানো চুল্লির জন্য কারও খেদ— 'এই অবেলায়/কেন এসেছেন আপনি, কি আছে এখন?' এই মেয়েদের প্রণয়ীর প্রতীক্ষায় সময় কেটেছে, আর সময় 'তাতার দস্যুর মতো বেপরোয়া' 'আগে এসে ছেঁচে নিলো সব রূপ রস—/ক্ষণিক সরাইগুলি, হায়!' প্রণয়ীর সব সময় দেরি হয়ে যায়, সময়ের সঙ্গে সে পেরে ওঠে না, তাই চিরকাল 'আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়'। বিলম্বে এসে দেখে 'যে পান্থনিবাসে যাই দ্বার বন্ধ' এবং রূপ-রসের ক্ষণিক সরাইগুলিতে যারা একদিন ছিল তাদের 'এখন গ্রীবায় ছিন্ন ইতিহাস, ওষ্ঠে, চোখে, মসীলিপ্ত পুঁথির বয়স' ঢাকার জন্য মসি দিয়ে লেপন করা, অথবা অবসিতযৌবনার বয়সটাই কলঙ্ক। 'জুতোয় পেরেক ছিল'— সময়ের কাছে নশ্বর প্রণয়ীকে হারতে হয়, তাই তার জুতোয় চিরকাল পেরেক থাকে, প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দেয়। ছুটে এসে দেখে 'ততক্ষণে লুট শেষ', সময়ের ধর্ষণে বিধ্বস্ত রমণীরা সারে-সারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সব ম্লান ওষ্ঠপুটে'। সময় চলে যায় বলে প্রণয়িনীদের দীর্ঘশ্বাস, সময়ের সঙ্গে পেরে ওঠে না বলে প্রণয়ীর দীর্ঘশ্বাস; প্রথম স্তবকে প্রণয়িনীদের দীর্ঘশ্বাস, দ্বিতীয় স্তবকে প্রণয়ীর দীর্ঘশ্বাস— এই নিয়ে এই কবিতা।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়, পঞ্চম-ষষ্ঠ যুক্তসংকলন
(মাস-সাল অনুল্লিখিত)

অমিতাভ দাশগুপ্ত

শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়' কবিতাটির ওপর শ্রী অশ্রুকুমার সিকদারের আলোচনা আমার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছে। সেগুলি আমি পর-পর সাজিয়ে দিচ্ছি।

১। অশ্রুবাবু কবিতাটির বক্তব্য সম্পর্কে তাঁর আলোচনার শেষে যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমার ভয় হয়, তাতে অতি সরলীকরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 'প্রথম স্তবকে প্রণয়িনীদের দীর্ঘশ্বাস, দ্বিতীয় স্তবকে প্রণয়ীর দীর্ঘশ্বাস— এই নিয়ে এই কবিতা'— এত সংক্ষিপ্ত ও তৃপ্ত মন্তব্য নিয়ে এখানে আমরা খুশি থাকতে পারব কি? যাকে অশ্রুবাবু এখানে প্রণয়ী মনে করেন, মুমূর্ষু রমণীরা কি কোনও অর্থে তার প্রণয়িনী? তা ছাড়া বর্ণিত রমণীরা অন্তত গত বসন্তেও বেপরোয়া ভোগ ও তজ্জনিত, সাময়িক হলেও, তৃপ্তি পেয়েছিল। ফলে তারা 'পাতা ঝরানোর হাসি' হাসলেও, সে হাসিতে অন্তত কোনওকালে কিছু না পাওয়ার ক্ষোভ নেই। সে-ক্ষেত্রে একটি মাত্র বাক্যে বা এক নিশ্বাসে দেরিতে-পৌঁছনো মানুষটির দুঃখের সঙ্গে তাদের অন্তিম কারুণ্যকে মিশিয়ে ফেললে কবিতাটির অভিপ্রেত অর্থ বুঝে নিতে আমার কষ্ট হয়।

২। উক্ত রমণীদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে অশ্রুবাবু বলেছেন: 'সময়ের ধর্ষণে বিধ্বস্ত রমণীরা'। তাহলে রূপচোর পূর্বপ্রণয়ীরা কি সময়েরই এককালীন চেহারা? বিগতযৌবনাদের কাছে নিঃসন্দেহে অতীত ও বর্তমান যথাক্রমে সুখ-ও দুঃখ-সমন্বিত, কিন্তু তাদের রক্তমাংসের প্রণয়ীদের চেহারাকে অনর্থক অ্যাবস্ট্র্যাকশানে নিয়ে এলে কবিতাটির বেদনা তার তীব্রতা ও সজীবতা হারায় বলে আমার ধারণা। দস্তুর সময় সম্পর্কে ভাবিত সমালোচক 'সময়ের কাছে নশ্বরী প্রণয়ী' এই উক্তিটিকে 'সময়ের সঙ্গে এঁটে-না-ওঠা প্রণয়ী'— এভাবে সাজালে কবিতাটির অভিপ্রায় আরও স্পষ্ট হয় কিনা, এটি তাঁর কাছেই আমার বিনীত জিজ্ঞাসা। অবশ্য আমি কোনও অবস্থাতেই প্রাক্তন প্রণয়ী ও বর্তমান দেরি-করে-ফেলা মানুষটির স্থানে অস্থির, বহতা সময়কে বসাতে চাচ্ছি না।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার', অধুনা শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমার হয়েছে দেরি, ফলে তুমি করেছো ফাইন', এবং এখানে কবির উক্তি, 'যে পান্থনিবাসে যাই দ্বার বন্ধ'। এই পংক্তিগুলির তুল্য ও একই চরিত্রের আরও অনেক পংক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও নিজের সিদ্ধান্তে শেষপর্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকতে না পেরে অশ্রুবাবু এটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অভিমানবশত রচিত কবিতা না বলে বলেছেন 'এ কি তবে বিরহের হাহাকারে-ভরা প্রেমের কবিতা'— তবুও কবিতাটির অভিপ্রায় নির্ণয়ে নিছক একটি পংক্তিপাঠে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক কবির সম্পর্কের চরিত্র নির্ধারণ করার মতো উপাদান তিনি এখানে কী করে পেলেন, জানি না। অস্বস্তি বেড়ে যায়, যখন দেখি এই সম্পর্কের সূত্র খুঁজতে তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একেবারে স্বতন্ত্র মেজাজের উক্তি এই কবিতার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত অন্যত্র থেকে খুঁজে নিয়ে আসছেন। 'বিরহের হাহাকারে-ভরা প্রেমের কবিতা' সরাসরি বলতেও তো কোনও দ্বিধার কারণ এ-কবিতায় উপস্থিত নেই।

৪। অশ্রুবাবু 'অমোঘ মৃত্যুর চেয়ে কিছু ছোট'— এই বাক্যের সঙ্গে প্রথম স্তবকের 'মৃত্যু বহু দূরে' বাক্যটির তুলনা করেছেন। প্রথম বাক্যটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন, 'মৃত্যু যতটা অমোঘ ততটা অমোঘ নয় রূপের হন্তারক, কিন্তু প্রায় ততটাই অমোঘ।' কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি কি প্রথম বাক্যটির সমার্থ বহন করে? যৌবন গিয়েছে যৌবনবেদনা যায়নি, শুধু গ্লানি ও ক্রমবর্ধমান বয়সের জড়ত্ব নিয়ে কবে মৃত্যু আসবে তারই অসহ অপেক্ষা করা। অর্থাৎ এককথায়, যম কেন ভুলেও নেয় না, এই দুঃখে অনর্থক অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা— এই কি দ্বিতীয় বাক্যের মর্ম নয়?

আর একটা কথা। 'আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়, জুতোয় পেরেক ছিল'; জুতোর পেরেক পায়ে ফুটলে দীর্ঘপথ ছোটা তো দূরের কথা, হাঁটতেও কী দারুণ কষ্ট হয়, আমরা জানি। 'জুতোয় পেরেক ছিল' বাক্যটি এখানে যুগপৎ বেদনা ও ডেসপারেশানকে ব্যঞ্জনা দিয়েছে। কিন্তু এই ধরণের সফলতার পরেও 'পথে বড় কষ্ট' লিখতে হল কেন? সাহিত্যের যে-কোনও ফর্মে অতিকথন দোষের, এমন একটি ছিলে-টান সংহত কবিতাতে তো বটেই।

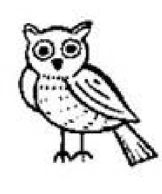

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা

নীচের প্রশ্ন-ক'টি পাঠিয়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন কবিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁরা যেন পৃথক-পৃথকভাবে অথবা একসঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন। —**সম্পাদক**

১। আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করছে বলে আপনার মনে হয়? যদি করে, কীভাবে?

২। অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এসেছে বলে আপনার মনে হয়? অথবা কবিতাই ক্রমে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলার সমাজমানসে বাংলা কবিতার প্রভাব কী রকম বলে আপনি মনে করেন?

৩। কবিতায় আপনি যে-ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে মুখের ভাষার কোনও বিরোধ আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন? কবিতার ভাষাকে আপনি কি মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী? অথবা কবিতার এক নিজস্ব ভাষা-নির্মাণই আপনার লক্ষ্য? কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় বলে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ তাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

৪। জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হলে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা কি আরও বেশি লোককে আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে বলে আপনি মনে করেন?

৫। এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার?

উত্তর লিখেছেন: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১। হ্যাঁ, প্রভাবিত করেছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ ও লড়াইয়ের কথা কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে হবে—এইরকম একটা দাবি উঠেছে। আমার অবশ্য ধারণা, চিরকালই কবিতায় সাধারণ মানুষের দুঃখ ও লড়াই ও স্বপ্নের কথাই থাকে। কিন্তু সেটা আরও প্রত্যক্ষ ও সুবোধ্য হওয়া দরকার বোধহয়। সেরকম ভাবে কিছু কবিতা লেখার চেষ্টা আমি করেছি ইদানীং এবং ব্যর্থ হয়েছি। ঠিক ফর্মটি খুঁজে পাচ্ছি না। যাঁরা কবিতাকে এই হতে হবে, ওই হবে বলেন, তাঁরা জানেন না, প্রকাশের ঠিক ফর্মটা খুঁজে পাওয়ার জন্য কাউকে কী কঠিন সংশয়-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়!

২। না, কবিতা সম্পর্কে ঔদাসীন্য আসেনি। যত সংখ্যক যুবা রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, প্রায় তার সমান সংখ্যক যুবাই কবিতা নিয়ে মত্ত। এঁরাও সকলে সমাজ-সচেতন, আমার ধারণা। হয়তো প্রত্যক্ষভাবে কোনও কাজে নামেননি। তবে কবির পক্ষে কবিতা লেখাই সবচেয়ে বড় কাজ হওয়া উচিত। আর সমাজে কবিতার প্রভাব ঠিক কীভাবে পড়ে, আমি বুঝতে পারি না।

৩। আমি মুখের ভাষাতেই কবিতা লেখার পক্ষপাতী। কবিতার কোনও নিজস্ব ভাষা নেই। সব দেশে, মানুষের কল্পিত দেবতার চেহারা যেমন মানুষেরই মতো, তেমনই সব কবিতাই কবির মুখের ভাষা। এবং মুখের ভাষায় লেখা ছোট ছোট রচনায় রহস্য ও ব্যঞ্জনা ফুটলেই তা কবিতা হয়ে ওঠে। এই কাজটি না পারলেই কবিতা-কবিতা শব্দ ব্যবহার করে এক ধরণের বিশ্রী জিনিস অনেকে লেখেন। জনসাধারণের ভাষা বলে কিছু আছে কি সত্যি? মজুরের ভাষা কৃষক বোঝে না।

৪। না। এ রকম লিখবেন কিনা, সেটা কবির সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। মাঝে মাঝে অনেক খাঁটি কবিও এরকম সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে লেখেন, সেগুলো এক ধরণের অবকাশ যাপন, কবিতা থেকে।

৫। আলাদা আলাদা কবির ওপর সেটা নির্ভর করে। সাধারণ ভাবে কিছু বলা যায় না। ব্যক্তিগত ভাবে, আমার কাছে এটা একটা সংকটের সময়। নতুন কবিতার রূপ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

কবিতা-পরিচয়, দ্বাদশ সংকলন, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

স্বর্ণাক্ষরে পত্রিকা
কর্মক্ষেত্র
সব সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বাংলা পত্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি*
ভ্রমণ
ভারতে সবচেয়ে বেশি পড়া ভ্রমণ পত্রিকা*
কালের কষ্টিপাথর
নতুন মাসিক সাহিত্য পত্রিকা
ছেলেবেলা
ছোটদের পরমাশ্চর্য মাসিক পত্রিকা
****
কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
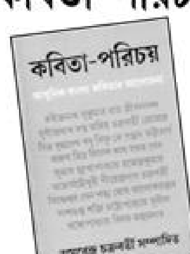

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০
****
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর গল্প ও কবিতা সংকলন
নিমফুলের মধু ₹৬০
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০
আমাদের সব বই ও পত্রিকা অনলাইনেও পাওয়া যায়:
www.swarnakshar.in
স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 Fax: 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in
*তথ্যসূত্র: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q3

পুরনো অ্যালবাম

সম্পাদকীয়

'কালান্তর' প্রকাশে পুনরায় বিলম্ব ঘটল। পৌষ ও মাঘ সংখ্যা একত্রে যুক্ত করেও প্রকাশ করতে ফাল্গুনের সপ্তাহাধিক অতিক্রান্ত হয়েছে! সতর্ক পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন, বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদে এবং পৃষ্ঠার শিরোনামায় পৌষ ও মাঘ দু'মাসের উল্লেখ থাকলেও, কলেবর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নি। এক মাসের সাধারণ পৃষ্ঠা-সংখ্যার উপর দু'মাসের টীকা পরিয়ে এক মাস এগিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। চেষ্টা অবশ্য ফলবতী হয়নি। আগামী সংখ্যা প্রকাশেও বিলম্ব হবে। আমরা অনন্যোপায়। কারণ,—পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব, কলেবর বৃদ্ধির অক্ষমতা এবং নিয়মিত সময়ে প্রকাশের অনিশ্চয়তা— কোনটাই অহেতুক নয়। বস্তুত, হেতুগুলি এত গুরুতর এবং ব্যাপক যে আরও বহু পত্র ও পত্রিকা এই অনিয়মের থেকে পার পাননি। ছাপাখানার অক্ষম প্রতিশ্রুতি ও অব্যবস্থাই অবশ্য প্রধান কারণ। তবু অস্বীকার করা চলে না যে ছাপাখানার অসুবিধাগুলি দুরতিক্রম্য হলেও, অনতিক্রম্য নয়। 'কালান্তরের' আকারের পত্রিকা একদিনেই মুদ্রণ সম্ভব, এমন ছাপাখানাও কলকাতায় বিরল নয়। ইদানীং বিলম্বের জন্য আমাদের গাফিলতিও অনেকাংশে দায়ী, সন্দেহ নেই। কিন্তু পাঠকবর্গের কাছ থেকে কিঞ্চিৎ উৎসাহ পেলেই, আমাদের উৎসাহ আবার তীব্র হতে পারে এবং শূন্যপ্রায় পকেটকে অবহেলায় তুচ্ছ করে, যৎপরোনাস্তি দক্ষিণা দিয়েও কালান্তর নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারি। গুণ-গ্রাহীরা বলে থাকেন, কালান্তর দ্বিতীয় বর্ষেই যে পরিমাণ সাড়া পেয়েছে সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে, সেটা সাধারণ বা সামান্য নয়। এই প্রকার প্রশস্তি হৃদয়ে অলস আনন্দ সঞ্চার করে, কিন্তু কাজে নামতে প্রলুব্ধ করে না।

বাংলা সাহিত্যিক-মহল থেকে আমরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়ে গৌরবান্বিত হয়েছি। আক্ষেপের কথা যে, তাতে আমাদের উৎসাহ কিঞ্চিৎমাত্রও বর্ধিত হয়নি। অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, তাঁরা বোধ হয় কালান্তর ভালো করে পড়ে দেখেননি। (যাঁরা এর ব্যতিক্রম, তাঁদের কাছে মার্জনা চাইছি)। প্রমথনাথ বিশীর এক বিখ্যাত গল্পে কোনও এক সাহিত্য-সভায় একটি মাত্র সাহিত্যিকের উপস্থিতির উল্লেখ আছে— যিনি সেই সভার সভাপতি। এটা শ্লেষ নয়, সকরুণ স্বীকারোক্তি এবং একজনের নয়, গোষ্ঠীর। আমরা অবশ্য সেই নিষ্করুণ ইঙ্গিতেও বিশ্বাস করি না যে, নিজের লেখাও পড়ার জন্য সময় নষ্ট না করে সেই সময় অন্য একটি লেখা লিখলে সাহিত্যিকের প্রতিপত্তি বাড়ে। তবু, ক্ষুব্ধচিত্তে এই কথা ভাবি যে, সাহিত্যিকেরা যদি পরস্পরের লেখা পড়তেন, তাহলে তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারতেন একই বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁরা সকলেই প্রায় একই ধরণের সৃষ্টিকার্যে ব্যস্ত। আর উপলব্ধি করলে নিশ্চয় নূতন উপাদানের সন্ধান করতেন এবং আমরা গতানুগতিক সাহিত্য পরিবেশনের নীরস কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পেতাম।

সাহিত্যিকের কাছে সাহিত্যপত্রের দাম নেই— এই কথাটা বলবার জন্য পূর্বোক্ত ভূমিকা। এই বছরের প্রথমদিকে কালান্তরে 'বই' সম্বন্ধে কিছু আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছিল। অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধেও এই বিষয়ে আভাস ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। দু এক জন পাঠক এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন— কিন্তু প্রধানত যাঁদের জন্য এই বিষয়ের অবতারণা, তাঁরা সামান্যমাত্রও কৌতূহল প্রকাশ করেননি। আমরা আশা করেছিলাম, বই-প্রচার ব্যাপারে সাহিত্যিকেরা শুধু উৎসাহী নয়, উদ্যোগীও হবেন, কারণ এই কমোডিটির উৎপাদক তাঁরাই। আশা বড় ছিল, সুতরাং ব্যর্থতা বেশী লেগেছে। বাংলাদেশে Book-Club প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করেছিলাম এই আশা নিয়েই যে লেখকেরা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী হবেন— নইলে বাঙালী পাঠকের উপর আমাদের আস্থা এত বৃহৎ নয় যে, তার জন্য প্রবন্ধ রচনা করা হবে।

পূর্ব-পাকিস্তান কায়েম হবার পর, বাংলা বই-এর বাজারে সাময়িক মন্দা পড়েছিল। এই অস্থায়ী মন্দা-কে মূলধন করে বহু প্রকাশক লেখককে বিভ্রান্ত করছেন। বাজার পুনরায় ভালো হচ্ছে। বই-এর বাজারকে দাবিয়ে রাখা কোনও যুগেই কারও দ্বারা সম্ভব হবে না। সঙ্ঘ-বদ্ধ প্রচারের দ্বারা সেই বাজারকে আরও বৃহৎ এবং ব্যাপক করে তোলার ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের যথেষ্ট দেবার আছে।

বাংলা বই আশানুরূপ বিক্রী হয় না, একথা সর্বজনগোচর। উপন্যাসের পাঠিকা যদি বা কিছু পাওয়া যায়, ছোটগল্পের পাঠক সংখ্যা নগণ্য। সুতরাং ছোটগল্পের বইকে এমন সযত্নে সাজানো হয়, যাতে এক নজরে বুঝতে পারা না যায়, বইটি ছোটগল্পের সংগ্রহ, না, উপন্যাস। এ সব কথা নিয়ে সকলেই আক্ষেপ করেন— লেখক, প্রকাশক— এমন কি পাঠকও। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, কত বিক্রয় হয় বাংলা বই, তাহলে প্রথম দু'জন নিরুত্তর থাকেন, এবং তৃতীয় জন নীরবে উত্তর খোঁজেন। বাংলা সাময়িক পত্রিকার বিক্রয় সংখ্যা বাড়িয়ে বলা বিধি। অন্যদিকে, বই-এর বিক্রয় সংখ্যা কমিয়ে বলাই সাধারণ নিয়ম। উভয় ক্ষেত্রেই প্রকাশের মুনাফা বৃদ্ধির প্রয়াস। কিন্তু বাংলা সাধারণ বই-এর বিক্রয় এত স্বল্প যে তাকে কমিয়ে বলার কোনও সার্থকতা নেই। লক্ষ্য করে থাকবেন, শুধুমাত্র সংস্করণের উল্লেখ থাকে; প্রকাশ কালও মাঝে মাঝে মুদ্রিত হয় না। মুদ্রণ সংখ্যা তো কোন কালেই উল্লেখ করা হয় না। আজ যে বই-এর প্রথম সংস্করণ আপনার হাতে এসে পড়েছে, বোঝবার উপায় নেই যে, সেই বই ছাপা হয়েছিল দশ বৎসর পূর্বে, এবং মোট মুদ্রিত হয়েছিল, এক সহস্র খণ্ড— যার অর্ধেক আজও অবিক্রীত আছে। বলতে পারেন, মুদ্রণ সংখ্যা এত কম এবং এক সংস্করণ নিঃশেষ হতে এত বেশী সময় লাগে যে, প্রকাশক লজ্জায় সময় ও সংখ্যার উল্লেখে বিরত থাকেন। কিন্তু এর জন্য তো প্রকাশকের লজ্জিত হবার কথা নয়; বরং, সে পাঠকের ঔদাসীন্যর জন্য এমন বাজার বই-এর, তাঁদের লজ্জা দেবার জন্যই বড় করে সংখ্যা ও সময়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। অনুরোধে যুক্তিতে যাদের চোখ খোলে না, ধিক্কারে ও লজ্জায় তাদের পরিবর্তন হলেও হতে পারে।

প্রতাপকুমার রায় সম্পাদিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত 'কালান্তর' পৌষ-মাঘ, ১৩৫৫ থেকে পুনর্মুদ্রিত। মূলের বানান অপরিবর্তিত। সৌজন্য: রুবি রায়।

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

। পর্ব ১১।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে পরিচয় হল যখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি, মডার্ন হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণিতে। একদিন অঙ্কের মাস্টারমশাই, রামনারায়ণ বসু ক্লাসে এলেন। তাঁর হাতে একটি বই, ভাবলাম জ্যামিতি বা ওই ধরণের বই। উনি মাঝে মাঝে এরকম বাইরের বই এনে টাস্ক দিতেন। কিন্তু সেদিন উনি বোর্ডে কোনও অঙ্ক দিলেন না। ক্লাসে ঢুকে চেয়ারে বসে বললেন, আজ আর তোদের অঙ্ক করাব না। একটা ভালো গল্পের বই পেয়েছি। তার থেকে তোদের একটা গল্প পড়ে শোনাব।

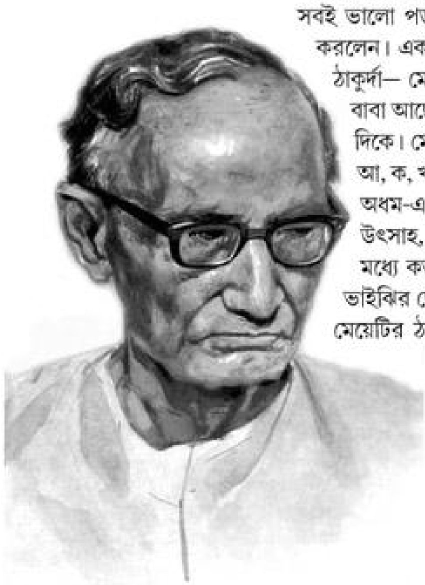

রামনারায়ণবাবু অঙ্কের সঙ্গে বাংলা ইংরিজি সংস্কৃত সবই ভালো পড়াতেন। তা সেদিন গল্প পড়তে শুরু করলেন। একটি ছোটো মেয়ে, তার মেজকাকা ও ঠাকুর্দা— মোটামুটি এই তিনটি চরিত্র। মেয়েটির বাবা আছেন, তবে তিনি গল্পে এসেছেন শেষের দিকে। মেয়েটি পড়াশুনো করতে চায় না। অ, আ, ক, খ'র পর আর কিছু এগোল না। অচল, অধম-এ থেমে রইল। মেজকাকারও অদম্য উৎসাহ, ভাইঝিকে শিক্ষিত করবেনই। এর মধ্যে কত যে বর্ণ-পরিচয় নষ্ট হল, কোনওটা ভাইঝির ছোট ভাই নষ্ট করল তার ইয়ত্তা নেই। মেয়েটির ঠাকুর্দার প্রশ্রয় আছে, বলেন, আমার নাতনি হাল ছাড়েনি রে, হারানো বইগুলি এখনও খুঁজছে।

মেজকাকার এই সাফল্যের মধ্যেই মেয়েটির বাবা অল্পবয়সেই মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন অল্পবয়সে বিয়ে দিলে পুণ্যসঞ্চয় হয়, এমনটা বিশ্বাস ছিল। মেজকাকার স্নেহ, আপত্তি টিকবে কেন। তাঁর তো মেয়ে নয়। বিদায়ের দিনে মেয়েটি বলল কাঁদতে কাঁদতে, মেজকা, বর্ণ-পরিচয়গুলো হারায়নি। আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম, বিয়ের চেলির মধ্যেই দেখাল, হারিয়ে যাওয়া বা লুকিয়ে রাখা ১৭টা বর্ণ-পরিচয়। পড়বে না বলে। এখন সব নিয়ে যাচ্ছে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বর্ণপরিচয় শিখে মেজকাকাকে চিঠি দেবে।

মেয়েটি সব কথা বলল কাঁদতে কাঁদতে। মেজকাকাও অশ্রুসজল চোখে বিদায় দিলেন আদরের ভাইঝিকে। পড়ানোর জন্য এত কঠোর শাসন করেছিলেন, এখন সেজন্য হয়তো অনুশোচনা হচ্ছে। মনে হচ্ছে এতটা কঠিন না হলেও হত।

গল্পের শেষে, মাস্টারমশাই, যিনি পড়লেন গল্পটি, তাঁরও চোখে জল, অথচ মুখে হাসি। আমাদের, শ্রোতাদেরও তাই।

এমন কান্না-হাসি মেশানো গল্প আর পড়িনি। গল্পটির নাম 'রানুর প্রথম ভাগ।' লেখক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

তখন কি জানতাম, এমন অসাধারণ গল্পের লেখকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হবে, সৌভাগ্য হবে তাঁর দারভাঙার বাড়িতে গিয়ে থাকার!

তখন আমি কলেজে ঢুকেছি। প্রকাশন দপ্তরে কাজ করি সেই সঙ্গে। একদিন এক মধ্যবয়স্ক সৌম্য চেহারার

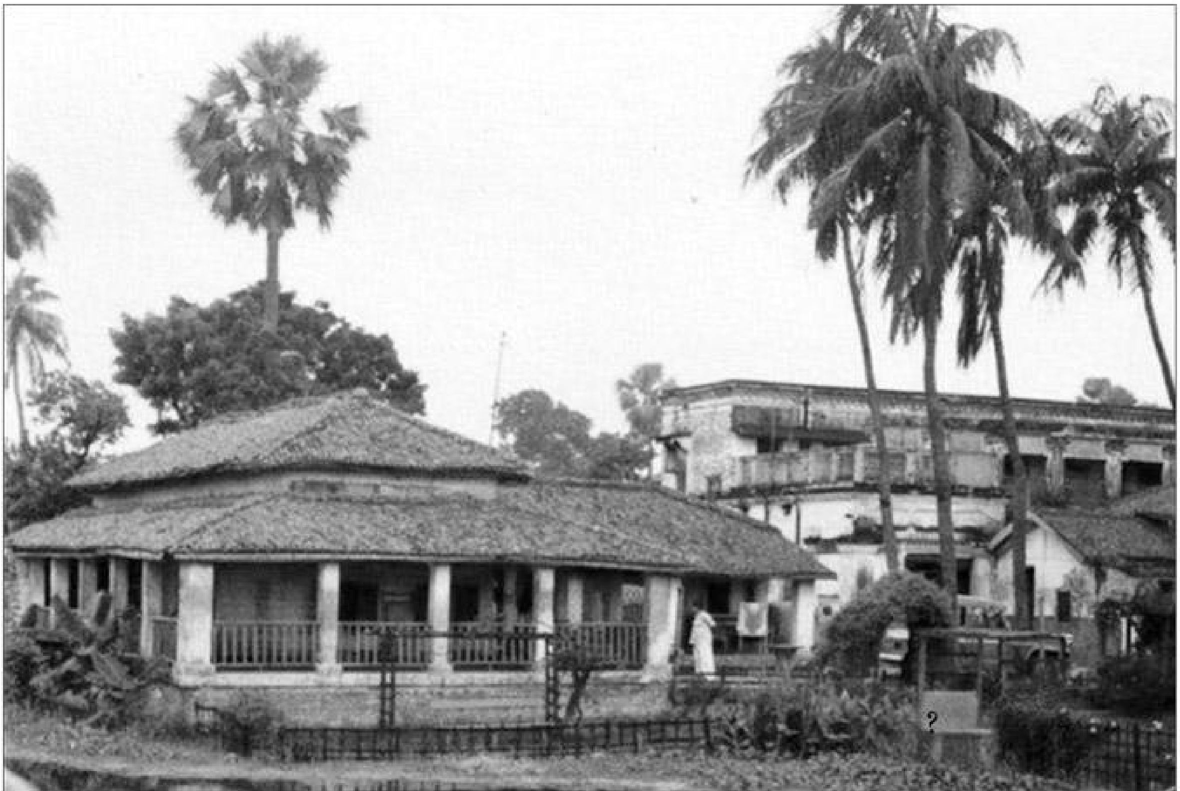

বিভূতিভূষণের আদি বাড়ি হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের কাছে, চাতরাতে

ভদ্রলোক এলেন। এসে সহকর্মী দাদাদের জিজ্ঞেস করলেন, গজেনবাবুরা আসেননি?

দাদা বললেন, এসে পড়বেন এখনই।

আমায় ইশারায় জানালেন, ইনি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রণাম করলাম। দাদা আমার পরিচয় দিলেন, নবাগত কর্মী বলে।

দারভাঙা শহর থেকে মাইল বারো দূরের এই গ্রামে বিভূতিভূষণের পিতামহ ষোলো-সতেরো বছর বয়সে নীলকুঠির কাজ নিয়ে চলে আসেন। তখন থেকেই তাঁরা মিথিলার অধিবাসী।

বিভূতিভূষণের আদি বাড়ি ছিল হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের কাছে, চাতরাতে। বিভূতিভূষণের জন্মের পর বাংলা শেখানোর জন্য বছর দুই তাঁকে শ্রীরামপুর চাতরাতে রাখা হয়। সেখানে ঠিকমতো পড়াশুনো হচ্ছে না বলে পিতা বিপিনবিহারী তাঁকে নিয়ে আসেন দারভাঙায়। এখান থেকেই বিভূতিভূষণ ১৯১২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। আজ থেকে প্রায় একশত বছর আগের কথা।

ইন্টারমিডিয়েট পাশ করলেন কলকাতার রিপন কলেজ থেকে, এখনকার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। বি এ পাশ করলেন পাটনা বি এন কলেজ থেকে ১৯১৬ সালে।

এরপর শিক্ষকতার জীবন, দারভাঙা রাজপরিবারে নানা ধরণের কাজ প্রাইভেট সেক্রেটারি থেকে গৃহশিক্ষক, সাংবাদিকতা, শেষপর্যন্ত সাহিত্যসাধনায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ।

বাল্যকালে ফুটবল ছিল তাঁর প্রিয় খেলা। পরে কথায় কথায় বলেন, চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত খেলার মাঠের সঙ্গে যোগ ছিল। রেফারির কাজও চালিয়েছেন সমান উৎসাহে।

'মানসী ও মর্মবাণী' তখনকার দিনে একটি বিখ্যাত পত্রিকা। এখান থেকেই বিভূতিভূষণের সাহিত্যে হাতেখড়ি। তারপর 'প্রবাসী' পত্রিকায় পুরোপুরি ছোট গল্পকাররূপে আত্মপ্রকাশ।

'প্রবাসী' পত্রিকায় তখন সম্পাদনার সহযোগী হিসেবে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সজনীকান্ত দাশ। সজনীবাবু 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশ করলে তাঁর প্রকাশনার নাম হয় রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। এখান থেকেই প্রথম বেরয় বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের বই— 'রানুর প্রথম ভাগ,' ক্রমে ক্রমে 'রানুর দ্বিতীয় ভাগ', 'রানুর তৃতীয় ভাগ', 'রানুর কথামালা' বইগুলি।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'নীলাঙ্গুরীয়' সর্বাধিক জনপ্রিয়। কিন্তু সমালোচকদের মতে তাঁর সেরা সৃষ্টি হল 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' উপন্যাসটি। নিজের পিতা-মাতাকে নিয়ে এমন মর্মস্পর্শী উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে দুটি নেই। হাসির গল্পের লেখক হিসেবে বিভূতিভূষণের খ্যাতি 'বরযাত্রী' ও 'বাসর' গল্পগুলির

আমাকে বলেছিলেন বিভূতিবাবু, ভানু, অনেকে আমাকে বলে, রানুর গল্পগুলিতে কান্নার ভাগ বেশি, 'বরযাত্রী' গল্পে হাসির রস বেশি। তবে আমার নিজের মনে হয়, 'কাঞ্চনমূল্য' উপন্যাসটিতে কান্না-হাসির ভাগ সমান সমান।

দারভাঙ্গা রাজবাড়ি

বিভূতিবাবুকে সেকথা বলতে বললেন, ঠিকই বলেছ, এদের চালচলন দেখলে বোঝা যায় না, এরা কত ধনী। রিকশা চালালে কী হবে, ছেলেমেয়ের বিয়েতে কম করেও লাখটাকা খরচ করে। বিয়েতে যথারীতি আড়ম্বর খাওয়া-দাওয়া না হলে এদের মান বংশকৌলিন্য বজায় থাকে না।

জন্য। এইসব গল্পের গনশা, ঘোঁতনা, কে-গুপ্তর মতো জীবন্ত চরিত্র বাংলা সাহিত্যে কমই আছে।

ধীরে ধীরে কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছি। 'বরযাত্রী', 'বাসর'-এর পর তাঁর যে গল্পগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তা হল স্বরূপ মণ্ডলের গল্প। সেখান থেকেই বেরিয়ে এল 'কাঞ্চনমূল্য' উপন্যাসটি। বাংলা ১৩৬৩ সালের বৈশাখ মাসে। আমাকে বলেছিলেন বিভূতিবাবু, ভানু, অনেকে আমাকে বলে, রানুর গল্পগুলিতে কান্নার ভাগ বেশি, 'বরযাত্রী' গল্পে হাসির রস বেশি। তবে আমার নিজের মনে হয়, 'কাঞ্চনমূল্য' উপন্যাসটিতে কান্না-হাসির ভাগ সমান সমান।

বিভূতিভূষণের 'সরস গল্প' প্রকাশের সময়ে দারভাঙা যেতে হয়েছিল। সেটা ১৯৫২ সাল। সে সময়ে তাঁর জন্মদিনও ছিল। সে উপলক্ষে বাড়িতেও একটু ঘটা-আনন্দর আয়োজন ছিল।

দারভাঙা পৌঁছতেই সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালেন অতিথিকক্ষে। তবে বহির্বাটির কোলে সরোবর না সরোবরের কোলে বহির্বাটি কী বলব ভেবে পাই না। পাশে তৈরি করেছেন একটি ছোট বাগান, তাতে নানারকম ফুল, একটি লজ্জাবতী লতা। দেখিয়ে বললেন, এটি আমার বড় প্রিয়।

তিনদিন ছিলাম, এরকম মায়ের মতো যত্ন পাব ভাবিনি। রাতে শোওয়ার পর নিঃশব্দে এলেন ঘরে। মশারি ঠিক টাঙানো হয়েছে কিনা দেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। পাছে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

বিভূতিবাবু জানতেন কলকাতার মানুষরা ভোরবেলায় চা খায়। প্রায় ভোরেই চা-বিস্কুট নিয়ে এলেন বাড়ির এক পরিচারিকা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলেন বিভূতিবাবু। সস্নেহ সুরে বললেন, তোমাদের তো সকালে উঠেই চা খাওয়ার অভ্যেস, তাই করিয়ে নিয়ে এলাম। আমিও নিচ্ছি।

চায়ের পর একটা কাঁচি সিগারেট ধরালেন। কলকাতায় কখনও তাঁকে সিগারেট খেতে দেখিনি। কথাটা বলতে বললেন, আমি দিনে তিনটে সিগারেট খাই। সকালে এই চা খাওয়ার পরে, দুপুরে স্নানের আগে, আর রাতে খাওয়ার আগে। তাই দেখতে পাওনি।

আমি বললাম, কোনওদিন সংখ্যা বাড়েনি?

বিভূতিবাবু বললেন, কোনওদিন কম হয়েছে, তবে বাড়েনি কখনও। আর এই সিজরস ব্র্যান্ড ছাড়া অন্য কোনও ব্র্যান্ড খাইনি।

দুপুরে ভেতরবাড়ি থেকে খবর এল, ভাত দেওয়া হয়েছে। চলো ভানু, খেতে চলো, বিভূতিবাবু বললেন।

পাশাপাশি দুটো পিঁড়ি পাতা। ঝকঝকে কাঁসার থালা, বাটি, গেলাস।

খেতে খেতেই বললেন, ভানু, তোমাকে একটা নতুন ধরণের আম খাওয়াই, এ আম কলকাতায় যায় না।

সে আমের অদ্ভুত সুমিষ্ট স্বাদ। কিন্তু কর্পূরের সুবাস। এ আম গাছ থেকেই পাকা তুলতে হয়। কাঁচায় তুলে কারবাইডে বা অন্য কোনও উপায়ে পাকানো যায় না। দারভাঙায় এ আমকে কর্পূরখান বা কর্পূরিয়া বলে।

বিকেলবেলা বিভূতিবাবু বললেন, চলো ভানু, আমাদের শহরটা তোমাকে দেখাই একটু।

একটা রিকশায় উঠে বিভূতিবাবু আমাকে পাশে বসতে বললেন। দারভাঙার রিকশা অন্য শহরের তুলনায় বড় এবং দেখলেই মনে হয় রিকশা এবং রিকশার মালিক উভয়েই বৈভবশালী। বিভূতিবাবুকে সেকথা বলতে বললেন, ঠিকই বলেছ, এদের চালচলন দেখলে বোঝা যায় না, এরা কত ধনী। রিকশা চালালে কী হবে, ছেলেমেয়ের বিয়েতে কম করেও লাখটাকা খরচ করে। বিয়েতে যথারীতি আড়ম্বর খাওয়া-দাওয়া না হলে এদের মান বংশকৌলিন্য বজায় থাকে না।

সময় তখন ১৯৫৩ সাল। সে হিসেবে তখনকার লাখটাকা আজ কোটি টাকার সামিল।

দারভাঙার রাজবাড়ি দেখালেন বিভূতিবাবু। কত দ্রব্য নানারকম, কত আরশির সম্ভার। কোনওটার সামনে দাঁড়ালে লম্বা সরু দেখায়, কোনওটার সামনে বেঢপ মোটা, কোনওটায় বেঁটে। রাজার খেয়ালে এই নানান দ্রব্যের সঞ্চয়। নানা খেতাবের সারি দেয়ালে।

রাজার খেয়ালের কথা বলছিলেন বিভূতিবাবু। রাজা প্রথম ট্রেনে উঠেছেন। ফার্স্ট ক্লাস তো অবশ্যই। সেকালের ফার্স্ট ক্লাস।

পুরো রিজার্ভ। কামরার ওপর দিকে চেন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কিসের চেন সেক্রেটারি সাব!

সেক্রেটারি বললেন, কোনও বিপদ-আপদে দরকার হলে চেন টানলে ট্রেন দাঁড়িয়ে যাবে। রাজা সাহেব বললেন, এ তো বেশ মজার।

বলতে বলতেই চেন টেনেছেন।

ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। সেক্রেটারি বললেন, রাজা সাহেব, বিপদ-আপদ হলেই তবে চেন টানতে হয়। নয়তো বিনা কারণে চেন টানলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হবে। ট্রেন থামার কারণে ততক্ষণে গার্ড ছুটে

এসেছেন। সেক্রেটারি গার্ড সাহেবকে বুঝিয়ে বললেন রাজার খেয়ালের কথা।

গার্ড সাহেব চলে যাওয়ার পর রাজামশাই ম্যানেজারবাবুকে ডেকে বললেন দশটা পঞ্চাশ টাকার বাণ্ডিল করতে। উনি চেন টেনে আরও দশবার ট্রেন থামাবেন বললেন। সেক্রেটারি ম্যানেজার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজাসাহেবকে নিবৃত্ত করলেন, সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা বলে।

এই খামখেয়ালি রাজাসাহেবের মেজাজের জন্যই বিভূতিভূষণ দারভাঙা রাজার কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু তাঁর সৌজন্যপরায়ণ সৌম্য শান্ত স্বভাবের জন্য রাজপরিবার তাঁকে ছাড়তে চায়নি। গার্জেন টিউটর করে আটকে রাখেন।

বিভূতিভূষণ যেমন হাসির গল্প লিখেছেন, তেমনই স্নেহ-নির্ঝর সম্পৃক্ত অশ্রুজলস্পৃষ্ট কাহিনিও লিখেছেন। আবার মানবজীবনের অসংখ্য গবাক্ষ বাতায়ন দিয়ে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবনানন্দ-দুঃখবেদনা ধরা পড়ে, সেগুলির দিকেও বিভূতিভূষণের সমবেদনাপূর্ণ সহানুভূতিশীল দৃষ্টি ছিল। অধুনালুপ্ত ফলতা যাওয়ার ছোট ট্রেনে উঠে যে জীবনদর্শন করেছেন, সেই জীবন রোমন্থনের কাহিনি শুনিয়েছেন তাঁর 'দুয়ার হতে অদূরে' গ্রন্থে। ঠিক এইরকমেরই আরেকটি বই 'কুলী প্রাঙ্গণের চিঠি'।

বিভূতিভূষণের 'রংলাল' নামে একটি গল্প আছে, কুকুরকে নিয়ে। কতখানি মমত্ববোধ থাকলে, পাঠকরা বুঝতে পারবেন, এই ইতরপ্রাণীটি কীভাবে মনুষ্যসমাজের একজন হয়ে উঠল।

বিভূতিভূষণের জনপ্রিয় উপন্যাস 'নীলাঙ্গুরীয়', তবে তাঁর সেরা লেখা নিজের বাবা-মাকে নিয়ে লেখা 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' উপন্যাসটি। বাংলা সাহিত্যের সেরা ১০টি উপন্যাসের মধ্যে অবশ্যই একটি।

শরৎ সমিতি যখন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে শরৎ পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব নেন, তখন তাঁর শরীর খুব খারাপ। দারভাঙা থেকে কলকাতায় এসে পুরস্কার নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। তখন শরৎ সমিতির সভায় স্থির হয়, পুরস্কারের অর্থ ও অর্ঘ্য ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। শরৎ সমিতির সভায় এও স্থির হয় যে গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, দেবব্রত বসু নিয়ে যাবেন এই অর্ঘ্য ও অর্থ পুরস্কার। বিভূতিবাবুকে সেকথা জানানো হলে, বিভূতিবাবু ইচ্ছা প্রকাশ করেন ভানু যেন ওঁদের সঙ্গে অবশ্য আসে এবং সবাই ওঁর বাড়িতেই থাকবেন।

শরৎ সমিতির পক্ষ থেকে আমরা চারজন ট্রেনে রওনা হলাম। বরাউনি পর্যন্ত ব্রডগেজ, তারপর মিটারগেজে দারভাঙা। বরাউনি পৌঁছে দেখলাম, বর্ষার জলে চতুর্দিক ভাসছে। দারভাঙার ট্রেন কখন আসবে ঠিক নেই। অগত্যা ট্যাক্সি নিয়েই রওনা হলাম। পথ জলে ভাসছে। পথপার্শ্বের ঘাসের শিষ দেখে বোঝা যায়, গাড়ি রাস্তার ওপর দিয়েই যাচ্ছে। যখন দারভাঙায় গিয়ে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম জল সরে গিয়েছে।

বিভূতিবাবুর বাড়িতে যেতেই তাঁর ভাইয়েরা অভ্যর্থনা জানালেন। বিভূতিবাবু শুয়ে ছিলেন।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা সভায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বনফুল (ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), ডঃ রমা চৌধুরী

আমাদের আগমন-বার্তায় আস্তে আস্তে উঠে এলেন। তাঁর চিকিৎসক ডাঃ বি এন দাশগুপ্তও উপস্থিত ছিলেন। আমরা যখন বললাম, ওঁর বাড়ির সামনেই এই উঠোনে একটা ছোট সভা করে পুরস্কারটি অর্পণ করতে চাই,উনি প্রবল আপত্তি তুললেন। বললেন, আপনারা জানেন না, ওঁর শরীর কত খারাপ, ওঁকে একদম স্ট্রেন করানো যাবে না। শেষে অনেক আলোচনার পর স্থির হল সভায় ওঁকে বালিশ দিয়ে বসানো হবে, যা বলার গজেনবাবুরা বলবেন। পুরস্কার অর্পণ করা হবে এই মাত্র অনুষ্ঠান।

ডাক্তারবাবু সম্মতি দিলেন।

আমরা পৌঁছেছিলাম সকালেই। দুপুরবেলা আহারাদির পর দেখলাম, বিভূতিবাবু স্বয়ং উঠে এসে তদারক করে পরিচারককে দিয়ে ফরাস পাতাচ্ছেন। গজেনবাবুরা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। ডাক্তারবাবুর নিষেধবাণীর কথা বলা হল। বিভূতিবাবু স্মিত হেসে বলেন, এটুকু পরিশ্রমে কিছু হবে না। ডাক্তারবাবুরা ওরকম বারণ করেই থাকেন।

তারপর যথারীতি সভা হল। গজেনবাবু সুমথবাবু বিভূতিবাবুর সাহিত্য সম্বন্ধে বললেন। দেবব্রতবাবু শরৎ সমিতির বক্তব্য পাঠ করলেন। পুরস্কার ও অর্ঘ্য প্রদান করা হল। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, সবশেষে বিভূতিভূষণও ধন্যবাদ দিলেন ও আমাদের আন্তরিকতার প্রসঙ্গে বললেন।

বিভূতিভূষণের ডাক্তারবাবু বললেন, হ্যাঁ মশাই, আপনাদের আসা যে ভিটামিনের কাজ করল। আমি তো ভাবতেই পারছি না, এই মানুষ কাল পর্যন্ত শয্যাশায়ী ছিলেন।

বলাবাহুল্য, আমরা বিভূতিবাবুর বাড়িতেই ছিলাম। আমাদের প্রত্যেকের যত্ন যাতে ঠিক ঠিক হয়, সেদিকে বিভূতিবাবুর সযত্ন সতর্ক দৃষ্টিপাত ছিল।

এরপর দারভাঙায় বিভূতিবাবুর কাছে গেলাম আমি একলা। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলী ছাপার সময়ে। তাঁর সমস্ত রচনার তালিকা করে কোন খণ্ডে

দুপুরবেলা আহারাদির পর দেখলাম, বিভূতিবাবু স্বয়ং উঠে এসে তদারক করে পরিচারককে দিয়ে ফরাস পাতাচ্ছেন। গজেনবাবুরা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। ডাক্তারবাবুর নিষেধবাণীর কথা বলা হল। বিভূতিবাবু স্মিত হেসে বলেন, এটুকু পরিশ্রমে কিছু হবে না। ডাক্তারবাবুরা ওরকম বারণ করেই থাকেন।

কী কী বই যাবে তার ক্রম সাজিয়ে নেওয়া হল।

এই সময়েই সমস্ত পরিবারটিকে দেখার সুযোগ হল কাছ থেকে। রাণু ওঁর বড় ভাইয়ের মেয়ে। বড়দা চলে যাওয়ার পর মেজদা অর্থাৎ বিভূতিভূষণ সমস্ত পরিবারের মাথায় যেন ছাতা ধরে আছেন। রাস্তার এপার ওপার দুই বাড়ি ছড়িয়ে এই বৃহৎ পরিবার। আমি থাকতেই রাস্তার ওপারের বাড়ি থেকে এলেন ডাক্তারভাই। বললেন, মেজদা তোমার ভাইঝি কাল শ্বশুরবাড়ি যাবে, পাঁজি দেখে একটু সময়টা বলে দাও, কখন বেরবে।

বিভূতিবাবু কলকাতায় এলে আগে শিবপুরে থাকতেন। পরে নিউ আলিপুরে দুর্গাবাবুর বাড়িতে। দুর্গাবাবু হলেন সেকালের মোহিনী মিলের কর্তা। সেখান থেকেই বই পাড়ায় আসতেন।

একদিন আমাদের কার্যালয়ে এসেছেন। আড্ডা চলছে। এমন সময়ে এক পত্রিকার সাংবাদিক এসে ওঁর ইন্টারভিউ চাইল। বিভূতিবাবু বললেন, ইন্টারভিউ দিতে আপত্তি নেই, শুধু একটা প্রশ্ন করবেন না, কেন বিয়ে করিনি। এই বয়সে ওই প্রশ্নটা আর ভালো লাগে না।

বন্ধুরা সবাই বিভূতিবাবুর কথায় হেসে উঠলেন।

এই প্রসঙ্গে ওঁর আত্মজীবনী 'জীবনতীর্থ' ছাপার কথা মনে পড়ল। এই বইটি শরৎ সমিতিই প্রকাশ করেছিলেন। প্রুফ দেখার কাজ চলছে। হঠাৎই আগের অংশের প্রুফ আবার চেয়ে পাঠালেন বিভূতিবাবু। বললেন, আগের অংশটায় মারাত্মক ভুল আছে। দেবব্রতকে লিখলেন, আমাকেও লিখলেন একই কথা। প্রুফ এলে দেখা গেল, 'তিনি ও মেয়েটি পরস্পরকে ভালোবেসেছিলেন' লেখা আছে। সেটি কেটে করলেন 'তিনি মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলেন'। আমরা বললাম, তা আগেরটা কী এমন ভুল ছিল! বিভূতিবাবু একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তোমরা ধরতে পারছ না? পরস্পরকে ভালোবাসা মানে ও-ও ভালোবেসেছিল, তা সেটা তো আমার পক্ষে ধরা সম্ভব ছিল না, আমি ভালোবেসেছিলাম, সেটা আমি বলতে পারি। এটা তো আত্মজীবনী। এখানে তো কল্পনা বা বানানো কথা লেখা যায় না। সেটা তো মিথ্যাচার হয়ে যায়। এটা তো উপন্যাস নয়!'

আসলে এই সত্যপরায়ণতা থেকে আমরা এখন অনেক দূরে চলে এসেছি।

এই শুদ্ধাচারী নির্মল মানুষটির যাঁরাই সঙ্গ করেছেন, তাঁরাই বলেছেন, এমন মানুষ দেখা যায় না।

একবার বিভূতিবাবু আর মনোজ বসু মশাই বোম্বাই যাচ্ছেন সাহিত্যসভায়। ট্রেনে ডিনার দিয়েছে রাত্রে। রুটি মুরগির মাংস ইত্যাদি। বিভূতিবাবু বললেন, আমি তো মুরগি খাই না।

মনোজবাবু বললেন, ও বিভূতিদা, মুরগির মাংস হিন্দুদের অভক্ষ্য নয়। স্বয়ং রামচন্দ্র কুক্কুট মাংস খেয়েছেন। রামায়ণে উল্লেখ আছে।

অনেক বলা-কওয়ার পর বিভূতিবাবু মুরগির মাংস দিয়ে ডিনার সারলেন। খাওয়ার আগে নিত্য যেমন গণ্ডূষ করেন, তেমনই করলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর এটা-সেটা গল্প চলছে। এমন সময় মনোজবাবু হঠাৎ বলে বসলেন, বিভূতিদা, আপনি যে বললেন মুরগির মাংস কখনও খাননি, তা আমার কথায় না হয় খেলেন, তাই বলে গণ্ডূষ করে চৌদ্দ পুরুষকেও খাওয়ালেন!

বিভূতিবাবু প্রথমে চমকে গেলেন, তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, আপনি যে বললেন রামচন্দ্র খেয়েছেন, তাহলে আমার পূর্বপুরুষরাও খেয়ে থাকবেন।

বিভূতিভূষণের মতো এত নিষ্পাপ নির্মল মনের অধিকারী মানুষ খুব কমই দেখা যায়। সম্ভবত একমাত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে।

শরৎ পুরস্কার ছাড়াও, কাঞ্চনমূল্য উপন্যাসের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শরৎচন্দ্র স্মৃতি পদকপ্রাপ্তির কথা আগেই বলেছি। এছাড়া তাঁর 'এবার প্রিয়ম্বদা' উপন্যাসটি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট উপাধি দেন। বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু এই সব সম্মান তাঁর মনে কোনও অহংকার সৃষ্টি করেনি।

তাঁর দারভাঙার বাড়িতে একটি কিশোর ঢুকে এদিক-ওদিক চাইছে। সে রাণুর প্রথমভাগ সদ্য পড়েছে। বিভূতিবাবু কিশোরটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিছু খুঁজছ? কাকেও চাইছ?

কিশোরটি বলল, আমি রাণুকে খুঁজছি।

বিভূতিবাবু হেসে বললেন, তাকে তো পাবে না বাবা/সে এখন দিদিমা হয়ে গিয়েছে।

বিভূতিবাবু বললেন আমাদের, ছেলেটি যেন দুঃখ পেল।

আমরাও শুনে দুঃখ পেয়েছিলাম। রাণুকে দিদিমা তো ভাবতেই পারতাম না। আমাদের চোখে রাণু সেই ছোট্ট মেয়েটিই আছে।

আজ রাণু নেই। রাণুর মেজকা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ১৯৮৭ সালের জুলাইমাসের শেষে এক বর্ষা-মেদুর দিনে, দারভাঙাতেই।

মনোজবাবু বললেন, ও বিভূতিদা, মুরগির মাংস হিন্দুদের অভক্ষ্য নয়। স্বয়ং রামচন্দ্র কুক্কুট মাংস খেয়েছেন। রামায়ণে উল্লেখ আছে। অনেক বলা-কওয়ার পর বিভূতিবাবু মুরগির মাংস দিয়ে ডিনার সারলেন। খাওয়ার আগে নিত্য যেমন গণ্ডূষ করেন, তেমনই করলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর এটা-সেটা গল্প চলছে। এমন সময় মনোজবাবু হঠাৎ বলে বসলেন, বিভূতিদা, আপনি যে বললেন মুরগির মাংস কখনও খাননি, তা আমার কথায় না হয় খেলেন, তাই বলে গণ্ডূষ করে চৌদ্দ পুরুষকেও খাওয়ালেন!

বিষাদগাথা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

১১

(পরিচ্ছেদ: ৩১, ৩২, ৩৩)

৩১

সরোজিনীর মাথার চুলে একফালি সাদার পোচ ছাড়া সবটাই কালো, দাঁত অটুট, মেরুদণ্ড সামান্য বেঁকলেও বোঝা যায় না, কিন্তু রাসমাঠে আধাসেনার সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষের সময় ভীত মানুষের দৌড়োদৌড়িতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার পর থেকে তাঁকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়।

এক রবিবার গানের মিছিল থেকে ফেরার পথে লক্ষ্মীর মেয়ে চিরন্তনী মন দিয়ে দিদিমাকে দেখতে দেখতে বলল, 'তোমাকে এখন আরও সুন্দর দেখায়, দিম্মা। এবার লর্ড বায়রনের স্টাইলে হাতে একটা ছড়ি নাও, দেখবে সবাই তোমার সব কথা শুনবে।'

'তুই নিজে সুন্দর। তোর ফাজলামিও সুন্দর।' বলে সরোজিনীকে হেসে ফেলতে দেখে চিরন্তনী দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'কী অপূর্ব দেখালো গো তোমায়! এবার মঙ্গলমঞ্চে তুমিই কথা বলবে!'

'মঙ্গলমঞ্চ আসলে তোদের জন্য। পরে তোরাই ওখানে বলবি। এখন তাড়াতাড়ি চ', পরীক্ষিৎ মিছিলের কথা শোনার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে থাকে রে।'

> 'জানো লিওন, বালিসোনার সবাই কোনও না কোনও অসুখে ভুগছে।'

চিরন্তনীকে তাড়া দিলেও সরোজিনী নিজে খোঁড়া পায়ে দ্রুত হাঁটতে পারে না। অনেক বুঝিয়েও তাকে হাসপাতালে ভরতি করা যায়নি, নিজের নামের হাসপাতালে রোগী হয়ে সে কখনওই যাবে না। তার পায়ের পাতার হাড় ভেঙেছে বলেই মনে হয়, অবনীও তাকে হাসপাতালে অর্থপেডিক সার্জেনকে দেখানোর জন্য বলে রাজি করাতে পারেনি। অগত্যা সে-ই কয়েকদিনের জন্য আর্নিকা ও সিম্ফাইটাম খাওয়ায়।

মিছিলের দৈর্ঘ্য সপ্তায়-সপ্তায় বেড়েই চলেছে, প্ল্যাকার্ডে পরীক্ষিতের বিষাদগাথার টুকরো ছাড়াও তার কবিতার কোনও কোনও অংশও এখন তুলে দেওয়া হচ্ছে, মাঝে মাঝে গান থামিয়ে কবিতার অংশগুলো সমবেত কণ্ঠে

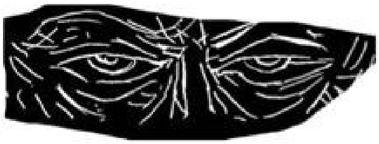

মঙ্গলমঞ্চ কারা চালায়, এর পিছনে কে, জাঙ্গল-টেররিস্টরাও এর মধ্যে আছে কি না, নানা সূত্র থেকে জানবার জন্য গোয়েন্দারা মরিয়া।

আবৃত্তিও করা হচ্ছে। শুনতে শুনতে পরীক্ষিতের চোখে কোনও ভাবান্তর ফোটে না।

একদিন লিওনার্দো সরোজিনীর সঙ্গে এসে পরীক্ষিতের কপালে বটপাতার মতো তার বিরাট হাতের পাতা বুলোতে বুলোতে বলল, 'তোমার কয়েকটা কবিতা আমি আমার ভাষায় অনুবাদ করবার চেষ্টা করছি। কাজটা কঠিন।'

পরীক্ষিতের দৃষ্টিতে আগ্রহ লক্ষ করে লিওন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, পরীক্ষিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলল, 'এক বক্স হোমিওপ্যাথি ওষুধ আর একটা গাড়ি বা দুটো ঘোড়া যদি পেতাম— সব ছেড়ে অবনীজ্যাঠাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষকে আরোগ্য বিলোতাম।' একটু দম নিয়ে আবার বলল, 'জানো লিওন, বালিসোনার সবাই কোনও না কোনও অসুখে ভুগছে।'

পরীক্ষিৎ নিচু গলায় বলে চলল, 'অবনীজ্যাঠা ষোলটা ওষুধে অধিকাংশ রোগ সারিয়ে দিতে পারেন। বারোটা আমাকে শিখিয়েছেন, চারটে বাকি।'

কপাল থেকে লিওনের হাতটা টেনে নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে ধরে দু-তিনবার চাপ দিয়ে আবার বলল, 'তুমি পারবে লিওন। একটা ড্রাইভারসুদ্ধ গাড়ি বা দুটো ঘোড়া তুমি জোগাড় করে দাও। টাকার ব্যবস্থা আমরাই করব। ওষুধের দায়িত্বও আমার। অবনীজ্যাঠাকে একবার আসতে বলবে? একেবারে সরে আছেন!'

কথার শেষে পরীক্ষিৎ অনেকক্ষণ ধরে দম নেবার পর ক্লিষ্ট স্বরে বলল, 'অনেক কষ্ট দেখলাম, মানুষের কষ্ট দূর করার চেয়ে বড় কাজ আর নেই দাদা।'

এতদিন বিকেল হতে না হতেই সরোজিনীর বালসেনার দল চৌধুরীবাড়িতে তাদের লাইব্রেরিতে এসে ভিড় করত, সরোজিনীও তাদের জন্য একেক দিন একেকরকম খাবার নিয়ে বসে সকলের সঙ্গে গানে, গল্পে, বই পড়ার মজায়-আনন্দে কাটাত। চৌধুরীবাড়ির ওপর পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর নজরদারির গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের আর চৌধুরীবাড়িতে পাঠায় না। বর্তমানে বিপ্লবচিন্তার সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রাক্তন বিপ্লবীদের কেউ কেউ এই সেদিনও সরোজিনী বা পরীক্ষিতের কাছে আসত। তারাও আর আসে না। সরোজিনীই তাদের আসতে নিষেধ করে দিয়েছে। সে জানে তাদের ওপর নিশ্ছিদ্র গোয়েন্দা নজরদারি চলছে। পরীক্ষিৎ কোন কোন দেশে কোথায় কোথায় কাদের কাছে কেন গিয়েছিল তার সব তথ্য জানতে চায় তারা। এ জন্য গোয়েন্দারা জাহাজ কোম্পানিতে, বিমান সংস্থায় যাদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করছে তাদেরই একজন, দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়, গোপনে সরোজিনীকে এসব কথা জানিয়ে গেছে। মঙ্গলমঞ্চ কারা চালায়, এর পিছনে কে, জাঙ্গল-টেররিস্টরাও এর মধ্যে আছে কি না, নানা সূত্র থেকে জানবার জন্য গোয়েন্দারা মরিয়া।

বকুলবেদির কামরাঙাপাগল শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস বেদির চারপাশে সারা দিন শুধু ঠোঁট নেড়ে মুখের ভঙ্গিতে নেচে কুঁদে নীরবে কথা বলে যায়, চৌধুরীবাড়িতে বাইরের কাউকে ঢুকতে দেখলে শুধু তখনই তার সামনে লাফ দিয়ে পড়ে চোখ ঘুরিয়ে চিৎকার করে ওঠে— 'খবরদার! ঠাকুররে কামরাঙা না দিয়ি ঠাকুরবাড়ি ঢুকতি পাবা না!' আগন্তুক ভয় পেয়ে গেলে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, 'ঠাকুররে কামরাঙা না দিলি কি চলে রে পাগলা!' তারপরই হুংকার— 'নাম কী? আসছ কোত্থেকে?'

পাগলের লম্ফঝম্ফ হুংকারে ভয় না পেলে বলবে, 'কে হে তুমি? কৃছিজীবি, না মচ্ছজীবি, না বুদ্ধিজীবি, না বন্দুকজীবি, না বিছুটিজীবি?'

'সোমবারউলি বুড়ি' সত্তর বছর ধরে প্রতি সোমবার চৌধুরীবাড়ির দরজা থেকে এক মুঠো চাল আর তিনটে আলু নিয়ে যায়, শেষ ক'বছর একটা করে মিষ্টি রুটিও দেওয়া হচ্ছিল। কামরাঙাপাগলের হুংকার শুনে সেই যে একদিন ভয় পেয়ে চলে গেল, তারপর থেকে আর সে ভিক্ষে নিতে আসে না।

একদিন দুপুরে পাগলের তর্জনগর্জনের সঙ্গে মেয়েকণ্ঠের হাউমাউ কান্না শুনে ভণ্ডুল বেরিয়ে এসে দেখল দরজার সামনেই মাঝবয়সি এক বিধবাকে কামরাঙাপাগল লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, আর ধমকে চেঁচিয়ে বলছে, 'নাম কী? ঘর কোথায়? কামরাঙা না দিলি ভেতরে যেতি পারবা না!'

ভণ্ডুলকে দেখে তারই পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিধবা জানাল উদ্বাস্তু বালিকা বিদ্যালয় থেকে তার মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তিনটে অচেনা ছেলে মেয়েটাকে টেনে-হিঁচড়ে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেছে। তার মাথার ঠিক নেই, সে প্রথমে এখানেই ছুটে এসেছে, বউরানি নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন। ভণ্ডুল লাফিয়ে পা সরিয়ে নিল। তাকে ভেতরে নিয়ে যাবার আগেই সরোজিনী, নীলাঞ্জনা ও মিতা পরীক্ষিতের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বসতে দিল। বিধবা চোখের জল অফুরান হওয়া সত্ত্বেও বার বার মোছার চেষ্টা করে মিতাকে দেখে বলল, 'আপনাগো দয়াতেই নিরুপমা অ্যাৎটা পথ আইতে পারসে, আপনার স্কুলেরই মাইয়া, ওরে আপনারা বাঁচান, মাগো!'

মিতা তার ছাত্রীর নাম শুনে বলে উঠল, 'নিরুপমা ক্লাস ইলেভেনে পড়ে না? থানায় জানিয়েছেন?'

নিরুপমার বিধবা মা ডাইনে-বাঁয়ে মাথা এত ঝাঁকালো, যে তার চোখের জল ছিটকে মিতার কনুইয়ে এসে লাগল। সে উত্তেজিত হয়ে বিধবার হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, 'এক্ষুনি চলো, থানায় যাব!'

থানার ডিউটি অফিসার দুষ্কৃতীদের দেখতে ঠিক কীরকম জানতে চায়। লম্বা না বেঁটে, কালো না ফর্সা, কপাল সরু না চওড়া, নাক তীক্ষ্ণ না বোঁচা, চুল বড় বড়, না ঘাসছাঁট, ঘন না পাতলা, কালো না কটা, গোঁফ আছে, না নেই, দাড়ি ফ্রেঞ্চকাট না কামানো, না খোঁচা-খোঁচা, না ছাগলদাড়ি, গালে কপালে কাটা দাগটাগ আছে, না ভদ্র চেহারা, কথা বলছিল বাংলায়, না হিন্দিতে, না তেলুগুতে— তিনজনের বিষয়ে আলাদা আলাদা সব প্রশ্নের উত্তর ভীত শংকিত বিধবা যতটা মনে করতে পারল বলল।

লেখা হয়ে গেলে অফিসার বললেন, 'দুটোকে তো চিনতে পারছি, আপনাদের অবনীমোহন চৌধুরীর ওপর যারা অত্যাচার করেছিল তাদেরই দুজন। ও কেসটার সব আসামীই তো এখন বেইল-এ, সেটাই সেলিব্রেট করছে আর কী! নিরুপমাদেবীর একটা ফটো

দিয়ে যাবেন। এনেছেন নাকি?'

'সঙ্গে তো নাই, আইজই দিয়া যামু।'

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দরজায় দরজায় ছুটোছুটি করে, এখানে ওখানে ধরনা দিয়ে মেয়ের সঠিক কোনও খবর পাওয়া গেল না। তৃতীয় বছরের মাঝামাঝি পুলিশ অফিসার জানাল নিরুপমাকে খুব সম্ভব মিডল ইস্টে পাচার করে দেওয়া হয়েছে, এবিষয়ে বেশ কিছু তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে। তবে নিশ্চিত হতে আরও তদন্ত দরকার।

আসামীরা প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস হয়ে গেল।

নিরুপমার মা দীপান্বিতা দেশ ভাগের সময় নিজের স্বামীকে হারিয়েছে, দেশের এক ভাগ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে আরেক ভাগে এসে মেয়েকে হারাল।

গানের মিছিলে এই ঘটনায় গভীর বেদনা ও তীব্র ধিক্কার জানিয়ে লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে হাতে ঘুরতে দেখা গেল। সরোজিনীর নিজের হাতে লেখা আলাদা রকম কোনও কোনও প্ল্যাকার্ড দেখে পথচলতি অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়ছে। সে নিজেও অস্থির। পায়ের ব্যথার জন্য বারণ করা সত্ত্বেও মিছিলের পুরোভাগে হাঁটবেই। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীর চাপে ভুবনমোহনের তেপায়া লাঠি নিতে বাধ্য করা হল তাকে।

পরীক্ষিৎ তার বাবার ক্রাচে ভর দিয়ে কোনওরকমে কয়েক পা গিয়ে আধাসেনার ক্যাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে মিছিলের যাত্রা শুরু দেখল। তারপর সারা রাত জেগে সে তার নতুন বিষাদগাথা লেখায় ডুবে রইল।

মর্মান্তিক নিরুপমা-বৃত্তান্ত এরপর নানা জনের হাতে নানা ভাষায় নানা জায়গায় লেখা হতে লাগল। বালিসোনা থেকে বড় শহর পর্যন্ত সব দোকানে বাজারে স্টেশনে প্রচুর পোস্টারও পড়ল। নিরুপমার অন্তর্ধান রহস্য পুজোর ছুটির আগেই নতুন করে হাইকোর্টে বিচারের জন্য গৃহীত হল।

ছুটির পর কোর্ট খোলার আগেই, দেওয়ালির পরদিন, বিবস্ত্র দীপান্বিতাকে বটবৃক্ষের পিছনে বসে কাঁদতে দেখে ওই বনাঞ্চলের ছাগলের পাল তাদের রোজকার লতাগুল্ম ছেড়ে কিছুটা দূরে বিচরণ করতে লাগল।

তখন থেকেই চোখের সামনে কুকুরকে ঢিল মারতে দেখলে বা লরির চাকায় বিড়াল চাপা পড়লে বা কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে, সারা দিন এরকম সব কিছুতে 'এয়া নি মান্ষের সয়!' বলা দীপান্বিতার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেল।

কামরাঙাপাগলের দেখা নেই। তিনদিনের অনুপস্থিতির পর একদিন ভোরে রেললাইনের ধারে মুণ্ডু ও দুহাত কাটা অবস্থায় তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। বুকের ওপর একটা সাদা কাগজে

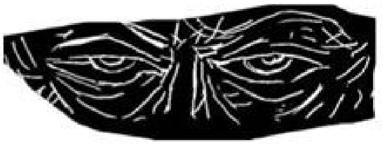

দেওয়ালির পরদিন, বিবস্ত্র দীপান্বিতাকে বটবৃক্ষের পিছনে বসে কাঁদতে দেখে ওই বনাঞ্চলের ছাগলের পাল তাদের রোজকার লতাগুল্ম ছেড়ে কিছুটা দূরে বিচরণ করতে লাগল।

লাল রঙে লেখা— পুলিশের চরের উপযুক্ত শাস্তি।

ভোরে জোর কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙেই পরীক্ষিতের মনে হল এ নিশ্চয়ই জাহাঙ্গীর। এবার তার মাথার সব চুল সাদা। চুল সাদা হবার কারণ আর এবারের দিগভ্রষ্ট সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা সে এভাবে শুরু করল— 'গাঢ় কুয়াশায় সমুদ্রে পথ হারিয়ে জাহাজ একটা জমাট কুয়াশার দ্বীপে গিয়ে ভেড়ে। সেখানে তিন মাস থাকার সময় মাথার সব চুল কুয়াশার মতোই সাদা হয়ে গেল। সেই দ্বীপে দ্রাগো নামে তিন হাজার বছরের প্রাচীন একটা গাছ আছে। গাছের নীচে এক অতিবৃদ্ধ সাধুর মূর্তির সামনে দ্বীপবাসীরা দণ্ডীকাটার মতো শুয়ে পড়ে তাদের জীবনের তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়ে প্রার্থনা করে। আমি জানতে চেয়েছিলাম আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোনটি? কেউ যেন কানে কানে বলে গেল— লজ্জাবতী-ময়নামতী দুজনকে নিকা করে জাহাজে না নিয়ে যাওয়া আমার সবচেয়ে বড় পাপ। আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো কাজ কী? ওদের জন্মান্ধ ভাইকে দৃষ্টিদান। আরও অনেক প্রশ্ন মনে ভিড় করে আসছিল, কিন্তু তিনটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। আমি তৃতীয় প্রশ্ন করলাম— আমার ইন্তেকাল কবে?'

'উত্তর পেলেন?'

'পেলাম। এই তিন প্রশ্নের উত্তর আরও আগে পেলে জীবনটা আরেকটু সুন্দর করে গড়তে পারতাম।'

পরীক্ষিৎ ব্যথাতুর স্বরে বলল, 'ওই দ্বীপে আমিও কি যেতে পারি না?'

'আমার পুরো একটা জীবন লাগল। তোমার জীবনের এখনও অনেক বাকি। দ্যাখো চেষ্টা করে, হয়তো একদিন পারবে। আশ্চর্যের কথা কী জানো, ওটা মূর্তি, না মানুষের ফসিল, বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা বড় কঠিন। কুয়াশা মাথায় নিয়ে দিনের পর দিন চোখে চোখ রেখে বসে থাকতে থাকতে মনে হয় মূর্তির চোখের পাতা হঠাৎ হঠাৎ নড়ে উঠছে। দ্বীপবাসীদের বিশ্বাস, ওটা সাধুর মূর্তি না, স্বয়ং সাধু। তাঁরও বয়েস নাকি গাছটির মতোই আড়াই তিন হাজার বছর!'

সকালে জাহাঙ্গীরকে কোথাও দেখা গেল না। ভোরে কেউ কোনও কড়া নাড়ার শব্দও নাকি শোনেনি।

শীতের শেষে বসন্তের সূচনায় শুভ এসে জানাল সে তার দুই দিদিকে জাহাজে নিয়ে যাবে। জাহাজে তারা রান্নাবান্নার কাজ করবে।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করল, 'জাহাঙ্গীর এলেন না? তাঁর মত আছে এতে?'

'জাহাঙ্গীর সাহেব তো গত মাসে সমুদ্রেই মারা গেছেন। তাঁর জাহাজের ব্যবসা তাঁর শিক্ষামতো এখন আমিই দেখি। দিদিদের নিয়ে যাবার কথাও তিনিই আমাকে বলে গেছেন।'

ব্যাগ থেকে কড়ে আঙুলের মতো ছোট্ট একটা শুকনো শেকড় বের করে পরীক্ষিতের হাতে দিয়ে বলল, 'জাহাঙ্গীর সাহেব এটা আপনার বাবার সমাধিতে পুঁতে দিতে বলেছেন। এর মধ্যেই নাকি তিনি আছেন, পরকালেও তাঁর জাহাজের দোস্তকে পাহারা দেবেন।'

নীলাঞ্জনা সেদিনই সব ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। দুই বোনের ডাক্তারি পরীক্ষা, নতুন পোশাকের ব্যবস্থা, দেহ ও গৃহের পরিচ্ছন্নতা শেখানো— সব কিছুতেই মন দিতে হয় তাকে।

একদিন দুজনকে নিয়ে একটা জেনারেল ডায়েরি করাতে থানায়ও যেতে হল। অভিযোগ— কিছুদিন আগে লজ্জাবতী-ময়নামতীকে ভয় দেখিয়ে তাদের নগ্ন ছবি তোলাতে বাধ্য করা হয়েছিল। সে-ছবি কোনও-না-কোনও ভাবে কপি, প্রদর্শন, বিক্রি বা বিতরণ করা হতে পারে বলে তাদের আশংকা।

ডায়েরি লিখতে লিখতে অফিসার বলল, 'এসব কি কেউ প্রকাশ্যে করে! স্মাগলিংয়ের মতো এও এক গোপন ব্যবসা।' লেখা শেষ করে সোজা নীলাঞ্জনার চোখে চোখ রেখে যোগ করল, 'খোঁজ পেলে খবর দেবেন, পুলিশ রেইড

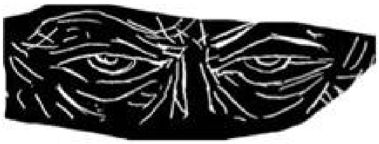

বালিসোনায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম বিয়ের নামই হয়ে গেছে 'সন্তানোত্তর বিয়ে'। শিক্ষাদীক্ষাহীন লোকেরা বলে, 'বাছুরসুদ্দু গোরু নিয়ে গেল!'

করতে যাবে।'

পরীক্ষিতের সঙ্গে নীলাঞ্জনার বিয়ের পর থেকে সমাজতাত্ত্বিক-গবেষক, মহিলার অবৈধ সন্তানের কারণে তার প্রতি পুলিশের ভয় ও সমীহ ভাব অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। থানার পদস্থ পুলিশ অফিসাররা তাকে একটু নিচু চোখেই দ্যাখে। বালিসোনায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম বিয়ের নামই হয়ে গেছে 'সন্তানোত্তর বিয়ে'। শিক্ষাদীক্ষাহীন লোকেরা বলে, 'বাছুরসুদ্দু গোরু নিয়ে গেল!'

নীলাঞ্জনার নিজের সাজসজ্জা সাধারণ, লখনউয়ের শালোয়ার-কামিজের বদলে বালিসোনায় হালকা একরঙা শাড়ি, কিন্তু লজ্জাবতী-ময়নামতীকে সাজিয়েছে তার রুচি ও কল্পনা উজাড় করে। দুই বোনের মুখের ত্বকের তিক্ততা ও কাঠিন্যের ছাপ মুছিয়ে নীলাঞ্জনা তাদের আগেকার প্রাকৃতিক লাবণ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। তবে যেহেতু এ-অঞ্চলের অনেকেই তাদের চেনে, তাই পথে কোনও অশান্তির আশংকায় দুজনেরই আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা।

দুজনকে বসানোও হয়েছে পর্দাঢাকা রিকশায়। শুভ বসেছে পিছনের আলাদা রিকশায়। তারও পিছনে একটা মাতাল 'ওরে আমার ময়নামতী, আমায় ফেলে চললি কোথায়' বলে কাঁদতে কাঁদতে রিকশা ধরার বৃথা চেষ্টায় অনেক দূর এসেও তাদের রিকশা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

রিকশা আটকাল পুলিশ ব্যারিকেডে। আগের দিনই খবরের কাগজে বেরিয়েছিল— প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচর সংস্থার মদতে সাতজন বিস্ফোরণ-প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসবাদী বালিসোনা, অন্নদাসী, কীর্তনখোলা, সোনাগুঁড়া, বামুনগ্রাম, প্রজাপতিপুর— প্রভৃতি গ্রামে চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকেছে, উদ্দেশ্য শহরের বড় কয়েকটা রেলস্টেশনগুলো উড়িয়ে দেওয়া।

সকাল থেকেই স্টেশন রোডের মুখে রাস্তা আটকে একদল পুলিশ বাস লরি গাড়ি থামিয়ে ভেতরে সন্দেহজনক কেউ আছে কিনা দেখে তবেই যেতে দিচ্ছে। খোলা রিকশা ছেড়ে দিলেও পর্দাঢাকা রিকশার ছাড় নেই। লজ্জাবতীদের রিকশার পর্দা তুলে বোরখা ঢাকা দুজনকে দেখে একজন মেয়ে কনস্টেবল শিমুলগাছের গুঁড়ির আড়ালে নিয়ে গিয়ে বডি সার্চ করে দুজনকেই ভদ্র নিরীহ মুসলমান বলে নিশ্চিত হয়ে ছেড়ে দিল।

৩২

'মানুষের কুৎসিত মন দেখিলাম, বিবেকহীন সমাজ দেখিলাম, উদাসীন বিচারব্যবস্থা দেখিলাম, আর আমার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। তোমরা আমাকে ক্ষমা করিয়ো।'

বালিশের নীচে চিরকুট রেখে কখন রাতে উঠে গেছে, সরোজিনী টের পায়নি। অনেক রাত অব্দি পায়ের ব্যথায় জেগে শেষ দিকে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল সে।

বকুলশাখা থেকে তাকে ঝুলতে দেখে জীবনে প্রথম সরোজিনী জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

অবনীমোহনের সুদীর্ঘ শেষযাত্রার প্রথমেই সাদা কাপড়ের ওপর খুব বড় বড় করে লেখা তাঁর শেষ কথা ক'টি দুপাশে দুজন পতাকার মতো ধরে বয়ে নিয়ে চলল। শবযাত্রা যত এগোয় তার দৈর্ঘ্যও তত বাড়ে। রাস্তার দুপাশের ভিড় বাড়ে আরও বেশি। বালিসোনার নতুন পুরনো সব চওড়া রাস্তা ঘুরে দিনের শেষে মিছিল এসে থামল রাসমাঠে। সেখানে তার ভাইয়ের পাশে তাকে সমাধি দেওয়া হবে।

তিনদিন পরই রবিবারের সংগীতমিছিল। এসপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখতে লক্ষ্মী-সরস্বতী-নীলাঞ্জনা-লিওনের অনেক অনুরোধেও সরোজিনী রাজি হল না। সকলের নিষেধ উপেক্ষা করে ভুবনমোহনের তেপায়া লাঠি ভর করে পরীক্ষিৎকে পাশে নিয়ে সে যথারীতি মিছিলের সামনে পরীক্ষিতের মতোই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। তার পিছনেই লক্ষ্মী-সরস্বতীর হাতে অবনীমোহনের শেষ কথাগুলো লেখা বড় পতাকা। অবনীমোহনের আত্মহত্যার একুশ দিন পরে পরীক্ষিৎ তার বিষাদগাথায় সংগীতমিছিলের সমবেত এই গানকে বজ্রগর্জন ও বেহালার মূর্ছনা বলে উল্লেখ করেছিল।

মিছিল থেকে ফেরার সময় সরোজিনীর পায়ের যন্ত্রণা লুকনো গেল না। বাড়ি ফিরে দেখা গেল ডান পায়ের গোড়ালি থেকে আঙুলের গোড়া পর্যন্ত পুরো পা বেলুনের মতো ফোলা।

হাসপাতালের ডাক্তার এসে পায়ের অবস্থা দেখে অবিলম্বে অপারেশনের ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন, কিন্তু সরোজিনী তাতে রাজি না। বালসেনাদের নিয়ে তার আনন্দপাঠ আগের মতোই চলতে লাগল।

পরের রবিবার যেভাবেই হোক সংগীতমিছিলে যাওয়া আটকাতে ভোর-ভোর লক্ষ্মী-সরস্বতী আর নীলাঞ্জনা সরোজিনীর কাছে ছুটে এল। পরীক্ষিৎ আগের বারের মতো এবারও সরোজিনীর কোনও কাজে বাধা দেওয়ার বিপক্ষে।

তিনজনে সরোজিনীর ঘরে ঢুকে দেখল, তখনও তার ঘুম ভাঙেনি। মিছিলের সময় হয়ে যাচ্ছে দেখেও সেদিন তিনজনের কেউ আর মিছিলে গেল না।

পরীক্ষিৎ বেরবার আগে সরোজিনীর যাওয়া না-যাওয়া বিষয়ে জানতে এসে, সে-ও আর সেদিন মিছিলে যাবার উৎসাহ পেল না, পায়ের কাছে বসে তার রাঙাজেঠিমার নরম গোলাপি পাথরে বানানো অদ্ভুত শান্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার মনের মধ্যে একটা বিস্ফোরক অনুভূতির সঙ্গে দূরাগত কাগজপোড়া গন্ধও মিশে আছে।

আগের রবিবারে মিছিলে হেঁটে সরোজিনীর পা ফোলার পর থেকে চিরন্তনী রোজই দিদিমার মাথার কাছে, বুকের কাছে শুয়ে বসে অনেক রাত পর্যন্ত তার সঙ্গে গল্প করে। কথা দিদিমাই বলে, বেশির ভাগ সময় সে শুধু মনোযোগী শ্রোতা। কালও সে ঘুমিয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত দিদিমা গানের মিছিল নিয়ে অনেক কথা বলছিলেন। তাঁর বিশ্বাস বালিসোনার সব মানুষই একদিন এই গানের মিছিলে শামিল হবে। পুরো বাংলাই একদিন বালিসোনার পথে হাঁটবে, বালিসোনার গান গাইবে। সকালে ডাকাডাকিতে চিরন্তনীর ঘুম ভাঙলেও তার পিঠে রাখা সরোজিনীর হাতে জাগার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

ডাক্তার এক মুহূর্ত দেখে বললেন, 'কষ্ট যা পেয়েছেন— পায়ে, কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণা ওঁকে ছুঁতে পারেনি। ঘুমের মধ্যেই হার্ট ফেল করেছেন! অবনীবাবু চলে যাবার পর হয়তো আর বাঁচতেও চাননি।'

খবর পেয়ে নিরুদ্দেশ নিরুপমার মা দীপান্বিতা

এসে 'এয়া নি মান্‌ষের সয়!' বলে সরোজিনীর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

তার শেষযাত্রার পুরোভাগে তার বালসেনার দল, তার পিছনে লক্ষ্মীদের আর শিবকৃষ্ণবাবুর স্কুলের ছেলে-মেয়েদের দীর্ঘ মিছিল, তার পিছনে বালিসোনার আবালবৃদ্ধবণিতা। সবার শেষে চৌধুরীরা প্রায় সকলে। হাসপাতালের পাশ দিয়ে মিছিল যাবার সময় ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মীদের অনুরোধে ফুলে-ঢাকা সরোজিনীকে সামনেই বাদামগাছের তলায় নামানো হল। অনেক রোগীও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সরোজিনীর মুখটুকু ছাড়া সবটাই ফুলে ছাওয়া, তার ওপরেই হাসপাতালের সবার পুষ্পাঞ্জলি দান শেষ হলে মিছিল আবার নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

সূর্যাস্তের অনেক আগে লক্ষ্মী-নীলাঞ্জনা বালসেনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোর করছে, পরীক্ষিৎ কাছে এসে বলল, 'এদের ঘরে ফেরাবার দায়িত্ব আমাকে দেবে?'

'মা'র শেষযাত্রায় শেষ অব্দি থাকবে না?'

'আমি সইতে পারছি না লক্ষ্মীদি।' পরীক্ষিতের গলা বুজে আসে।

রাতে বাড়ি ফিরে সকালের কাগজপোড়া গন্ধের উৎসের খোঁজ পাওয়া গেল। রাঁধুনি জানাল পর পর তিনদিন রাত জেগে সুষমা বিদ্যালয়ের বচ্ছরকার উৎসবের জন্য বাতাসা আর নকুলদানা বানিয়ে বাকি রাতটুকু সে রান্নাঘরেই শুয়েছে, গতকালই প্রথম নিজের ঘরে গিয়েছিল। ভোরে উনুনে আঁচ দিতে এসে দ্যাখে ভেতরে তিনটে খাতা একদম পুড়ে গেছে, বাকি একটা খাতা তখনও পুড়ছে। জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে আধপোড়া খাতাটা সে শুকোতে দিয়েছে। পরীক্ষিৎ দেখল মলাটে তখনও 'ঋণী সরোজিনী' লেখাটা পড়া যায়। ভেতরের পাতার বেশির ভাগ অংশই পুড়ে কালো হয়ে গেছে। মাথার দিকে না-পোড়া লেখারও কোনও লাইন আস্ত নেই। সম্পূর্ণ দগ্ধ তিনটে খাতার দুটোর কালো হয়ে যাওয়া মলাটের একটায় 'বিরহিনী সরোজিনী', আরেকটায় শুধু 'বালিসোনার' কথাটা কালো পাথরে ছুরির লেখার মতো ফুটে আছে। পরীক্ষিৎ ভাবে রাঙাজ্যাঠাইমা কি তাঁর মৃত্যু আগে থেকেই জানতেন, নাকি এ তাঁর স্বেচ্ছামৃত্যু?

তার আধপোড়া খাতার ভাব-ভাষার ভগ্নাংশগুলি নানাভাবে সাজিয়ে রাতের পর রাত সম্ভাব্য অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করা তার নেশায় দাঁড়িয়ে গেল।

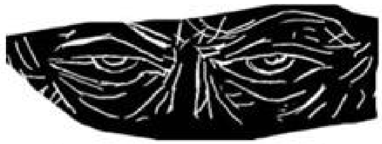

দুভাইকে জেলেদের সঙ্গে নৌকো বাইতে দেখা গেছে শুনে মিতা নীলাঞ্জনার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে ফিস ফিস করে বলেছিল— 'বাদার কুবাতাস ওদের গায়ে লাগতে দিয়ো না তুমি। ও-বাতাস লাগলে পিঠে পাঁচ ক্ষত নিয়ে ওরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে গো!'

৩৩

অরণ্য কলেজে ভর্তি হবার বছরে নতুন নতুন বন্ধুর সঙ্গে দুটি জ্যান্ত পুতুলও পেল। নীলাঞ্জনার যমজ ছেলে-দুটি পুতুলের মতো আদরে-খেলায় বড় হতে লাগল। এক দশকেই দুভাই সকলের মুখে মুখে হয়ে উঠল রূপকথার লালকমল আর নীলকমল।

তাদের দৌরাত্ম্য আগে থেকে কেউ আঁচ করতে পারে না। দুভাই যখন বাড়ির পিছনের বাগানে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হয়ে কী ভাবে, তারও নাগাল পায় না কেউ। তাদের চার চোখে কখন কী খেলে বেড়ায় শুধু তারাই জানে। কখনও স্বপ্ন, কখনও দুঃখ, কখনও দুষ্টুমি— না ঘুমনো পর্যন্ত ভাবের আনাগোনা চলতেই থাকে। যত দেখে পরীক্ষিতের মন ততই তার নিজের শৈশবে ফিরে যায়, নীলাঞ্জনার মন শংকায় ভরে ওঠে।

মিতা কিছু দেখেও না, শোনেও না। রেডিওয় চাকরির একটা সময় রোজ ভোরে তাকে গীতাপাঠ করে শোনাতে হত। পুরো ভগবদ্গীতা তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেই স্মৃতি, সেই স্বর সে ফিরে পেয়েছে। সবসময় পায়চারি করতে করতে সুন্দর কণ্ঠস্বরে গীতাপাঠ করাই এখন তার একমাত্র দিনযাপন।

গত বর্ষাতেও বাদায় দুভাইকে জেলেদের সঙ্গে নৌকো বাইতে দেখা গেছে শুনে মিতা নীলাঞ্জনার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে ফিস ফিস করে বলেছিল— 'বাদার কুবাতাস ওদের গায়ে লাগতে দিয়ো না তুমি। ও-বাতাস লাগলে পিঠে পাঁচ ক্ষত নিয়ে ওরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে গো!'

এখন আর কিছুই বলে না। সারা গায়ে-মাথায় পাঁক মাখা দুভাইকে শক্ত হাতে বাহু ধরে টেনে এনে মইনুদ্দিন যখন বাইরের উঠোনে গীতাপাঠরত বউরানিকে পেয়ে নালিশ করল যে বাবুর বাড়ির এই খোকাবাবুরা আমাদের ঘরের ছেলে-পিলেদের সঙ্গে বাদার পাঁক ঘেঁটে মাছ ধরছিল, তখনও মিতা এক মুহূর্ত পায়চারি থামায়নি, গীতাপাঠও বন্ধ করেনি।

নীলাঞ্জনা তাদের ধরে দীঘিতে চুবিয়ে আনতে গেল। সেখানেও দুই ভাই মায়ের হাত ছাড়িয়ে এপার-ওপার সাঁতরে দীঘি তোলপাড় করতে লাগল।

রাতে পরীক্ষিৎ লেখা থামিয়ে দেওয়ালের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখে নীলাঞ্জনা পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে বলল, 'তুমি জন্মান্তর মানো?'

প্রশ্নটা বুঝতে সময় নিয়ে পরীক্ষিৎ বলল, 'মানব কি, ওবিষয়ে কিছু জানিই না।'

'অরণ্য আগের জন্মে কী ছিল, কোথায় ছিল জানি না, এ জন্মে আমার কাছে এসেছে সূর্যাস্তের সময়। হয়তো সেই জন্যই ও সূর্যাস্তের মতো শান্ত।'

'তোমার তা-ই মনে হয়?'

উত্তর না দিয়ে নীলাঞ্জনা বলে গেল, 'এই বিচ্ছু-দুটোকে দ্যাখো, সব সময় কালবৈশাখীর মতো, কোন দিকে কী ভাঙবে-চুরবে, তার ফন্দি আঁটছে। নয়তো ঝড়ের আগের মতো থম মেরে আছে।'

পরীক্ষিৎ লিখতে লিখতে মুখ তুলে, নীলাঞ্জনার কথা মন দিয়ে শুনে বলল, 'প্রত্যেক মানুষই বোধহয় এক-একটা আলাদা ইউনিভার্স।'

'বাচ্চারা বাঁদরামো করছে, তার মধ্যে আবার ইউনিভার্সের কী দেখলে? তুমি জানো— লক্ষ্মীদিদের কচি-কচি লাউভরা চারটে লাউগাছে বাড়ির ছাদ ঢেকে গিয়েছিল, পরশু দুপুরে বাঁদর-দুটো গিয়ে ছুরি দিয়ে দুটো গাছের গোড়া কেটে সেখানে মুখ লাগিয়ে নাকি জল তেষ্টা মিটিয়েছে! এত জল বেরিয়েছে যে উঠোন কাদা-কাদা হয়ে গেছে। লিওন এসে না পড়লে হয়তো বাকি গাছ দুটোর গোড়াও কাটত। লিওনকে কী বলেছে জানো? লাউগাছের ওরকম শুকনো লাঠির মতো শরীরে এত জল

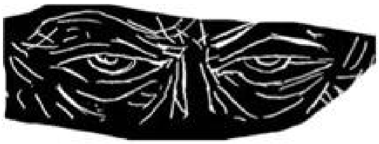

'মনে লাগছে এখানে শঙ্খচূড়ও আছে। দুটোর তো শঙ্খ লেগেছে মনে হচ্ছে। একবার দেখব বাবু?'
শুনে উপস্থিত গ্রামবাসীদের কয়েকজন নতুন গামছা আনতে ঘরমুখো ছুটল। শঙ্খ লাগা সাপের যুগলমূর্তি নতুন গামছায় এসে খেলা করে গেলে সে গামছা নাকি গৃহস্থের সংসারে সৌভাগ্য আনে।

পোরা আছে দেখে তারা অবাক হয়ে গেছে। বাকি দুটোর গোড়া কেটেও উঠোনে ছোট্ট একটা পুকুর করা যায় কি না সেটা দেখারও খুব ইচ্ছে।'

পরীক্ষিৎ ভাবে, তার বাবা কি তার এই দুই ছেলের মধ্যে ফিরে এল! জন্মান্তর সত্যি আছে কিনা সে জানে না। থাকলে ভালো হত।

শ্রাবণ মাসের পঞ্চমীতে ঝাঁপান উৎসবের দিন একদল বেদে-বেদেনী এসে চৌধুরীবাড়ির দরজায় 'কই গো, মা কই?' বলে হাঁক পেড়ে দাঁড়াল। আগের দুবার সরোজিনী এদের তাড়িয়ে দিয়েছিল, এবার সাহস করে তাকেই ডাকল হয়তো।

মনসা পুজো উপলক্ষে বালিসোনায় পাঁচশো বছরের পুরনো এই ঝাঁপান উৎসবে আশপাশের অনেক জেলার মানুষ এসে ভিড় জমায়। কত্তামায়েদের পরিচিত তেমনই কেউ হয়তো এসেছে মনে করে ভণ্ডুলরা কয়েকজন বাইরে আসতে একটা শক্ত পাকানো চেহারার বেদে এগিয়ে এসে বলল, 'তোমাদের বাড়িতে শাখামুটি আর তার বউ চামরকষা বাসা বেঁধেছে।'

এক যুবতী আগ বাড়িয়ে জানাল, 'শাখামুটির ছোবলে যদি বা বাঁচো, চামরকষার এক ছোবলে শরীল নিমেষে নীল হয়ে যাবে। যদি বলো, আমরা ধরে নিয়ে যাই।'

ভণ্ডুল তেড়ে উঠে বলল, 'তোমরা আগেও বার কতক এসেছিলে না? কত্তামা তাড়িয়ে দিয়েছিলেন!'

মেয়েটা পায়ের কাছ থেকে ঝাঁপি খুলে একটা সাপের লেজ ধরে তুলে সাপের মতোই হিসহিস করে বলল, 'এই দ্যাখ চামরকষা। তোদের বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে যাই?' আরেক হাতে আরেকটা সাপ তুলে বলল, 'এই দ্যাখ শাখামুটি।'

নীলাঞ্জনা-পরীক্ষিতের সঙ্গে লালকমল-নীলকমলও বেরিয়ে এসেছে।

শাখামুটির সারা গায়ে কালো-হলুদ ডোরা, চামরকষার গায়ে হালকা সবুজের সঙ্গে সাদা ডোরা।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি সাপখেলা দেখাতে এসেছ?'

'না বাবু, আপনাদের বাড়িতে একজোড়া শাখামুটি-চামরকষা বাসা বেঁধেছে। আমরা ধরে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'বাড়ির কোথায়, তোমরা জানো? কোন ঘরে বলতে পারবে?'

'না বাবু, ঘরে না, বাগানে।'

কালো-হলুদ, সাদা-সবুজ ডোরা দেখে লালকলম-নীলকমল একসঙ্গে 'কী সুন্দর' বলে হাত বাড়াল— 'আমিও ওরকম লেজ ধরে নাচাব।'

নীলাঞ্জনা লাফিয়ে দুজনের সামনে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল— 'খবর্দার না!'

পরীক্ষিৎ তর্জনী তুলে হাতে ধরা সাপ দুটো দেখিয়ে বলল, 'ঝাঁপিতে ঢোকাও। যাও, বাগানের সাপ ধরে নিয়ে চলে যাও।'

একজন প্রবীণ বেদে পরীক্ষিতের সামনে এসে বলল, 'বাড়ির চারপাশ শুঁকে আর কোনও সাপ এখানে আছে কি না আমি বলে দিতে পারি। এখান থেকেই মনে হচ্ছে কাছেই পুকুরপাড়ে একটা তেঁতলে কেউটে সোজা লেজের ওপর ভর দিয়ে উঠে কিছুটা দূরের কাউকে ছোবল মারবার তাল করছে।' আকাশে মুখ তুলে বড় বড় কয়েকটা শ্বাস নিয়ে যোগ করল, 'মনে লাগছে এখানে শঙ্খচূড়ও আছে। দুটোর তো শঙ্খ লেগেছে মনে হচ্ছে। একবার দেখব বাবু?'

শুনে উপস্থিত গ্রামবাসীদের কয়েকজন নতুন গামছা আনতে ঘরমুখো ছুটল। শঙ্খ লাগা সাপের যুগলমূর্তি নতুন গামছায় এসে খেলা করে গেলে সে গামছা নাকি গৃহস্থের সংসারে সৌভাগ্য আনে।

বেদেনী দুহাতের সাপ ঝাঁপিতে পুরতে পুরতে নীলাঞ্জনার উদ্দেশে বলল, 'সাপধরা তো ভালো, মা, ওদেরও আমি শিখিয়ে দিতে পারি।'

'তোমাদের কাজ সেরে চলে যাও! আর কখনও এখানে আসবে না।' বলে দুই ছেলেকে হাত ধরে টেনে নিয়ে নীলাঞ্জনা ভেতরে চলে গেল।

ঘরে ঢুকে দুজনকেই পর পর সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'সুন্দর সুন্দর বলে ঝাঁপ দিচ্ছিলি, সুন্দরের মধ্যে কী মারাত্মক বিষ আছে তোরা জানিস? এখনও আমার সারা গা কাঁপছে!'

অরণ্য জেলা-লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে এসে ভারি ভারি বইগুলো টেবিলে নামিয়ে রেখে পুরো ঘটনাটা শুনল, তারপর দুভাইয়ের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'আমার বুদ্ধি আছে, সাহস নেই, তাই অনেক কিছুই করতে পারি না। তোদের সাহস আছে বুদ্ধি নেই, তাই সব কিছুই করতে যাস।'

পরীক্ষিৎ-নীলাঞ্জনাও তাদের বৃথাই অনেক বোঝাল।

শনিবার নিঝুম দুপুরে স্কুল থেকে ফিরেই দুভাই গোয়ালে ঢুকে অভ্যেসমতো সরাসরি গোরুর বাঁট থেকে দুধ খেতে গিয়ে থেমে গেল। কালো গোরু চোনা ও গোবর ছেড়েই চলেছে, চোখ দুটো ওল্টানো, চেনা হাম্বার বদলে গলা থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বের করছে। সবুজ-সাদাডোরা একটা সাপকে গোয়ালের নর্দমার গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে নীলকমল লাফিয়ে গিয়ে সাপটার ল্যাজ ধরে হ্যাঁচকা টানে বের করে এনে মাথাটা দেওয়ালে আছড়ে আছড়ে মেরে ফেলল।

'মা, মা, দ্যাখো; দাদা, দেখে যাও; বাবা দ্যাখো' বলতে বলতে দুই ভাই তিনজনের খোঁজে খানিক এঘর-ওঘর করল। তাদের না পেয়ে নন্দিনীকে মরা সাপটা দেখাল, তারপর মেঘাবৃতকে দেখাল, অনর্থক মিতার কাছে দেখাতে গেল। তারপর লালকমলের কাঁধে সাপটাকে ঝুলিয়ে ল্যাজটা নিজে ধরে থেকে সবাইকে দেখাতে দেখাতে লক্ষ্মীদের বাড়ির দিকে গেল।

কাঁধে ঝোলানো অত বড় একটা সাপ দেখে লক্ষ্মী চিরন্তনী দুজনেই আঁতকে উঠল। লিওন পুরো বৃত্তান্ত শুনে জিজ্ঞেস করল, 'গোরুটা বেঁচে আছে, না মরে গেছে?'

'তা তো আমরা দেখিনি। আমরা তো সাপটাকে মারতেই ব্যস্ত ছিলাম।'

দু-বাড়ির সকলে গোয়ালে গিয়ে দেখল গোরুটা মরে পড়ে আছে। ডান পায়ের খুরের একটু ওপরে যেন খোঁচা লেগে রক্ত

শুকিয়ে আছে।

লালকমলের কাঁধে সাপ, মাথাটা তার বুক অব্দি ঝুলে আছে, পিছনে ল্যাজ ধরে আছে নীলকমল— এই দৃশ্য দেখে অরণ্য মাথা ঘুরে পড়ে গেল, নীলাঞ্জনা আঁতকে উঠে চোখ ঢাকল, পরীক্ষিৎ শুধু ধীরে ধীরে পায়চারি করে চলল।

সপ্তাহ না ঘুরতে দুই ভাই পরস্পরের হাত ধরে দুহাত দোলাতে দোলাতে অরণ্যসংলগ্ন রেললাইন ধরে সোনা ব্যাঙ, ঘাস ফড়িং, পাখি, প্রজাপতি, গোসাপ, বনবেড়াল খুঁজতে খুঁজতে হেঁটে বেড়াচ্ছিল, দূরে সিগন্যালে থেমে থাকা একটা ট্রেন দেখে ছুটে এসে শেষ কামরার দুই বাফার দুহাতে জড়িয়ে দুই ভাই ঝুলে পড়ল। একটু পরে হুইসেল দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করলে তাদের মন উত্তেজনায় নাচতে লাগল, আজ অনেক দূরে চলে যাবে তারা।

ট্রেন পূর্ণ গতিতে ছুটছে, বাফারের গোলাকার লোহার ঘসায় পাঁজর টাটাচ্ছে, লালকমল-নীলকমল ভয় পেয়ে বাফার ছেড়ে দিতেই লাইনের পাথরের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

বুকের নানা জায়গায় ছড়ে গিয়ে শার্টে রক্তের ছোপ, দুজনেরই চিবুক ফেটে রক্ত পড়ছে, এই অবস্থায় নিজেরা হেঁটে হাসপাতালে চলে এল।

কোথায় কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে— ডাক্তারের এই প্রশ্নের উত্তরে আগাগোড়া সবটাই তারা খুলে বলল। একজনের কোনও অংশ বাদ পড়লে আরেকজন সেটা পূরণ করে দেয়।

ক্ষত পরিষ্কার করে, ওষুধ লাগিয়ে, ইনজেকশন দিয়ে চিবুকে বড় স্টিকার সেঁটে একজন নার্সকে দিয়ে দুজনকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হল।

পুরো বৃত্তান্ত শুনে নীলাঞ্জনা নিজের কপালে একবার মাত্র করাঘাত করে বলে উঠল, 'পৃথিবীতে তোরা বাঁচতে এসেছিস, না মরতে?'

এক ভাই বলল, 'সূর্য রোজ কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, দেখতে ইচ্ছে করে, মা।'

আরেক ভাই বলল, 'একটা ভূ-গোলক কিনে দাও না, মা।'

'গ্লোব তো তোদের একটা আছে।'

'ওটা তো ছোট।'

তিন মাস পর একদিন ভোরে উঠে নীলকমল-লালকমলকে জাগিয়ে নীলাঞ্জনা তাদের সাদা হাফপ্যান্ট, সাদা হাফশার্ট, সাদা মোজা, কেডসের নতুন জুতো দিয়ে বলল, 'চানটান করে আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নাও। একসঙ্গে জলখাবার খেয়ে তোমরা বাবার সঙ্গে বেরবে।'

দুভাইয়ের মনে ফূর্তি। 'কোথায় যাব মা? বাবা অনেক দূরে নিয়ে যাবে?'

'রেলগাড়িতে চড়তে হবে। সারা দিন সারা রাত রেলগাড়িতে থাকবে। প্রচুর খাবার দিয়ে দিচ্ছি। তিনবার খেতে হবে তো।'

আনন্দে দুভাই পাঁচশো করে স্কিপিং করে ফেলল। বিছানায় কয়েকবার ডিগবাজিও খেল।

যাত্রার পরিকল্পনা, উদ্যোগ, ব্যবস্থা সবই নীলাঞ্জনার। চিঠিপত্রের যোগাযোগ থেকে শুরু করে রেলে খাবার জন্য মুড়ির মোয়া, তিলের খাঁজা, চিড়েভাজা, চিনির বাতাসা, পরোটা, মোহন ভোগ, সন্দেশ ইত্যাদি গুছিয়ে দেওয়া অব্দি সবই সে-ই করেছে। পরীক্ষিতের দায়িত্ব শুধু আদেশ পালন।

নিজের আসন ছেড়ে এক আসনেই দুভাই একসঙ্গে বসেছে। পরীক্ষিৎ বসেছে মুখোমুখি। গম্ভীর মুখে বাইরের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে আছে। দুভাই পরস্পরের গলা জড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে জানলা দিয়ে সব কিছু দেখছে। বড় বড় গাছ, তালগাছের সারি, ফসল ভরা খেত, জলভরা পুকুর-সুদ্ধু তাদের পৃথিবীটাও যে অবিরাম পিছনের দিকে চলে যেতে পারে এটা দুজনের কেউই কখনও ভাবতে পারেনি, দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না। গাছপালা ঘেরা কতগুলো চালাঘরের ছোট ছোট একেকটা গ্রামও পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে দুজনের চোখে ঘোর লেগে গেল। নীলকমল বাবাকে বলল, 'আমাদের পৃথিবীটা যে ঘোরে, আগে তো এরকম দেখতে পাইনি, বাবা। শুধু বইয়ে পড়েছি।'

'একদিন এই পৃথিবীর কথা বলব তোমাদের। জাহাজে করে সমুদ্রে ঘুরতে ঘুরতে যেসব দেশ আমি দেখেছি সেসব দেশের কথা তোমাদের বলব। অনেক রকম দেশ, অনেক রকম মানুষ। গায়ের রং, কথা বলার ভাষা, পরনের জামাকাপড়, ঘরবাড়ি, খাবার-দাবার, গান-বাজনা সব দেশে একরকম নয়। অনেক রকম তাদের আচার-অনুষ্ঠান। এমন দেশেও গেছি, যেখানে তখন সারা রাত আকাশে সূর্য ছিল। কোনও কোনও দেশ কয়েক মাস ধরে বরফে ঢাকা, কোনও দেশ মরুভূমির বালিতে ঢাকা, কোনও দেশ জঙ্গলে ঢাকা, সব বলব তোমাদের।'

লালকমল বাবার কথার মধ্যে ডুবে ছিল, বলল, 'ওইসব দেশে আমরা দুভাই যেতে পারি না? দাদাকেও নিয়ে যেতে পারি না?'

'বড় হও, আরও বুদ্ধি হোক, বিদ্যা হোক, সাহস বাড়ুক, তখন নিশ্চয়ই যাবে।'

রেলগাড়ির দুলুনিতে দুভাই খুশি।

একসময় নীলকমল দূরের পাহাড়শ্রেণী দেখিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'অতবড়ো পাঁচিল কিসের বাবা? অনেকক্ষণ থেকে দেখা যাচ্ছে। খুব লম্বা।

'পাঁচিল নয় রে, ওটা পাহাড়। ওই পাহাড়ের কাছেই যাচ্ছি আমরা।'

'পাহাড়ের ওপারে কি বাঘ সিংহ দৈত্য দানব আছে?' নীলকমল উঠে এসে বাবার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল।

'থাকলে কি তোমরা দৈত্যের সঙ্গে লড়তে যাবে নাকি?'

'অবশ্যই।' একটুও না ভেবে দুভাই কথাটা বলল একসঙ্গে।

'দাদার কথাটা মনে রেখো। আগে বুদ্ধি বাড়াও, বিদ্যা বাড়াও, তারপর সাহস দেখিয়ো।'

'দাদা এল না কেন বাবা?'

টার্মিনাল স্টেশনে ট্রেন থেমেছে, ছেলেদের নিয়ে, জিনিসপত্র নিয়ে নামবার তাড়াহুড়োয় পরীক্ষিৎ নীলকমলের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল।

দুই ভাইকে পাহাড়ের কোলে সৈনিক স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে তার তিনদিন পরে ফিরে আসার সময় দুজনের গালে মাথায় তাদের মায়ের মতো চুমু দিয়ে বলল, 'দাদার তো সামনে বড় পরীক্ষা, পরীক্ষা দিয়েই আসবে, মাও আসবে। পুজোর ছুটিতে আমি এসে তোমাদের বালিসোনায় নিয়ে যাব।' পিছনে ফিরে চোখের জল আড়াল করে কিছুটা এগিয়েও জল মুছে ফিরে এসে আবার বলল, 'যেভাবে তোমরা সাপ মারো, দীঘি পারাপার করো, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করার কথা ভাবো, লেখাপড়াটা এখানে সেভাবেই করবে। পুরো মন লাগিয়ে।'

'অবশ্যই' বলেই নীলকমলের সংযোজন, 'বাবা, জানো, জানো— চৌকিদার বলেছে, এখানে অনেক ভালুক আছে। মহুয়া খেতে আসে। মহুয়া কী, বাবা?'

লালকমলের কৌতূহল, 'পাহাড়ের ওপারে কী আছে, বাবা?'

বিষাদগ্রস্ত, বিপর্যস্ত পিতা আপাতত এই বলে তাদের নিরস্ত করল, 'ভালো করে লেখাপড়া শিখলে নিজেই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, বাবা।'

ক্রমশ

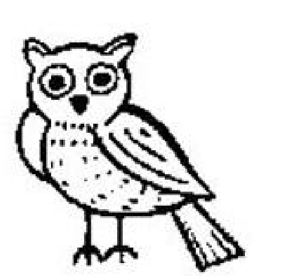

বারিদবরণ ঘোষ

পর্ব: ১০

নাচঘর

সবুজপত্র প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনকে উপলক্ষ করে পঁচিশে বৈশাখে। 'নাচঘর' বের হল সবুজপত্র প্রকাশের ঠিক দশবছর পরে বাংলা ১৩৩১ সনে, তবে প্রকাশের দিনটা ছিল ছাব্বিশে বৈশাখ। জানি না এইদিনে প্রকাশের উপলক্ষটুকু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কিনা। সম্ভবত নয়, কারণ একটু বাদে যখন আমরা 'নাচঘর'-এর প্রথম সংখ্যার সূচিটুকু নিবেদন করব, তখন রবীন্দ্রনাথকে অনুপস্থিত দেখব— ছবিতে, আশীর্বাণীতে, কোনও রচনায় কোথাও তিনি নেই। অথচ এমনটি দেখতে যেন আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না। তবে কী এর উদ্যোগীরা রবীন্দ্র-বিরোধী, অথবা রবীন্দ্র-বিষয়ে অনুৎসাহী, অথবা রবীন্দ্রনাথের কাছ পর্যন্ত যেতে পারেননি। পরে পরে দেখা যাবে। তবে হেমেন্দ্রকুমার রায় অথবা প্রেমাঙ্কুর আতর্থী— কর্মকর্তাদের যাঁদেরই নাম বলি না কেন— সকলেই রবীন্দ্র-অনুগত।

এমন নয় যে, 'নাচঘরের' মতো নাটক-অভিনয়-চলচ্চিত্র— এসব বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় এর আগে কোনও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। 'নাট্যমন্দির' (১৩১৭), 'থিয়েটার' (১৩২১), 'মজলিশ' (১৩২৯) আর 'শিশির' (১৩৩০)— অন্তত চার-চারটি মাসিক পত্রিকার নাম করতে পারি— যারা এই ক্ষেত্রে বেশ একটা উল্লেখ করার মতো ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করেছিল। তবে আবার কেন একটা? পত্রিকা ছিল বটে আগে, কিন্তু যাকে বলে ভেবে-চিন্তে, পরিকল্পনা করে নাটকের কাগজ বের যে করা যায়— 'নাচঘরের' আগের সম্পাদকেরা (অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মাসিক নাট্যমন্দিরের কথা অবশ্য একটু আলাদা) তা ভেবে উঠতে পারেননি। 'নাচঘর' এসেই যেন শুনলাম, দেখলাম, জয় করলাম গোছের ব্যাপার ঘটিয়ে ফেলল। নইলে প্রকাশের পরে-পরেই পরপর প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যার এত চাহিদাই বা হল কেমন করে যাতে ওই দুটি সংখ্যাই আবার করে ছাপতে হয়েছিল কেন? আবার করে মানে শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় যে দু-বার নয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণও ছাপতে হয়েছিল!

> এখানে লিখেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনবদ্য। কারণ এখানে তাঁর এমনতর বহু রচনা রয়েছে— যেগুলি এখনও অগ্রন্থিত। সেগুলি সংকলন করেছি। এতে যেমন সিনেমা লাইব্রেরি স্থাপনের পরিকল্পনা ও উপযোগিতা নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের রচনা আমরা পেয়েছি, অভিনয়-কলা বিষয়ে তাঁকে অভিভাবকের ভূমিকাতেও লক্ষ করে থাকি।

'নাচঘর' বের হল সাপ্তাহিক আকারে সাধারণভাবে আটটি পৃষ্ঠা নিয়ে— বড় আকারের, মাপে সাড়ে ন-ইঞ্চি x সাড়ে বারো-ইঞ্চি। কাগজ বের হত শুক্রবার। পৃষ্ঠার সংখ্যার হেরফের ঘটেছে মাঝে মাঝে, শারদীয়া সংখ্যার তো বটেই— প্রায় পত্রিকা পৃষ্ঠার বর্ধিত আকারে। ঠিকানা ৯০/২৩ হ্যারিসন রোড— এখনকার মহাত্মা গান্ধি রোড। এই ঠিকানাটা হয়তো কারও মনে 'মৌচাক' পত্রিকার স্মৃতি জাগিয়ে দিতে পারে। 'মৌচাক' পত্রিকা এই ঠিকানা থেকেই একসময়ে বের হত। ঠিকানা এক হওয়ার কারণ একটা ছিল— দুটো পত্রিকার উদ্যোগপর্ব থেকে শান্তিপর্ব পর্যন্ত এই ঠিকানার মালিক ছিলেন বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স-এর কর্তৃপক্ষ। দামের ঠিক ছিল না, কাগজের সংখ্যা বাড়লেই পত্রিকার দাম বাড়ত। নইলে দাম ছিল দু-পয়সা।

কাগজ বের হলেও এটা চালানো যাবে কিনা, এ-বিষয়ে উদ্যোগীদের কি কোনও আশঙ্কা ছিল? নইলে বর্ষ প্রথমসংখ্যা ইত্যাদি ছাপা না হয়ে কেবল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি সংখ্যাগুলির নাম মুদ্রিত হলেও 'প্রথমবর্ষ' নামটি ছাপা হয়নি কেন? তবে দ্বিতীয়বর্ষে পা দিয়েই তাঁদের মনে সংশয়ের মেঘ আর ছিল না— দ্বিতীয় থেকে শেষ অবধি বর্ষসংখ্যার উল্লেখ ছিল। তেমনি শুরু থেকে সম্পাদকের নাম বড় বড় অক্ষরে ছাপা হলেও তাঁর লেখা রচনাদি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অস্বাক্ষরিত থাকত। এমন অন্য কারও কারও লেখাও। ফলে অস্বাক্ষরিত রচনাটি ঠিক কার লেখা— এই ধন্দ থেকে বের হওয়া খুব শক্ত হয়ে পড়ে।

এমনিতে 'নাচঘর' সাদা-কাগজে কালো-আখরে ছাপা হয়। কিন্তু নাটক বলে কথা— একটু রং-চং না হলে সাজটা পূর্ণ হবে কেন? অতএব নানা রং এসে গিয়েছে পত্রিকার মুদ্রণে। কিন্তু সে হল মধ্যলীলার রং। অন্ত্যলীলায় আবার সাদা-কালো। ছাপার খরচ তো কম বাড়েনি, অতএব মুদ্রণব্যয় কমাবার জন্যই আবার সমে ফিরে আসা। এতে অবশ্য কাটতিতে কাটা পড়েনি তেমন। কারণ থিয়েটার-বায়োস্কোপ-নাচগান, হইহুল্লোড় নিয়ে প্রকাশিত কাগজের দিকে রঙ্গপ্রিয় বাঙালি প্রতি শুক্রবার তাকিয়ে থাকত। এই প্রতীক্ষাই ছিল কাগজের মূলধন। তবে এর আসল আকর্ষণ ছিল কোনও অভিনয় বিষয়ে প্রকাশিত এর সমালোচনা। সমালোচনার সমালোচনা এবং তারও প্রতিসমালোচনায় 'নাচঘরের' আসর সর্বদা জমজমাট আর সরগরম। একটা প্রসঙ্গ বলি— শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী'কে নিয়ে শরৎ চাটুজ্যে বনাম শিবরাম চক্রবর্তী বনাম মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বনাম অন্য কেউ কেউ যুযুধান হয়ে নাট্যসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চকে একেবারে উষ্ণ-কবোষ্ণ-উচ্চোষ্ণ করে রাখত।

এর ফলে বিদেশি অভিনয়ের আকর্ষক ছবি-কাম-বিবরণের নিয়মিত আসর বাঙালির

নাট্যপিপাসাকে একেবারে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে পারছিল এই পত্রিকার রসদে সম্পদশালী করে। 'রঙ্গরেণু' আর 'নাট্যজগৎ'-স্তম্ভ দুটি নাচঘরের মজলিশ বাড়িটিকে উত্তুঙ্গ করে রেখেছিল। টুকরো খবর মাঝে মাঝে চুটকি খবর হলেও এর মধ্যে মাঝে মাঝে রঙ্গরসের সঙ্গে বিদ্রূপের সামান্য চিড়চিড়ানি ধরিয়ে দেওয়ার মুন্সিয়ানা প্রকাশ পেত, তাতেই নুন-ঝালের স্বাদলোভী বাঙালি নাট্যরসিক তার পেতেন ভালোই। গুজব এবং তার অভ্যন্তরীণ বহিরঙ্গন বৈশিষ্ট্য খুবই আস্বাদ্য ছিল। একটা একচোখোমি যে তাতে মাঝে প্রকাশ পেত না বলা যাবে না। যেমন শিশিরকুমার ভাদুড়ি মশায়কে মাঝে মাঝেই লক্ষ্যবস্তু স্থির করে সম্পাদক মশায় বাণ হানতেন। আমেরিকায় শিশিরবাবুর সদলবলে অভিনয় করতে যাওয়া নিয়ে যেসব মনোহর (এবং দুঃখকর) মন্তব্য করা হত তা বাংলা নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে ফলিত অভিনয়-ইতিবৃত্তের উপকরণ হয়ে আছে। কবিগান-তরজা-খেউরের উচ্চরবে ও অ-শ্লীলতায় রুচির পোষকতার কথা বলতে পারি না, তবে আজকের ভাষায় পাঠকেরা যে তা 'খেতেন' ভালো, সন্দেহ করি না।

'নাচঘরের' আটপৃষ্ঠার মধ্যে অর্ধেক পৃষ্ঠা সমসাময়িক নাটকগুলির বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ। কখনওবা আমরা পূর্ণপৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন দেখেছি এবং 'কর্ণার্জুন'-এর মতো নাটক শত-রজনী অভিনয়ের গৌরব কীভাবে অর্জন করেছিল তার মুদ্রিত বিবরণ পেয়ে একটা আস্থা বা বিশ্বাসমূলক ইতিবৃত্তের উপকরণ পাই। যেমন পাই বিদেশি-রঙ্গমঞ্চের কথা। এরজন্য নির্দিষ্ট লেখকদের দায়িত্ব দেওয়া হত— যেমন বিধুভূষণ দাশগুপ্ত। কিন্তু পিছনে লাগার দায়িত্বে নির্দিষ্ট কেউ ছিলেন না— এ-ব্যাপারে সম্পাদকীয় তৎপরতাই সম্ভবত সর্বাধিক কার্যকর ছিল।

'নাচঘরের' মধ্যে এমন বহু উপকরণ রয়ে গিয়েছে যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আবার করে চেনা-জানা যেতে পারে। প্রায় প্রতিসংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ অভিনয় এবং অভিনয়সংক্রান্ত বিষয়ে উপস্থিত। রবীন্দ্রনাটকের আগামী অভিনয়ের আগাম সংবাদ দিতে 'নাচঘর' সর্বদা নৃত্যপরায়ণ। সম্প্রতি এই বিষয়টি নিয়ে একটি পুস্তক বর্তমান প্রতিবেদকের উদ্যোগে প্রকাশ-পর্বে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মহেন্দ্র গুপ্ত, অহীন্দ্র চৌধুরিরা যেমন 'নাচঘরের' নাটমন্দিরে শ্রদ্ধার আসনে আসীন, তেমনি বিদেশের ইবসেন, স্ট্রিনবার্গ, মেটারলিঙ্করাও। এদেশের রঙ্গমঞ্চের কুশীলবের সঙ্গে গ্রেটাগার্বোরা সমগুরুত্বে উপস্থাপিত। বস্তুত বাংলায় বিদেশি অভিনয়ের বিবরণ-সমালোচনা এবং তুল্য অবস্থার বিবরণ-প্রকাশে 'নাচঘর' অতুলনীয়, অনবদ্য।

এখানে লিখেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনবদ্য। কারণ এখানে তাঁর এমনতর বহু রচনা রয়েছে— যেগুলি এখনও অগ্রন্থিত। সেগুলি সংকলন করেছি। এতে যেমন সিনেমা লাইব্রেরি স্থাপনের পরিকল্পনা ও উপযোগিতা নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের রচনা আমরা পেয়েছি, তেমনি অভিনয়-কলা বিষয়ে তাঁকে অভিভাবকের ভূমিকাতেও লক্ষ করে থাকি। হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মতো কৃতবিদ্য সম্পাদকেরা মননশীল প্রবন্ধাদি লিখবেন— এটা প্রত্যাশিত। কিন্তু যখন দিলীপকুমার রায় অথবা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পড়তে পাই— তখনই 'নাচঘর' যে শুধু নৃত্যগীত ও লঘু-বিনোদনের নাট্যশালা নয়, তা ভাবুককেও রসদ সরবরাহ করে— তা অনুভব করতে পারি। কলম ধরেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিশেষভাবে উপস্থিত থাকেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মন্মথমোহন বসু, অমরেন্দ্রনাথ রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজকুমার ভট্টাচার্য, নাগেশচন্দ্র চৌধুরিদের সঙ্গে অবশ্য অবশ্যই নরেন্দ্র দেব।

এদের মধ্যে সম্পাদকদ্বয়— বিশেষ করে হেমেন্দ্রকুমার রায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী যে সবসময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন— তা আমাদের মনে হয়নি। কেউ কেউ আবার বলে বসতেন এটা নাকি শিশিরকুমার ভাদুড়ির বেনামি কাগজ। কিন্তু শ্রীরঙ্গমকে যেভাবে এই কাগজে শ্রীহীন করে রঙ্গতামাশা করা হয়েছে— তাতে এই অনুমান দৃঢ়ভিত্তিক কিনা— তাতে সন্দেহই জাগে। তবুও এই 'নাচঘরের' মালিক সুধীরচন্দ্র সরকারের উক্তিটিকেও অস্বীকার করতে পারি না। তিনি 'আমার কাল আমার দেশ' নামে তাঁর 'আত্মকথা'-র এক জায়গায় লিখে গিয়েছেন— 'একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা আর্ট থিয়েটারের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। তাতে শিশির সম্প্রদায়কে নানারকম কুৎসা করতে শুরু করে। শিশিরকুমারের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা ছিল অত্যন্ত বেশি। আমিও তখন একটি পত্রিকা প্রকাশ করি— নাম 'নাচঘর'। এতে শিশির সম্প্রদায়কে সমর্থন করে যাবতীয় খবর নানারকম বিবরণ, নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের লেখা প্রভৃতি থাকত। সে পত্রিকার আমিই ছিলাম প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী। কিছুদিন পত্রিকা চালানোর পর আমি সে-পত্রিকা ছেড়ে দিই এবং পরে অন্য লোকে সে কাগজখানি চালায় দীর্ঘদিন ধরে।' বস্তুত প্রকাশক ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং নলিনীমোহন রায়চৌধুরি।

যাই হোক 'নাচঘর'-এর হাত বদলে এর চরিত্র বদলও হয়। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকেই দেখছি সম্পাদক হয়েছেন নলিনীমোহন রায়চৌধুরি। ঠিকানা বদল হয়ে হয়েছে ২০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট। কাগজের আকারে পরিবর্তন হয়েছে সাড়ে ৭ ইঞ্চি x পৌনে দশ ইঞ্চি। পরে আবার ঠিকানা বদল হয়েছে: ২৪ নং কলেজ স্ট্রিট। আরও নানান অদল-বদল। 'নাচঘরে' থিয়েটারের চেয়ে মাঝে মাঝে বায়োস্কোপ গুরুত্ব পেয়েছে। সেকারণে চলচ্চিত্রের ইতিহাস রচনায় এর ভূমিকা অতুলনীয়। বিখ্যাত এন কে জি নির্মলকুমার ঘোষ এতে মূল্যবান সব প্রবন্ধ লিখেছেন। কত কত গান এখানে ছাপা হয়েছে। কোনটি শ্রেষ্ঠ নাটক এমন ভোটাভুটিও হয়েছে প্রথম বছরেই। এবং ২০ সংখ্যায় দেখতে পাই ২২১১ ভোট পেয়ে প্রথম হয়েছেন শিশির ভাদুড়ি মশায় এবং ২১৮২, ২০৭৪ এবং ২০৭১ ভোট পেয়ে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ হয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নরেশ মিত্র এবং অহীন্দ্র চৌধুরি।

কত আগাম খবর এখানে ছাপা হয়েছে, যেমন— 'সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন শিশিরকুমারের থিয়েটারের জন্য তিনি একটি নতুন নাটক লিখছেন'। আবার অভিনীত সমসাময়িক নাটকের সমালোচনাগুলির উৎসও 'নাচঘর'। অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পকলা বিষয়ে লিখছেন এমন সংবাদের পাশাপাশি যদুনাথ সরকার বা রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ও অংশগ্রহণ করেছেন ভাবলে এখনও লোমহর্ষণ হয়। দিলীপকুমার রায়ের 'আলমগীর ও শিশিরকুমার' প্রবন্ধে এমন উত্তাপ ছড়ায় (১৩ সংখ্যায়) যে ১৯ সংখ্যায় স্বয়ং লেখকই প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হন।

'নাচঘরে' ডাকঘর এখনও খুলে পড়ার মতো। গায়ত্রী রায় (২ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা) অথবা শ্রীমতী প্রভার চিঠি তুলনাহীন। নির্মলেন্দু লাহিড়ির পিছনে এমনি করে লাগা কি 'নাচঘরের' উচিত হয়েছিল?

একটা কথা এবারে বলি, রবীন্দ্রনাথ 'নাচঘরে' সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নন— ১৩৩৪ সালের শারদীয় সংখ্যায় তিনি বিশেষভাবে উপস্থিত।

প্রথম সংখ্যার সূচি: ১। রঙ্গরেণু/ ২। নৃত্য-কলায় নতুন প্রস্তাব/ ৩। যবনিকা-উত্তোলনের পূর্বে/ ৪। বায়োস্কোপের কথা/ ৫। রঙ্গালয়ের ভিতরে/ ৬। রঙ্গালয়ের বাইরে/ ৭। চলচ্চিত্রের চরিতকথা/ ৮। নাট্য জগৎ/ ৯। বোর নাটক/ ৪ ও ৭ সংখ্যা ছাড়া অন্যসব লেখা অস্বাক্ষরিত। তবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, মহেন্দ্রলাল বসুর সঙ্গে ভারতী-ভ্রাম্যনৃত্য-এর ছবি ছাপানো লক্ষণীয় ছিল অবশ্যই।

বুড়োক্রেজি

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

মিসপ্লেসড্

দোর্দণ্ড প্রতাপ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হঠাৎ হাইকোর্টের এক অর্ডার পেয়ে এক্কেবারে ল্যাজে-গোবরে। যাঁর এক হুকুমে সিংহে-হরিণে একঘাটে জল পান করে, তিনি অকস্মাৎ ইনসোমনিয়ার শিকার। টেনশনে তাঁর নাকি রাতের ঘুম উধাও, দিনের চিন্তাশক্তিও ফিনিশ।

কী করে নিদারুণ ঝঞ্ঝাট থেকে উদ্ধার পাবেন তা ভেবে-ভেবে খাড়া হয়ে উঠছে মাথার চুল।

তিন অতিরিক্ত জেলাশাসককে নিয়ে ঘোরতর মিটিংয়ে বসেছেন, রোজ দু-তিন ঘণ্টা মিটিং করেও খুঁজে পাচ্ছেন না হাইকোর্টের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার ক্লু। ব্যুরোক্র্যাটদের চাকরির ঘ্যাম যেমন আকাশ-ছোঁয়া, তেমনই তাঁদের সইতে হয় একশো-এক রকম হ্যাপা। তাঁরা বলেন চাকরির হ্যাজার্ডস্।

তা এরকমই একটি হ্যাজার্ডস্ ওরফে হ্যাপার নাম কনটেম্পট অব কোর্ট।

এবারে ডি এম সাহেব ঠিক সেরকমই একটা কেসে ফেঁসেছেন, তার ফলে সংশ্লিষ্ট ফাইলটি নিয়ে তিনজন এ ডি এমের সঙ্গে টানা তিনদিন মিটিং করেও কোনও দিশে না পেয়ে বললেন, এবার আমার জেল কেউ ঠেকাতে পারবে না! এতদিন সুনামের সঙ্গে চাকরি করে এসে শেষে কিনা জেলঘুঘু!

ফাইলের বিষয়বস্তু এরকম ঃ

সেই কোন আদ্যিকালে, বছর কুড়ি আগে গভর্নমেন্ট ভিখু পোদ্দার নামে এক ব্যক্তির একখণ্ড জমি অধিগ্রহণ করেছিল সরকারি প্রয়োজনে। কিন্তু সেই ভিখু পোদ্দার হাইকোর্টে একটা জবরদস্ত মামলা ঠুকে দিয়ে সেই অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। হাইকোর্টের শো কজের উত্তরে জবাবি এফিডেভিটে তৎকালীন জেলাশাসক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভিখু পোদ্দারের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের সঙ্গে তাঁর এক ছেলে অধীর পোদ্দারকে চাকরি দেবেন। কিন্তু সেই কাগজপত্র জেলার ফাইলে নেই, হাইকোর্ট কী আদেশ দিয়েছিলেন তাও লেখাজোখা নেই কোথাও। সেই অধীর পোদ্দারকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল কি না তারও কোনও হদিশ কালেকটরেটের ফাইলে নেই।

তারও বছর দশেক পরে সেই ভিখু পোদ্দার হাইকোর্টে একটি মামলা ঠুকে দিয়ে বলেছিলেন তাঁর ছেলেকে আজও চাকরি দেওয়া হয়নি, সেই ছেলেকে অবিলম্বে চাকরিতে জয়েন করতে দেওয়া হোক।

সেই আর্জির পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট তাঁর পূর্বতন অর্ডারকে মান্য করতে আদেশ দিয়েছিলেন জেলাশাসককে।

এসব ক্ষেত্রে যা হয়, সরকারি অফিসের ফাইল খুঁজে হাইকোর্টের সেই অর্ডার মান্য করা হয়েছিল কি না তা কোথাও আবিষ্কার করা গেল না।

এতদিন পরে সেই মামলাবাজ ভিখু পোদ্দার আবার হাইকোর্টে গিয়ে রিট পিটিশন পেশ করে বলেছে জেলার কর্ণধাররা তাদের কথার খেলাপ করেছে, অতএব অবিলম্বে তার পুত্রের চাকরি দেওয়া হোক, সেই সঙ্গে গত কুড়ি বছরের সুদসহ মাইনে, তার সঙ্গে মামলার খরচ, সব মিলিয়ে মোট দু লক্ষ সাতাশ টাকা তাকে মিটিয়ে দেওয়া হোক।

হাইকোর্ট সরকারি অফিসের এ ধরণের ফাজলামি পছন্দ করে না, রায় দিয়ে বলেছে এই আদেশদানের তারিখ থেকে দশদিনের মধ্যে টাকাটা না দিলে জেলাশাসকের নামে কনটেম্পট অব কোর্ট করা হবে।

ভিখু পোদ্দারের ছেলের বয়সই এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি, তাকে চাকরি দেওয়া যেমন এক সমস্যা, অন্য সমস্যা হল ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্কটা এমনই বিশাল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, জেলার বরাদ্দে সেই টাকা নেই, তা ছাড়া এত টাকা মিটিয়ে দিতে গেলে অবশ্যই অর্থবিভাগের অনুমতি চাই। সেই অনুমতি পেতে রিটায়ার করে যাবেন জেলাশাসক।

হাইকোর্টের অর্ডার এসে পৌঁছেছে মাত্র গত পরশু, আর মাত্র তিনদিন বাকি আদেশ পালন করতে। এখন কোথায় টাকা কোথায় অর্থবিভাগের অনুমতি! আগামী তিনদিনের মধ্যে কেসটা হাইকোর্টে আবার উঠবে, তখন টাকা না দিতে পারলে নির্ঘাত আদালত অবমাননার দায়ে জেলাশাসকের জেল।

টানা তিনদিন সমস্ত রেকর্ডপত্র ঘেঁটেও তখনকার জেলাশাসক কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা খুঁজে না পেয়ে একজন এ ডি এম প্রস্তাব দিলেন, তা হলে নিধুবাবুকে ডাকা হোক।

স্যুটেড-বুটেড ডি এম ভুরু কুঁচকে বললেন, নিধুবাবু এ কেসে কী করবেন?

—স্যার, দেখি উনি কিছু বুদ্ধি দিতে পারেন কি না! নিধুবাবু ইজ আ জিনিয়াস।

অগত্যা নিধুরাম চক্রবর্তীর ডাক পড়ল বড় সাহেবের চেম্বারে, তাঁরা একযোগে বললেন, কী করা যায় বলুন তো নিধুবাবু? জেলা কালেকটরেটের নিধুরাম চক্রবর্তীর মুশকিল আসান হিসেবে নামডাক আছে খুব। আপার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, অবসরের খুব বেশি দেরি নেই আর, গোলগাল গড়ন, মুখে বসন্তের দাগ, হায়ার অফিসাররা তাঁকে যে কাজই দিন না কেন নিধুবাবু সেই কাজ হাসিল করে দেবেন

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। জেলা-অফিসের যে কোনও শক্তপোক্ত ফাইল বগলে করে সকালে কলকাতা নিয়ে গিয়ে সন্ধের মধ্যে হাসিমুখে ফিরে এসে বলবেন, স্যার, করে ফেলেছি।

সাহেবরা অমনি প্লিজ্‌ড টু গিভ থ্যাঙ্কস টু দি গ্রেট নিধুবাবু, নিধুবাবুও এরকম একটি থ্যাঙ্কস পেলে বেজায় খুশি।

আজও নিধুবাবু হাসি-হাসি মুখে বললেন কেসটা কী, স্যার?

কেসটা খুবই জটিল, তার সারাংশ বলা হল এলেমদার মানুষটিকে। এখন নিধুবাবু কি হাইকোর্টের এই মারাত্মক আদেশের হাত থেকে রেহাই দিতে পারবেন জেলাশাসককে?

নিধুবাবু কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, স্যার, দেখি কিছু করতে পারি কিনা।

পরদিন সকালে নিধুবাবু ফাইল নিয়ে চললেন কলকাতা। একটা নমস্কারও সেরে নিলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে। বড়োসাহেবকে জেল খাটা থেকে বাঁচানোর মহান ব্রত যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন তাই এই ভক্তি প্রদর্শন।

ফাইল নিয়ে নিধুবাবু সোজা গেলেন হাইকোর্টে নির্দিষ্ট জজসাহেবের কোর্টে। অপেক্ষা করলেন কখন টিফিন পিরিয়ড শুরু হয়। টিফিনটাইমে জাম্বো চেহারার পেশকারবাবু টিফিনকৌটো খুলে মনোযোগ দিয়ে পরোটা বেগুনভাজা খাচ্ছেন, অতএব নিধুবাবু অপেক্ষা করলেন তাঁর টিফিন খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত। টিফিনান্তে বেয়ারাকে দিয়ে আনিয়েছেন এক কাপ গরম কফি। সেই কফিতে যেই না আরাম-চুমুক দিয়েছেন, নিধুবাবুর অমনি মঞ্চে প্রবেশ।

তখনও নতুন বছর পড়তে দু-মাস বাকি, তবু পকেট থেকে নতুন বছরের একটি দামি ডায়েরি বার করে হোঁতকা চেহারার পেশকারবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, স্যার আপনার জন্য এনেছিলাম।

পেশকারবাবু কিছুটা অবাক হলেন, কিছুটা নয়ও। এরকম উপহার পেতে তিনি দীর্ঘকাল অভ্যস্ত, কিন্তু এই পার্টিটা একেবারে নতুন।

নতুন বছরের ডায়েরি যে-ব্যক্তি প্রথম দেয়, তার প্রতি একটা আলাদা টান অনুভব করে প্রাপক। অমনি কায়দা করে ভুরু নাচালেন, কী চাই?

নিধুবাবুও কম এলেমদার মানুষ নন, সকাল থেকে পেশকারবাবুর দিকে লক্ষ রাখছিলেন এজলাসের পিছনে দাঁড়িয়ে। পেশকারবাবু কীরকম মানুষ, কী পছন্দ করেন তা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেছেন প্রথম থেকে। তাঁর টেবিলে জিরোতে থাকা গত বছরের ডায়েরিটা বেশ পেল্লাই আর ঝকমকে দেখে এর মধ্যে নীচে নেমে একটা পেল্লাই নতুন বছরের ডায়েরি কিনে এনেছেন উপঢৌকন স্বরূপ।

পেশকারবাবুকে খুশি করতে পেরেছেন দেখে খুলে বললেন তাঁর জেলাশাসকের সমস্যা। বললেন, বুঝতেই পারছেন, আমাদের ডি এম এ-বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাঁর সাত-আটজন আগের পূর্বসূরি পাকিয়ে গেছেন গোলমালটা, এখন তার দায় নিতে হচ্ছে এই সাহেবকে। আপনি বাঁচান।

পেশকারবাবু সব শুনে খুঁজে বার করলেন ফাইলটা, তার ভিতরকার বিষয়টি দেখেশুনে মস্ত করে ঘাড় নেড়ে বললেন, নাহ্‌, এ কেসে কিছু করা যাবে না। এই কেসে ব্যারিস্টার প্রীতম বসু আছেন, একদম সিংহবিক্রমে লড়েন।

—আপনাকে বেশি কিছু করতে হবে না, শুধু কিছুদিনের জন্য ফাইলটাকে গায়েব করে দিতে হবে। যখন মামলার দিন এলে খোঁজাখুঁজি হবে, শুধু বলবেন, স্যার, মিসপ্লেস্‌ড। সরকারি অফিসে যেমন প্রায়শই হয়ে থাকে।

পেশকার লাফিয়ে উঠলেন, ওরে ব্বাস, মারা পড়ে যাব একেবারে। হবে না।

নিধুবাবুর অভিধানে হয় না বলে কোনও শব্দ নেই, তিনি আকারে ইঙ্গিতে বোঝালেন প্রয়োজনে পেশকারবাবুকে ভালোমতো খুশি করে দেবেন, মানে ঘুষটা হবে মোটা অঙ্কের। কিন্তু পেশকারবাবুরা সাধারণত জজসাহেবের এজলাশের ঠিক নীচে বাঘের মতো বসে থাকেন, তিনি এই প্রস্তাবে নিজেই ঘাবড়ে যাচ্ছেন, বারবার বলছেন, না, না হবে না! তাই কখনও হয় নাকি!

নিধুবাবুও নাছোড়, তিনিও উঠবেন না, পেশকারবাবু বলে চলেছেন না-না-না। তিনি কোনও ভাবেই নিধুবাবুকে সাহায্য করতে পারবেন না!

ইতিমধ্যে ঘন্টাখানেক পার। ভাগ্য ভালো যে, আজ জজসাহেব এ-বেলা কোর্টে বসবেন না, তাই এখনও পেশকারবাবু ফাঁকা আছেন, অতএব পেশকারবাবুর সঙ্গে হ্যাঁ-না হ্যাঁ-না করে চালিয়ে যাচ্ছেন তখনও।

ইতিমধ্যে পেশকারবাবুর কয়েক মিনিটের জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হল, তিনি সংশ্লিষ্ট ফাইলটা পাশের ফাইলের স্তূপের নীচে গুঁজে রেখে বললেন, আপনার বসে থেকে কোনও লাভ নেই, আপনি এখন আসতে পারেন।

কিন্তু নিধুবাবু তখনও বসে আছেন দেখে তিনি বাধ্য হয়ে বাইরে গেলেন ও সেই সুবর্ণ সুযোগে নিধুবাবু ফাইলের স্তূপের নীচ থেকে টেনে বার করলেন তাঁর অভীষ্ট ফাইলটা, দ্রুত ঢুকিয়ে নিলেন তাঁর ফোলিও ব্যাগের মধ্যে, তারপর ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানি না মুখ করে বসে রইলেন যতক্ষণ না পেশকারবাবু তাঁর প্রয়োজন সেরে ফিরলেন সিটে। নিধুবাবুকে সেখানে দেখে আরও একবার বললেন, কী হল, আপনি এখনও বসে আছেন, বললাম না হবে না!

নিধুবাবু মনমরা মুখ করে উঠে পড়লেন তাঁর সামনে থেকে, কোর্টের বাইরে বেরিয়ে ঘড়িটা দেখলেন একবার, পাঁচটা পঞ্চাশের ট্রেনটা পেয়ে যাবেন নিশ্চয়, তারপর দ্রুত বাস ধরে পৌঁছে গেলেন স্টেশনে।

রাতে জেলায় ফিরে সোজা চলে গেলেন জেলাশাসকের বাংলোয়। সাহেব ততক্ষণে তাঁর চেম্বারের কাজ মিটিয়ে উঠে গেছেন দোতলায়। নীচে ঢুলতে থাকা আর্দালিকে বললেন, সাহেবকে একবার খবর দিতে পারো, খুব জরুরি দরকার।

আর্দালি প্রথমে মাথা নেড়ে বলল, সাহেব এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, বলেছেন কোনও হায়ার অফিসার ছাড়া অন্য কেউ এলে কোনও মতেই ডাকা চলবে না।

— তুমি শুধু ওপরে গিয়ে বলো নিধুবাবু ফিরেছেন কলকাতা থেকে।

আর্দালি অনেক গাঁইগুঁই করে ওপরে গিয়ে বলতেই ডিএম লাফ দিয়ে নেমে এলেন নীচে, উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু সুরাহা হল নিধুবাবু?

— স্যার, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ম্যানেজ করে এসেছি।

ডি এম হতবাক, কী করে ম্যানেজ করলেন?

— স্যার, সে অনেক গোলমেলে ব্যাপার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার। এমন ব্যবস্থা করে এসেছি যে, মামলার দিন সেই ফাইল আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না!

— সে কী! ডি এম আরও হতবাক।

— স্যার, ফাইলটা আপাতত মিসপ্লেস্‌ড। মামলার সময় ঘনিয়ে এলে পেশকারবাবু বুঝে উঠতে পারবেন না সেদিন ফাইলটা ঠিক কোথায় গুঁজে রাখলেন তাড়াহুড়ো করে! তারপর জজসাহেবকে বলবেন, 'স্যার, একটা ডেট দিয়ে দিন ওদের'। তারপর এরকম অসংখ্য দিন পার হয়ে যাবে, সেই ফাইল আর কোনও দিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনার কনটেম্প্ট অফ কোর্টও হবে না। মিসপ্লেস্‌ড ফাইল রি-কনস্ট্রাক্ট করতে কী হ্যাপা তা তো স্যার আপনি জানেন। ততদিনে আপনি এ-জেলা ছেড়ে অন্য জেলায় চাকরি করবেন।

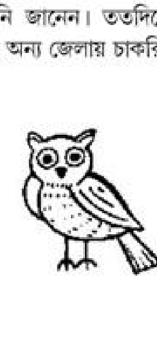

অভিন্ন বাংলা ভাষার এপার-ওপার

প্রণব চৌধুরী

'দুই পারেতে আছে কেবল বাঙালি সন্তান।' বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই ছড়া এপার-ওপার বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অভিন্ন বাঙালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য।

আমাদের মাতৃভাষা অভিন্ন, এটি সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় বন্ধন। একসময়, সম্ভবত এখনও, বাংলাদেশের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল, কিছু মৌলবাদী বুদ্ধিজীবী 'বাংলাদেশি সংস্কৃতি' ও 'বাঙালি সংস্কৃতি'— এই দুই শিরোনামে অভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক বিভেদরেখা টানার প্রয়াস পান। ডঃ এনামুল হক চমৎকারভাবে এহেন বিতর্কের বাস্তব মীমাংসার প্রেক্ষিতে বলেছিলেন যে, নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ 'বাংলাদেশি', কিন্তু সংস্কৃতি অবশ্যই 'বাঙালি সংস্কৃতি'। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব অনস্বীকার্য, অভিন্ন বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও। ওপার বাংলায় 'আদাব', এপার বাংলায় 'নমস্কার', ওপার বাংলায় 'পানি' (যদিও 'পানি' শব্দটি ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষভাবে ব্যাপক ব্যবহৃত, ভাষাতাত্ত্বিক কারণও যুক্ত), এপার বাংলায় 'জল'। এটি কোনও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকার মধ্যে গণ্য নয়। অনেক সময় অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্বও তা অনুধাবনে দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হন। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশে কলকাতা থেকে সাহিত্যিক-সংগীত শিল্পী-নাট্যকর্মীরা ঢাকায় তাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সাদরে বরণীয় হচ্ছেন, তখন এক বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে দাঁড়িয়ে বিখ্যাত কথাশিল্পী মনোজ বসু তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'এত দিন পরে এদেশে এসে দেখছি এখনও তারা জলকে পানিই বলেন।'

স্পষ্ট মনে পড়ে, সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশে কলকাতা থেকে সাহিত্যিক-সংগীত শিল্পী-নাট্যকর্মীরা ঢাকায় তাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সাদরে বরণীয় হচ্ছেন, তখন এক বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে দাঁড়িয়ে বিখ্যাত কথাশিল্পী মনোজ বসু তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'এত দিন পরে এদেশে এসে দেখছি এখনও তারা জলকে পানিই বলেন।'

এটি বিভেদের প্রশ্ন নয়, তা ভাষাবৈচিত্রের অন্তর্ভুক্ত। বাংলা ভাষাতত্ত্বে উপভাষার দুটি প্রধান শাখা: রাঢ়ী ও বঙ্গালী। রাঢ়ী পশ্চিমবঙ্গ অধ্যুষিত, বঙ্গালী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলকেন্দ্রিক। রাঢ়ীতে স্বরসংগতিজনিত আধিক্য— জুতা > জুতো, পূজা > পুজো, নৌকা > নৌকো, বিলাতি > বিলিতি ইত্যাদি। রয়েছে অভিশ্রুতি: করিয়া > কইর‍্যা > ক'রে, ধরিয়া > ধইর‍্যা > ধ'রে ইত্যাদি। রয়েছে শব্দমধ্যস্থ নাসিক্য ব্যঞ্জনের লোপে পূর্ববর্তী স্বরের নাসিক্যভবণের সর্বাত্মক-স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ: চন্দ্র > চাঁদ, পঞ্চ > পাঁচ ইত্যাদি। অ-কারের ও-কার প্রবণতা— মনস্তত্ত্ব > মনোস্তত্ত্ব, সুমন > সুমোন, বঙ্কিম > বোঙ্কিম ইত্যাদি। 'ড়' বেশ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়— বাড়ি, গুড় ইত্যাদি। পদান্ত ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা লোপ: মাছ > মাচ, বাঘ > বাগ, করেছে > করেচে ইত্যাদি। পদান্তের অঘোষ ধ্বনির ঘোষীভবন: ছাত > ছাদ, শাক > শাগ ইত্যাদি। 'শ' উচ্চারণের প্রবণতা: বাস > বাশ এমন অনেক রয়েছে। বঙ্গালীতে অপিনিহিতির সার্বিক প্রয়োগ: করিয়া > কইরা, চার > চাইর, বাক্য > বাইক্ক ইত্যাদি। 'এ' উচ্চারণে 'অ্যা', যেমন কেন > ক্যান, দেশ > দ্যাশ, তেল > ত্যাল ইত্যাদি। 'ঢ়', 'ড়'-র উচ্চারণ 'র', যেমন— বাড়ি > বারি, আষাঢ় > আষার ইত্যাদি। 'ও'-কার অনায়াসেই 'উ'-কার: চোর > চুর, দোষ > দুষ ইত্যাদি। চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ রীতিমতো উঠেই গিয়েছে। মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণে পরিণত, যেমন— ভাই > বাই, ভাত > বাত ইত্যাদি। কখনও অতি উচ্চারণে অল্পপ্রাণ হয়ে যায় মহাপ্রাণ— বাথরুম > ভাথরুম, বাল > ভালো ইত্যাদি। এ ধরণের আরও ভাষাতাত্ত্বিক রীতিনীতির কথা বলা যায়।

এগুলো কেউ কারও ওপর চাপিয়ে দেয়নি। বহুবর্ষব্যাপী ব্যবহারের ফল। ব্যবহৃত হতে হতে একদিন ব্যাকরণের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাষা আগে, ব্যাকরণ পরে। ব্যাকরণ ভাষাকে চলতে নির্দেশ দেয় না, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শৃঙ্খলারক্ষা-মাত্র করে। এখানেও তা ঘটেছে।

ধর্মীয় সংস্কৃতির ব্যবধানে ভাষাব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য বা উপভাষাগত তারতম্য নতুনতর কিছু নয়। তবে লক্ষণীয়— কিছু শব্দ প্রয়োগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় অংশ পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙালি (বাঙাল?)। তারা দীর্ঘদিন এখানে জন্মভূমি-মাতৃভূমির মতো বসবাস করেও পশ্চিমবঙ্গের আদি বাঙালিদের মতো বাংলা বলতে পারেন না শুধু উপভাষাগত পার্থক্য বা বাচনভঙ্গির বিশেষ ঝোঁকের (accent) কারণে নয়। বেশ কিছু শব্দ এপার বাংলায় বহুল ব্যবহৃত, যেগুলো ওপার বাংলায় সে-ভাবে নেই বা নেই-ই। হয়তো অনেকদিন থেকে থেকে বাংলাদেশের পশ্চিমবঙ্গ-বাঙালিরা সেগুলো রপ্ত করে নিয়েছেন, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা জন্মসূত্রে এতে অভ্যস্ত। কিন্তু বাংলাদেশের বাঙালিরা এবঙ্গে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে বা চিকিৎসার প্রয়োজনে অবস্থান করলে, শব্দ-পদ ব্যবহারগত পার্থক্য তাদের কানে বাজবেই। কিছু উদাহরণ তুলে ধরি, ব্যাকরণের কঠিন বিধিবিধান-সূত্রের উল্লেখে নয়, প্রতিদিনের ব্যবহারে—

এপার বাংলায়	**ওপার বাংলায়**
অব্দি (আজ অব্দি)	পর্যন্ত (আজ পর্যন্ত)
লাগোয়া	পাশের
(লাগোয়া বাড়ি)	(পাশের বাড়ি)
বাদে	পরে
(অনেক দিন বাদে)	(অনেকদিন পরে)
রোদ্দুর, রাত্তির	রোদ, রাত
ছুটি পড়ে গেছে	ছুটি শুরু হয়েছে
ছাতা	ছাতি
ডেঙ্গি (রোগবিশেষ)	ডেঙ্গু

চারটে/তিনটে	চারটা/তিনটা
বার্তা	খবর
(কী বার্তা যাবে?)	(কী খবর যাবে?)
বাতাবরণ	পরিবেশ
(এই বাতাবরণে)	(এই পরিবেশে)
সাঁটা	টাঙানো
(পোস্টার সাঁটা)	(পোস্টার টাঙানো)
বইপত্তর	বইপত্র
দেব, দোবো	দিব
(বইটা দোবো?)	(বইটা দিব?)
ঝেড়ে কাশা	(সরাসরি বিকল্প শব্দ
(সবিস্তারে বলা)	নেই)
সর্দিকাশি	সর্দিকাশ
ছেচল্লিশ	ছিচল্লিশ
জেরক্স	ফটোস্ট্যাট
যাবখণ	যাব একসময়
খানা (চারখানা)	খানি (চারখানি)
টা (বইটা)	টি (বইটি)
ভত্‌তি	ভরতি
(ভরে যাওয়া)	
পাথ্‌থ	পার্থ
(র-ফলার পরিবর্তে	
দ্বিত্ব উচ্চারণ)	
আকাদেমি	একাডেমি
(বাংলা আকাদেমি)	(বাংলা একাডেমি)
তৎসহ (এর সঙ্গে)	সেইসঙ্গে
দুর্ধর্ষ	দুর্ধর্ষ
(খুব ভালো, যেমন	(খুব খারাপ, যেমন—
দুর্ধর্ষ সুর)	দুর্ধর্ষ ডাকাত)
ফাটাফাটি	দা-রুণ (দারুণ)
(ফাটাফাটি গান)	
টিফিন	নাস্তা
চান (স্নান অর্থে)	স্নান
অমলেট	মামলেট
(ডিম অমলেট)	
চাউমিন	নুডুল্‌স্‌
অম্বল	অ্যাসিড
(গ্যাস-অম্বল)	
ভাজাভুজি,	ভাজাপোড়া
তেলেভাজা	
আলুভাতে	আলুসিদ্ধ ভাত
ভাজা	ভাজি
(বেগুন ভাজা)	(বেগুন ভাজি)
বাড়ি	বাড়ি
(আপনার বাড়ি,	(দেশের বাড়ি,
অর্থাৎ স্থায়ী নিবাস)	অর্থাৎ গ্রামের বাড়ি)
বাসা	বাসা
(অস্থায়ী নিবাস)	(শহরের বসতিস্থল)
বিউলির ডাল	মাষের ডাল
ছোলার ডাল	বুটের ডাল
ঝামা ঘষে দেব	(সরাসরি বিকল্প শব্দ
(ভর্ৎসনাস্বরূপ)	নেই)
বসে আঁকো	চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা
প্রতিযোগিতা	
লঙ্কা (কাঁচা লঙ্কা	মরিচ (কাঁচা মরিচ,
শুকনো লঙ্কা)	শুকনো মরিচ)
নুন	লবণ
মাস্টেমশাই	স্যার
(শিক্ষকমাত্রেই	(শিক্ষকমাত্রেই)
সম্মানার্থে	

—ইত্যাদি।

পরিভাষাগত পার্থক্য তো রয়েইছে। এধরণের পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য ' বৈষম্য' নয়, আবারও বলি 'ভাষাবৈচিত্র'। দুই বাংলার ভাষাব্যবহার নিয়ে অভিন্ন বাংলা ভাষা। এর কোনওটিকে খাটো করার অপপ্রয়াস এখানে নেই। সম্প্রতি দুই বাংলার চার ভাষাবিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত হয়েছে অভিন্ন বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ: পশ্চিমবঙ্গ থেকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও পবিত্র সরকার, বাংলাদেশ থেকে আনিসুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম। আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই, দেরিতে হলেও এই ভাষা-বাস্তবতার স্বীকৃতি অত্যাবশ্যক।

লেখক পরিচয়: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন
প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি।
তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলি-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

তারানাথ তান্ত্রিক

এই দশম সংখ্যাটি নিয়ে দুয়েকটি কথা। প্রথম কথা, ভালো লাগল যে সংখ্যাটি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে উৎসর্গ করেছেন। এই বছরের শেষের দিকে অলোকরঞ্জন ৮০ পূর্ণ করবেন। এখনও তিনি যুবকের মতো কর্মচঞ্চল, আগের মতোই সৃষ্টিশীল মেধার জাল বিস্তার করে চলেছেন। তাঁর বহু কবিতা উচ্চারণ করতে করতে আমরা যৌবন অতিবাহিত করেছি, এখনও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি।

নিশ্চয় ইতিমধ্যে লক্ষ করেছেন যে, অমিতাভ চৌধুরী যে ভবতোষ দত্তের কথা বলেছেন তাঁর ছবি ছাপা হয়নি, ছাপা হয়েছে অন্য ভবতোষ দত্তের ছবি।

দুই সংখ্যা ধরে যাঁর লেখা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম তিনি পবিত্র সরকার। তাঁর ভাবনার পরিচ্ছন্নতা ও গভীরতা সবসময়ই আকর্ষণ করে। মানুষ যুগে যুগে অমর হতে চেয়েছে, এটা যেমন ঠিক— এই জন্যই তার ধর্ম, স্বর্গ, পুণ্যার্জন, সন্তানবাসনা, কীর্তি বা অন্তত সম্পত্তি রেখে যাওয়ার চেষ্টা— তেমন, এ-ও ঠিক, বাঁচা কষ্টকর ও অসম্মানজনক হয়ে পড়লে মানুষ আর বাঁচতে চায় না। একজন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক বলেছিলেন, মৃত্যু কষ্টকর, কিন্তু যখন মৃত্যু কামনা করেও বেঁচে থাকতে হয় তখন বাঁচাটা আরও কষ্টকর হয়ে ওঠে। এই জন্যই বোধহয় আত্মহননের পথ বেছে নেয় মানুষ। আমি নিজে স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকারের পক্ষপাতী, যার দ্বারা মানুষ সসম্মানে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার অধিকার পেতে পারে! আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলি সবই একদিকে মানুষকে ভয় দেখিয়ে ঈশ্বরে মনোযোগ বা ভক্তি বজায় রাখাতে চায় আর অন্যদিকে, কিছু পরামর্শের সঙ্গে সান্ত্বনাবাক্য মিশিয়ে মানুষকে সুস্থির রাখতে চায়। এতে মানুষের উপকার হয় বলেই ধর্ম টিকে আছে। কিন্তু যারা মানুষের তৈরি করা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করার কোনও কারণ খুঁজে পায়নি, তাদের কাছে বিশ্বপ্রকৃতিই ঈশ্বর, বিশ্বপ্রকৃতিই স্রষ্টা আর বিলয়কারী। এইরকম অমরতায় নির্মোহ মানুষদের জন্য চাই স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার। এবিষয়ে পবিত্র সরকারের চিন্তা জানতে ইচ্ছে করে।

আরও একটা কথা। সবিতেন্দ্রনাথ রায় যেসব কীর্তিমান লেখকদের সম্পর্কে সাক্ষীর বিবরণ দিয়ে যাচ্ছেন, তা প্রায় সবই আনন্দদায়ক। এই সংখ্যায় শিবরাম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বিভূতিভূষণপুত্র প্রয়াত তারাদাসের কথা লিখেছেন। কর্মসূত্রে তারাদাসের সঙ্গে আমার বহু সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছিল। তাঁর মতো জ্ঞানী ও রসিক মানুষ খুব বেশি দেখিনি। লেখক হিসেবেও তাঁকে খুব মর্যাদার আসনে রাখি। অনেক অনবদ্য ছোটগল্প তিনি লিখেছেন। তাছাড়া তাঁর তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পগুলি তো অসামান্য! জানি না বাংলাভাষার সাধারণ পাঠক তাঁর যৌনতাবর্জিত খিস্তিখেউরবর্জিত করুণ ও আনন্দময় গল্পগুলি পড়েছেন কিনা।

কালীকৃষ্ণ গুহ

এইচ বি ৬, সল্টলেক-৭০০ ১০৬

হেঁয়ালির ছন্দ

'কালের কষ্টিপাথর' প্রতি সংখ্যাই কম-বেশি পুরোটা পড়া হয়ে যায়। ভালো লাগে লেখক ও তাঁদের বিষয়ের বৈচিত্র্য। শুধু প্রথম দুটি পাতায় বিষয় ও শৈলীর দ্যুতি মনকে চমকে দেয়। সুপরিচিত শিল্পী শুভাপ্রসন্নর ছবিজীবন ও শিখরস্পর্শী ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের দাওয়াত পড়ে একইরকম ভালো লাগে। আবার অমিতাভ চৌধুরীর মুখে মহাজন কথা আর সবিতেন্দ্রনাথ রায়ের স্মরণীয় লেখকসঙ্গ, প্রথমদিকের খোলা খাতার বাংলা ভাষা বিতর্ক ও সমরেশ মজুমদারের 'গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি'র অভাব এখনও বোধ করি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাজের বাংলা'ও দশম সংখ্যায় শেষ হয়ে গেল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য গদ্য ও যুগোপযোগী বিষয়ের রেশ ধরে আরও কারও আর কোনও লেখা পড়বার আশায় রইলুম।

বিভাস চক্রবর্তীর হ্যামলেট প্রযোজনা দেখা ছিল, তার নেপথ্যকথা ও পরিচালকের দীর্ঘ জটিল প্রস্তুতি 'কালের কষ্টিপাথর'-এ পড়ে আরও একবার নাটকটা দেখবার ইচ্ছে জাগল। এপ্রসঙ্গে কবি কালীকৃষ্ণ গুহর মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করতে না পারলেও তাঁর ইঙ্গিত যুগভারমুক্ত বিশুদ্ধ হ্যামলেট দেখবার আশায়ও পথ চেয়ে থাকব। ধারাবাহিক পবিত্র সরকারের 'মৃত্যু : জীবনের প্রথম পাঠ'-ও মনোনিবেশ না করে উপায় নেই। ভাগ্যিস, এর পাশে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হেঁয়ালির ছন্দ' ছিল। প্রথম সংখ্যা থেকেই আমাদের মনে আবিষ্কারের আনন্দ জাগিয়ে যাচ্ছে। আবিষ্কার করলাম প্রচ্ছদ শিল্পী অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে। তাঁর লেখার বৈচিত্র্য 'কালের কষ্টিপাথর'-এর শুরু থেকেই আমাকে বিস্মিত করে রেখেছে। একদিকে আসমুদ্র ককেশাস, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের ঝোপে-সৈকতে নানা দেশের কবিসঙ্গ, নতুন ধারাবাহিক 'সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ অথবা বল্গা হরিণের খোঁজে' অন্যদিকে যুগনিঃসৃত বাস্তব-কল্পবাস্তবের ধারাবাহিক উপন্যাস 'বিষাদগাথা', তার ওপর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'ক্ষণের বচন'-এর সঙ্গে প্যাস্টেলের টানে আঁকা তাঁর নানা ভাবের মুখগুলোও চোখে লেগে থাকে। আর মনে লেগে থাকে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় তাঁর কথার নানা টুকরো ও প্রতি সংখ্যার পৃথক পৃথক উৎসর্গপত্র।

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

বিকোনো, না বিকীর্ণ হওয়া

'কালের কষ্টিপাথর'-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'কেন লিখি' শিরোনামে কথাসাহিত্যিক শ্রীসমরেশ মজুমদার সখেদে মন্তব্য করেছেন, 'এককালে বলতাম, অমুক লেখক টাকার জন্য নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। বেশ ঘেন্না ঘেন্না গন্ধ থাকত কথাটায়। কিন্তু এখন যখন লেখার জন্য টাকা পাচ্ছি, আবার বিদেশে যাচ্ছি তখন নিজেকে প্রশ্ন করি কতটা বিকিয়েছি?' তাঁর এই আত্মোপলব্ধি আমায় বিস্ময়াবিষ্ট করল।

শিবরাম চক্রবর্তী বলতেন, লেখা কি আর চাপবার জন্য? লেখা হচ্ছে ছাপবার জন্য! ছাপা হওয়া মানেই কেউ সেটা পড়বে। এবার তার থেকে জ্ঞান আহরণই করুক কি নির্মল আমোদ পাক, তার জন্য লেখকের কিছু প্রাপ্য হয় বইকি! লেখক তো আর অকৃত্রিম সমাজসেবা করার জন্য লিখছেন না! টোলের পণ্ডিতেরাও কি নির্ভেজাল পরার্থসেবা করতেন? গৃহস্থের ঘরের চালটা-মুলোটা পাওয়ার প্রত্যাশা তো তাদেরও ছিল। লেখক রয়্যালটি বাবদ দু-পয়সা রোজগার করতে চাইলে সেটা দোষের নয়।

এমনকি দোষের বলে মনে হয় না যদি অর্থের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত লেখেন সেটাও। শুনেছি 'সাহেব-বিবি-গোলাম' খ্যাত শ্রীবিমল মিত্র অতগুলো পৃষ্ঠার উপন্যাসটা নামিয়ে বেশ গর্ব অনুভব করতেন। হাতের কাছে আরও বড় উদাহরণ আছেন, খোদ রবীন্দ্রনাথ! সব্যসাচীর মতো লিখে গিয়েছেন। বিগত

প্রজন্মের সাহিত্যিকদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও প্রচুর লিখেছেন। যদিও তাঁর সাক্ষাৎকারে দেখেছি, বলছেন, একটু কম লিখলে ভালো হতো।

কম লিখলে লেখার গুণগত মান বাড়ে, এটা হয়তো একাংশে ঠিক। কারণ পড়াশোনার জন্য সময় পাওয়া যায়। ভাবনার জন্য সময় পাওয়া যায়। কিন্তু যে লেখক 'দৌড়' কিংবা 'কালবেলা'র মতো উপন্যাস লিখে বাংলাবাজারে হইহই ফেলে দিয়েছেন, তাঁর ওপর পাঠকদেরও একটা প্রত্যাশা এবং চাপ থাকবে, সেকথা বলাই বাহুল্য। একে পণ্যময় সংস্কৃতির অতি-চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার কোনও যুক্তিসম্মত কারণ নেই। আসলে সেটা প্রতিভার কাছে স্বাভাবিক প্রত্যাশা। সে চাপ রবীন্দ্রনাথের সময়ে তাঁর ওপরেও ছিল। উপরন্তু শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী গড়ে তোলার জন্যও অনেক টাকার প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্ব রং-তুলিসর্বস্ব হয়ে কালাপানি পেরিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছেন ছবি বিক্রির আশায়, এসময়ে বসে সেকথা ভাবাও কি যায়! অর্থাৎ বিদেশ তিনিও ঘুরেছেন, তিনিও বিকনোর কথাই ভেবেছেন, এবং ভেবেছেন এমন একটা সময়ে, যখন বাঙালি লেখক-শিল্পীদের কেউ লেখালেখি-ছবি আঁকার ব্যবসায়িক সম্ভাবনা কল্পনাও করেননি।

আমাদের বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারে নরেন্দ্রনাথ মিত্র একাই যে কত অমূল্য খাজানা রেখে গিয়েছেন তার কোনও লেখাজোখা নেই। তাঁর সমসাময়িকদের অনেকের স্মৃতিচারণায় পড়েছি, একটা সময় এমন কোনও বাংলা পত্রিকা দিনের আলোই দেখত না যাতে না টালা পার্ক নিবাসী এই কৃতী গল্পকারের লেখা থাকত। সমসাময়িক লেখকরা এ নিয়ে কিছুটা ঈর্ষাকাতর ছিলেন, এমনকি তির্যক মন্তব্যও করতেন। কিন্তু নরেনবাবু কেবল পত্রপত্রিকাকেই নয়, দুর্গাপুজোর স্যুভেনিরকে পর্যন্ত অনবদ্য সব গল্প দিয়ে গিয়েছেন। এটা কেবল লেখার জন্য লেখা নয়, পাঠকের প্রত্যাশাকে প্রশ্রয় দিয়েও লেখা। এবং সেটা করতে গিয়ে লেখকের একটা বাজার তৈরি হয়েছে। আজও ছয়-খণ্ডে তাঁর গল্পসমগ্র ভালো পরিমাণ রয়্যালটির উদ্গাতা। ক্ষতি কী তাতে? লেখালেখি তো বিকনোর জন্যই। মানুষ যে বই পড়ছে, অন্তত বই ঘরের আলমারিতে সাজিয়ে রেখে দুবেলা ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় দেখছে, এ-তো তারই বড় প্রমাণ!

ঔপন্যাসিক হিসেবে তো নিশ্চয়ই, ছোটগল্পকার হিসেবেও সমরেশ মজুমদার বাংলাসাহিত্যে চিরকালীন স্থান পেয়ে গিয়েছেন বলেই পাঠকদের ধারণা। তাহলে তাঁর কেন এই উপলব্ধি? তবে কি তাঁর প্রতি 'দু-পংক্তি বক্তব্যের মধ্যবর্তী' কোনও অর্থ আছে বলে ধরব? সেই অর্থটা কি এই, যে তিনি লেখার মতো কোনও উপকরণ পাচ্ছেন না, বর্তমান প্রজন্মের পক্ষে নিজেকে একটু বৃদ্ধ এবং পুরনো মনে হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও লিখে যেতে হচ্ছে যেহেতু লেখাটা তাঁর পেশা? একেই কি তিনি বাজার-সভ্যতার কাছে বিকিয়ে যাওয়া বলছেন?

এই অতৃপ্তি তাঁর একার নয়, মনে হয় তাঁর প্রজন্মের অনেকেরই। তাঁদের সমান যোগ্যতার লেখকরা যদি এ-প্রজন্মেও দেখা দিতেন, উঠে আসতেন, এবং মনে হয় যদি অধুনা 'কর্পোরেট মানসিকতা'র পরিবর্তে সত্তর-আশির দশকের মতো পত্রিকাগোষ্ঠীগুলির অতি-সংবেদনশীল সহায়ক ভূমিকা থাকত তাহলে নিশ্চিতভাবেই নতুন অনেক লেখককে আমরা পেতাম— তাহলে সেক্ষেত্রে বাংলাসাহিত্যের ধারাবাহিকতার জোয়াল একার কাঁধে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো দীর্ঘকালীন ক্লান্তিকর সংগ্রাম করে যেতে হতো না সমরেশবাবুদের।

এই অদ্ভুত মরুময় অবস্থার শিকার হওয়া সমরেশবাবুরা অতৃপ্তি থেকে একেই যদি বলেন 'বিকিয়ে যাওয়া', পাঠকরা বলব, 'আত্মোৎসর্গ'।

পৃথা বন্দ্যোপাধ্যায়
বাগবাজার, কলকাতা

সম্পাদকের তুষ্টিপাথর

'কালের কষ্টিপাথর' পড়তে মন্দ লাগে না। তবে নামটা 'কালের কষ্টিপাথর' না হয়ে 'সম্পাদকের তুষ্টিপাথর' হলেই ভালো হত। ফেব্রুয়ারি সংখ্যার মলাটে সম্পাদকের আঁকা ছবি, 'ক্ষণের বচন'-এও সম্পাদকের আঁকা ছবি, সম্পাদকীয়র নীচে সম্পাদকের স্বাক্ষর, সম্পাদকের লেখা ধারাবাহিক উপন্যাস, ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি, 'কেন লিখি'তেও ছবিসহ তিনি! আমার এই মন্তব্যের এমন ব্যাখ্যা যেন কেউ না করেন যে সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখাগুলো আমার ভালো লাগে না। ছবির বিষয়ে বলতে পারব না, কিন্তু তাঁর লেখা পড়তে মন্দ লাগে না। তাছাড়া আন্টার্কটিকা নিয়ে তাঁর ডকুমেন্টারি ফিল্ম ও তাঁর তোলা আরও কয়েকটি দেশের ছবির আমি ভক্ত। কিন্তু পত্রিকা জুড়ে সম্পাদকের এরকম একাধিক লেখা ও ছবির নজির বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে আর আছে কি?

প্রণবেশ ঘোষদস্তিদার
ধাত্রীগ্রাম, বর্ধমান

রাজকাহিনি

'কালের কষ্টিপাথর'-এর প্রত্যেক সংখ্যাতেই 'বুড়োক্রেজি' বিভাগটা পড়ছি। এর আগে এই পত্রিকায় বেরনো 'আমলাশাহি'ও পড়েছি নিয়মিত। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আকর্ষণ জিইয়ে রাখার মন্ত্র জানেন লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক যেমনভাবে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সংখ্যাতে রাজ্যপালের জন্য তৈরি করা হেলিকপ্টারের সিঁড়ি শেষপর্যন্ত যথার্থ পরিষেবা দিতে পারল কিনা, তা নিয়ে উদ্বেগ বজায় ছিল লেখাটির শেষ বাক্যটি পর্যন্ত। পাশাপাশি তাঁর এই লেখার সূত্রে একদিকে যেমন এদেশের আমলাদের চাকরিটা কেমন সেব্যাপারে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি হচ্ছে, তেমনই অনেক পুরনো মানুষ আর তাদের নিয়ে জড়িত স্মৃতির কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক নুরুল হাসানকেও সেভাবেই মনে পড়ে গেল। তিনি যখন রাজ্যপাল, আমরা তখন বোধহয় হাইস্কুলে। তাঁর বিপুল অবয়ব, অত্যন্ত নম্র স্নেহপ্রবণ ভালোমানুষের মতো মুখচোখ, গলাবন্ধ হালকা ঘিয়ে রঙের লংকোট মনে পড়ে। বিদ্বান মানুষটির বাড়িভর্তি বই, শুনেছিলাম। অনেকেই হয়তো জানেন না, অধ্যাপক হাসানের স্কুলজীবন কেটেছে এই কলকাতারই লা মার্টিনেয়ারে। পরে রাজ্যপাল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে এত জনপ্রিয় ছিলেন যে দু'দফায়, ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩-এ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালই থেকে গেলেন। এই রাজ্য, এই শহর আর তার সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল এক গভীর টান। লখনউয়ে জন্মালেও তাঁর প্রয়াণ হয় এই কল্লোলিনী শহরে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটি এক অর্থে এই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যের মতো লাগল।

অসিত ঘোষাল
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

বই-ঠেক

ফি রে প ড়া ব ই

চার্লস অ্যালেনের 'অশোকা'

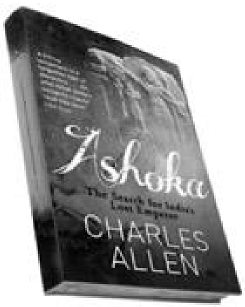

'অশোকা' লেখার আগে ব্রিটিশ লেখক ও ইতিহাসবেত্তা চার্লস অ্যালেন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত দুটি বই লেখেন, The Buddha and the Sahibs আর The Buddha and the Fuehrer। এই বই দুটি বুদ্ধকে পুনরাবিষ্কার করার ইতিহাস নিয়ে লেখা। এই পর্যায়ে ওঁর লেখা তৃতীয় বই 'অশোকা', কারণ বুদ্ধের সঙ্গে সম্রাট অশোকের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। লেখকের সব বই পাঠক মহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। এর প্রধান কারণ তিনি ইতিহাস পরিবেশন করেন সাধারণ পাঠকের জন্য। 'অশোকা' লেখার শৈলীতে বেশ একটা মজলিশি আমেজ আছে, গল্প শোনানোর আর শোনার।

ইতিহাসের পাতায় আমরা পড়েছি যে কলিঙ্গ জয়ের পর সম্রাট অশোক যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা দেখে এতটাই অনুতপ্ত হয়েছিলেন যে তিনি মনস্থ করেন তাঁর দেশজয়ের অস্ত্র হবে অহিংসা এবং তার জন্য তিনি শরণ নেন বৌদ্ধধর্মের। অহিংসার পথেই তিনি শেষপর্যন্ত আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সহ আসমুদ্র-হিমাচল ভারত উপমহাদেশের সম্রাট হয়ে ওঠেন। তার প্রমাণ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে, প্রত্যন্ত প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা স্তম্ভ ও শিলালেখগুলি, যার মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন। কিন্তু অশোকের বিষয়ে এ সব কোনও তথ্যই ১৮ শতকের শেষেও জানা ছিল না। অশোককে খুঁজে বার করার গৌরব সেই সব ভারতপ্রেমী ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের, যাঁরা সে সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে নিযুক্ত হয়ে ভারতে এসেছিলেন। এই খোঁজার কাজ কিন্তু সহজ ছিল না। শিলা ও স্তম্ভলেখ, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, বৌদ্ধ স্থাপত্যের ধ্বংসস্তূপ, প্রাচীন মুদ্রা এমন আরও কত সূত্র অশোক নামক 'জিগ স' ধাঁধার সমাধানে সাহায্য করেছিল। ওই সব সূত্র মুনশিয়ানার সঙ্গে যথাস্থানে সাজিয়ে লেখক অশোকের জীবনচিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর কৃতিত্ব সেখানেই। দ্য গারডিয়ান সংবাদপত্রে (১৬ মার্চ, ২০১২) এই বইটি আলোচনা করতে গিয়ে সমন্ত সুব্রমনিয়ন লিখেছেন, 'Allen is adept, if on occasion ploddingly so, at putting back together this vast academic jigsaw for our benefit.'

ধাঁধার শুরু পুরাণগুলি থেকে। যদিও মৌর্য বংশের রাজা চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক এবং তাঁর বংশধরদের নাম পুরাণে উল্লিখিত রাজাদের বংশতালিকায় পাওয়া যায়, তবে সম্রাট অশোক সম্পর্কে এর বেশি কোনও তথ্য পুরাণ বা অন্য প্রাচীন পুঁথিগুলিতে পাওয়া যায় না। এর কারণ বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শত্রুতা আর অশোক ছিলেন এই ধর্মের আদি ও প্রধান প্রচারক। আদি শঙ্করাচার্যের (৮ম শতাব্দী) আবির্ভাবের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে একেবারে কোণঠাসা করে দিয়েছিল— তবে হিংসার পথে নয়, বুদ্ধের অহিংস নীতির দ্বারা। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সেই পরাজয়ের কথাটা ভুলতে পারেনি তাই তার পুনরুত্থানের পর প্রাচীন ভারতের পুরাণ-ইতিহাসের বইগুলি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে নীরব থেকে তার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। চার্লস অ্যালেন লিখছেন, 'However, the most striking evidence of Brahmanical hostility towards Buddhism comes in the form of silence.' এই প্রসঙ্গে উনি আরও লিখেছেন, '...some of the most famous Hindu temples in India almost certainly began as Buddhist structures...'

> প্রস্তর স্তম্ভ ও শিলার ওপর অজানা লিপির পাঠ উদ্ধার করে অশোকের ইতিহাস জনসমক্ষে আনায় যাঁর সর্বাধিক অবদান তাঁর নাম জেমস প্রিন্সেপ। এ-কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিল কোম্পানির কর্মীরা, যাঁরা ভারতের আনাচ-কানাচে ঘুরে বেড়াতেন এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিলালেখের প্রতিলিপি তৈরি করতেন।

এই নীরবতার কঠিন আবরণ ভেদ করার উদ্যোগ সর্বপ্রথম নেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। ১৭৮৪ সালে তিনি স্থাপন করেন এশিয়াটিক সোসাইটি এবং এর জন্য জোন্স সাহায্য পেয়েছিলেন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য প্রাচীন ভারত সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা, কারণ ইসলামি শাসন কায়েম হওয়ার আগেকার ভারতের ইতিহাস কিছু কিছু পাওয়া গেলেও খ্রিস্টপূর্ব ভারতের ইতিহাস ছিল গভীর তমসাবৃত। ততদিনে জোন্স সংস্কৃত বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন এবং মনুস্মৃতির অনুবাদও শুরু করেছিলেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটা কথা না লিখে থাকতে পারছি না। লন্ডনের সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে বহু ইংরেজ মনীষীর মানুষপ্রমাণ মূর্তির মধ্যে স্যার উইলিয়াম জোন্সেরও শ্বেত পাথরের মূর্তি রয়েছে; এক হাতে ধরা তাঁর মানসপুত্র এশিয়াটিক সোসাইটির খসড়া অন্য হাতে মনুস্মৃতির অনুবাদ। কলকাতার উচ্চ আদালতের বিচারক ভারতপ্রেমী জোন্স হিন্দু আইন বোঝবার জন্য মনুস্মৃতির অনুবাদ করেছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে ভারতবন্ধুদের সাহায্যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ক্রমশ উদ্ঘাটিত হতে থাকে এবং এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল ভারতের নিখোঁজ সম্রাট অশোকের খোঁজ।

ভারতের লুপ্ত ইতিহাস জানার জন্য দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে থাকা স্তম্ভ (সে সময় স্তম্ভগুলিকে লোকে মনে করত ভীমের লাঠি!) ও শিলার ওপর এবং গুহায় খোদিত অজানা লিপি উদ্ধারের চেষ্টা চলতে থাকে। প্রথম দিকে কারও কারও মনে হয়েছে আলেকজান্ডারের আক্রমণের সঙ্গে জড়িত এ-এক প্রাচীন গ্রিক লিপি। অন্য আরেকটি ধারণা হল, বুদ্ধ সম্ভবত খ্রিস্টের জন্মের হাজার বছর আগে ইথিওপিয়া থেকে আগত এক বিজেতা বা ধর্মপ্রচারক ছিলেন, আর স্তম্ভের ওপর লেখাগুলি ইথিওপিয়ান। জোন্সেরও তাই মনে হওয়ায় তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর লেখা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীলঙ্কা,

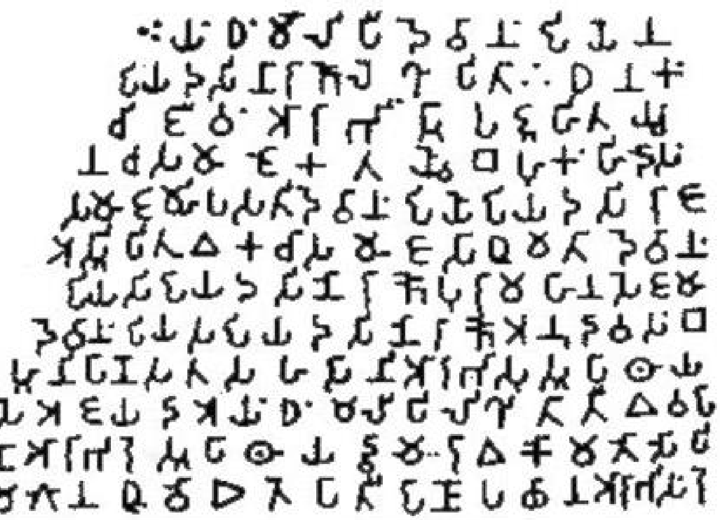

অশোকের প্রথম উদ্ধার হওয়া শিলালেখের প্রতিলিপি

ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত থেকে কোম্পানির কর্মীদের প্রতিক্রিয়া আসে— তাঁরা জানান যে উপমহাদেশের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বৌদ্ধগ্রন্থ পাওয়া যায়, এবং সেগুলির ভাষা হয় সংস্কৃত নয় পালি।

প্রস্তর স্তম্ভ ও শিলার ওপর অজানা লিপির পাঠ উদ্ধার করে অশোকের ইতিহাস জনসমক্ষে আনায় যাঁর সর্বাধিক অবদান তাঁর নাম জেমস প্রিন্সেপ। এ-কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিল কোম্পানির কর্মীরা, যাঁরা ভারতের আনাচ-কানাচে ঘুরে বেড়াতেন এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিলালেখের প্রতিলিপি তৈরি করতেন। এক সাহেব, মারখাম কিটো তো উড়িষ্যার জঙ্গলে এই কাজ করতে গিয়ে ভালুকের খপ্পরে পড়েছিলেন। আরেকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন জেমস টড। ইনি গুজরাটের গিরনার পাহাড়ের ওপর শিলালেখের প্রতিলিপি তৈরি করেন। প্রতিলিপি করা সহজ ছিল না। একে তো শিলালিপিটি এক উঁচু পাহাড়ের ঢাল জুড়ে লেখা, তার ওপর এককেটি অক্ষরের আয়তন প্রায় দু-ফুট। গিরনার শিলার চূড়া থেকে দড়ির সাহায্যে ঝোলানো পাটাতনের ওপর বসে তিনি এই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

লিপির পাঠোদ্ধার করার পর দেখা গেল প্রতিটি লেখ শুরু হয়েছে একই ভাবে— দেবানামপিয় পিয়দসি লাজা হেবম আহ— দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এ কথা বলেন। ভারতে এই নামে কোনও রাজার খোঁজ পাওয়া যায়নি, তবে প্রিয়দর্শী নামে এক রাজার হদিশ সিংহল দ্বীপে (শ্রীলঙ্কায়) পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে এই রাজাকে খাপ খাওয়ানো যাচ্ছিল না। সেই সময় কলম্বো থেকে সিলোন সিভিল সার্ভিসের এক ব্রিটিশ কর্মচারী, জর্জ টারনার জানান যে সিংহলে প্রাপ্ত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ দ্বীপবংশের এক জায়গায় লেখা আছে, 'বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়ার ২১৮ বছর পরে চন্দ্রগুপ্তের নাতি ও বিন্দুসারের পুত্র এবং উজ্জয়িনীর রাজপ্রতিনিধি পিয়দর্সির অভিষেক হয়'। এবার আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, পুরাণে উল্লিখিত চন্দ্রগুপ্তের নাতি অশোকের আরেক নাম প্রিয়দর্শী। এই লিপির নাম দেওয়া হয় অশোকা ব্রাহ্মী।

বুদ্ধের জীবনী এবং তাঁর বাণী প্রচারে অশোকের অবদানের কথাও জানতে পারা যায় দ্বীপবংশ ও মহাবংশ বই দুটি থেকে, কারণ প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থগুলিতে মাঝে মধ্যে বুদ্ধের উল্লেখ থাকলেও তাঁকে প্রচলিত ধর্মবিরোধী 'হেরেটিক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ বা বৌদ্ধ ভাস্কর্যের ব্যাপারে প্রাচীন গ্রন্থগুলির মুখে একেবারে কুলুপ আঁটা।

অশোকের ইতিহাস উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের গতিপথও জানতে পারা যায়। এই রহস্য উদ্ধারের সূত্র পাওয়া যায় তিব্বতে ও শ্রীলঙ্কায় রক্ষিত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থগুলি থেকে আর দুই চিনা অভিযাত্রী ফা-হিয়েন ও হিউ-এন-সাঙের লেখা থেকে। এছাড়া গ্রিক ঐতিহাসিকদের লেখা আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ইতিহাস, সংস্কৃত সাহিত্য, এছাড়া আগেই উল্লিখিত পুরাতাত্ত্বিক খনন এবং প্রাচীন মুদ্রা থেকে পাওয়া সূত্রগুলি এই গোলকধাঁধার ভেতরে প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের প্রবেশ করতে সাহায্য করেছিল। তাঁরা যেসব সূত্র থেকে অশোকের জীবনী গ্রন্থন করেছিলেন লেখক চার্লস অ্যালেন সেই তথ্যগুলি রহস্যকাহিনি উন্মোচনের মতো করে সাধারণ পাঠকদের জন্য পরিবেশন করেছেন। যার ফলে পরিশিষ্ট সমেত ৪২৫ পৃষ্ঠার বইটা একবার শুরু করলে শেষপর্যন্ত না পড়ে বন্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। নিখোঁজ সম্রাটকে কীভাবে খুঁজে পাওয়া গেল সেই অশোক-কথা ঐতিহাসিক রহস্যকাহিনির পর্যায়ে পড়ে।

পরিশিষ্টে অশোকের স্তম্ভ ও শিলালেখগুলির অনুবাদ একটি বাড়তি আকর্ষণ।

সান্ত্বনা বসু

• • •

প্লেটোর 'দি লাস্ট ডেজ অব সক্রেটিস'

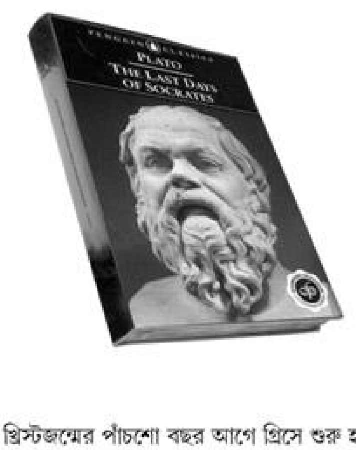

খ্রিস্টজন্মের পাঁচশো বছর আগে গ্রিসে শুরু হয় জ্ঞানচর্চার এক নতুন ও অনন্যসাধারণ অধ্যায়। প্রধানত এথেন্স শহরকে কেন্দ্র করে ঘটে দর্শন, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের অভাবনীয় বিকাশ, আর্কেলাস, অ্যানাক্সগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো প্রমুখ দার্শনিকের আবির্ভাব যার উজ্জ্বল ফল। সক্রেটিসের জন্ম এথেন্সে, ৪৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কথিত আছে, তাঁর এক বন্ধু ডেলফির 'Oracle'-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, পৃথিবীতে সক্রেটিসের চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ আছে কিনা। সে উত্তর পেয়েছিল, না। সক্রেটিস তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞা বিনিময় করতেন এথেন্সবাসীর সঙ্গে। কিন্তু তাঁর মতাদর্শ ছিল সমকালীন রাষ্ট্রের ঈশ্বরচিন্তা ও প্রচারের বিপরীত। তাই ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কয়েকজন ক্ষমতাশালী এথেন্সবাসী— মেলিটাস, অ্যানিটাস ও লিকন, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন। অভিযোগটি এইরকম: 'Socrates is guilty of

সক্রেটিস এবং প্লেটো। র‍্যাফায়েলের আঁকা 'স্কুল অব আথেন্স, ১৫১০-১১'-এর একাংশ

corrupting the minds of the young, and of believing in deities of his own invention instead of the gods recognized by the state.' এবং বিচারে তাঁকে হেমলক বিষপানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সক্রেটিসের মৃত্যুতে তাঁর অন্যতম প্রিয় ও বিখ্যাত শিষ্য প্লেটো অত্যন্ত মর্মাহত হন। প্লেটো কবি, তাই কবিতায় গুরুর স্মৃতিচারণ করতে পারতেন, সেটা স্বাভাবিকও ছিল। কিন্তু বিতর্কপ্রিয় গ্রিকদের জন্য তিনি গ্রহণ করলেন এক অভিনব আঙ্গিক— নাটকীয় সংলাপের মধ্য দিয়ে ধরে রাখতে চাইলেন সক্রেটিসের দর্শন ও প্রজ্ঞা, ঠিক যেরকম সহজ কথোপকথনের মাধ্যমে সক্রেটিস আজীবন তাঁর জ্ঞান বিতরণ করেছেন। এরকম চারটি 'ডায়ালগ' বা সংলাপের সংকলন এই গ্রন্থ— 'দি লাস্ট ডেজ অব সক্রেটিস'।

প্রথম সংলাপ 'Socrates in Action: Euthyphro'. বিচারের আগে কোর্টরুমের বাইরে সক্রেটিসের দেখা হল এউথিফ্রোর সঙ্গে। এউথিফ্রো একজন ধার্মিক ও জ্ঞানী মানুষ। তিনি নিজের বাবাকে একজন চাকরকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করতে চলেছেন। একথা শুনে সক্রেটিস খুবই বিস্মিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন এউথিফ্রোর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে কীভাবে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গতিপূর্ণ। তখন তাঁরা আলোচনা করলেন ধর্মনিষ্ঠার প্রকৃত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

দ্বিতীয় সংলাপ 'Socrates on Trial: The Apology'. এই অংশটি ঠিক কথোপকথন নয়, বিচারকদের সামনে সক্রেটিস প্রধানত একাই কথা বলেছেন এবং অসাধারণ যুক্তিপরম্পরায় একে একে খণ্ডন করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগ। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই সংলাপে তিনটি স্বতন্ত্র বক্তৃতা আছে। এই বক্তৃতাগুলিতে শুধু তাঁর প্রজ্ঞাই প্রতিফলিত হয় না, পাওয়া যায় মৃত্যুভয়োত্তীর্ণ এক প্রকৃত দার্শনিককে। তিনি বলেছেন: 'I believe he (a man) is bound to remain and face the danger, taking no account of death or anything else before dishonour.' বা '... to be afraid of death is only another form of thinking that one is wise when one is not.' তাঁর এই সাহসী সত্যবাদিতা স্বাভাবিকভাবেই রক্ষণশীল বিচারক ও জুরিদের পছন্দ হয়নি। সক্রেটিস নিজেও সেটা জানতেন, তাই তাদেরকে সরাসরি বলেছেন: '... I have refused to address you in the way which would give you most pleasure. You would have liked to hear me weep and wail, doing and saying all sorts of things which I regard as unworthy of myself, but which you are used to hearing from other people.' তাই এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচার-প্রহসনের পরিণতি হল: 'The jury decides for the death penalty.' কিন্তু এই চরম সিদ্ধান্ত সক্রেটিসকে কণামাত্রও বিচলিত করতে পারেনি। কেননা মৃত্যু তাঁর কাছে ছিল 'a migration of soul from this place to another.'

> হেমলকের কাপ হাতে তুলে নিয়ে পান করার সময় সক্রেটিসের মুখের বর্ণ থাকে অপরিবর্তিত; তিনি শুধু প্রার্থনা করলেন, 'এই বস্তুলোক থেকে অন্যলোকের পথে আমার যাত্রা আনন্দময় হোক' আর মৃত্যুর ঠিক আগে ক্রিটোকে বললেন, 'এসলেপিয়াসের কাছে আমাদের একটা মোরগ উৎসর্গ করা উচিত, দেখো, যেন ভুলে যেও না।'

সাধারণত এথেন্সে মৃত্যুদণ্ড বিচারের পরেই কার্যকর করা হত। কিন্তু সক্রেটিসের বিচারের আগের দিন বিশেষ উপলক্ষে এথেন্স থেকে ডেলস-এ একটি জাহাজ যাত্রা করে, যা ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনও মৃত্যুদণ্ডই কার্যকর হত না। তাই সক্রেটিসকে কিছুদিন কারাগারে থাকতে হয়। অভিযোগকারী ও বিচারকরা এটা আগেই জানতেন এবং সম্ভবত এটাই তাঁরা চেয়েছিলেন যে জেলে থাকার সময় কোনও সুযোগ পেয়ে যাতে সক্রেটিস পালিয়ে দেশত্যাগ করে। বন্ধু ক্রিটো পালানোর সমস্ত পরিকল্পনা করে সক্রেটিসকে বহু অনুরোধ করেন, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এই অনুরোধ ও অনুরোধের প্রত্যাখ্যানই হল তৃতীয় সংলাপ 'Socrates in Prison: Crito.'

তারপর, অন্তিম দিনে, সক্রেটিসকে ঘিরে রয়েছেন তাঁর বন্ধুরা, সকলের হৃদয় যন্ত্রণাকাতর, মুখে সে যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি, আর সক্রেটিস নিরুদ্বিগ্ন, শান্ত চিত্তে, সাবলীলভাবে সবার সঙ্গে কথা বলছেন, যেমন অন্য যে-কোনওদিন বলতেন, যেভাবে অন্য অনেক সময়ে বলেছেন, জীবন, আত্মা ও অমরত্ব সম্বন্ধে। ওই বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন ফেডো, যিনি পরে অন্যান্য দার্শনিকদের কাছে এই মুহূর্তটিকে বর্ণনা করেছেন সংলাপের আকারে। তাই চতুর্থ সংলাপ 'The Last Conversation: Phaedo'-তে আছে একটি সংলাপের ভেতরে আরেকটি সংলাপ। বস্তুত এই অংশটি এক মহৎ মৃত্যুর

'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন— আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী এক মৃত্যুবিলাসী দার্শনিকের জীবনকে ভালোবাসার দর্শন।

ফেডো বর্ণনা করেছেন, খাটের ওপরে বসে নিজের পা টিপতে টিপতে সক্রেটিস সকৌতুকে বললেন: 'What a queer thing it is, pleasure! It is remarkable how closely it is connected with its conventional opposite, pain. ...if you pursue one of them and catch it, you are nearly always compelled to have the other as well.' মনে পড়ে যায় উপনিষদে উদ্ধৃত শোক ও আনন্দে সমানভাবে অবিচলিত সেই ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষের কথা। মৃত্যু-উত্তীর্ণ মানুষই একমাত্র বলতে পারে '... one should make one's end in a tranquil frame of mind.' তাই হেমলকের কাপ হাতে তুলে নিয়ে পান করার সময় সক্রেটিসের মুখের বর্ণ থাকে অপরিবর্তিত; তিনি শুধু প্রার্থনা করলেন, 'এই বস্তুলোক থেকে অন্যলোকের পথে আমার যাত্রা আনন্দময় হোক' আর মৃত্যুর ঠিক আগে ক্রিটোকে বললেন, 'এসলেপিয়াসের কাছে আমাদের একটা মোরগ উৎসর্গ করা উচিত, দেখো, যেন ভুলে যেও না।'

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন'

পাঁচটি অঙ্কে বিরচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নাট্যরূপ, 'বিসর্জন', ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। এর আখ্যানভাগ নিম্নরূপ:

'ত্রিপুরার রাজা, গোবিন্দমাণিক্যের পত্নী, নিঃসন্তানা গুণবতীর সন্তানলাভের কাতর-প্রার্থনার মধ্য দিয়ে 'বিসর্জন' নাটকের সূচনা— তিনি 'পাষাণতনয়া', 'ইচ্ছাময়ী', মহামায়ার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধও— ''করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশো মহিষ, তিনশত ছাগ।'' পূজার সময় উপস্থিত— পূজারি রঘুপতিও প্রস্তুত। এমতোসময়ে, মন্দিরে বলিপ্রদত্ত ক্ষুদ্র ছাগশিশুর পালিকা, মাতৃস্বরূপা, দরিদ্র বালিকা, 'ভিখারিনী' অপর্ণার কাতর ক্রন্দনধ্বনি শুনে রাজা গোবিন্দমাণিক্য অনুভব করেন— বালিকার মূর্তি ধরে স্বয়ং জননী মহামায়াই এসেছেন তাঁর কাছে; কারণ— ''জীবরক্ত সহে না তাঁহার।'' তাই তিনি আদেশ দেন ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর মন্দিরে বলি নিষিদ্ধ করতে এবং যে পশুবলি দেবে, তারই হবে— 'নির্বাসনদণ্ড'। কিন্তু এ আদেশ মানতে চান না প্রবল প্রতাপান্বিত পুরোহিত রঘুপতি। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মহারানি গুণবতীর পূজাও ফিরে আসে মাতৃদ্বার থেকে। ফলত, নাটকে প্রেম-প্রতাপের দ্বন্দ্ব তথা রাজা গোবিন্দমাণিক্য এবং রঘুপতি-গুণবতীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এই প্রবল দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিতেও রানি গুণবতীর কাছে প্রেমিক রাজার অসহায় কাতর উচ্চারণটি পাঠকের শ্রুতির অগোচর হয় না— ''হায় মহারাণী, কর্তব্য কঠিন হয়। তোমরা ফিরালে মুখ।'' রঘুপতি ত্রিপুরা রাজ্যের সেনাপতি নয়নরায়কে নির্দেশ দেন মায়ের কাজে রাজ্যের সকল বল একত্রিত করতে এবং 'মাতৃবিদ্রোহী'কে নাশ করতে। রাজা গোবিন্দমাণিক্যও মন্দিরদ্বারে সৈন্য-মোতায়েনের নির্দেশ দেন এবং বিরোধী নয়নরায়ের সেনাপতিত্ব, রাজভক্ত দেওয়ান, চাঁদপালের ওপর অর্পণ করেন। রঘুপতি এদিকে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠভ্রাতা, নক্ষত্ররায়কে ত্রিপুরার 'রাজা' করার আশ্বাস দিয়ে দেবীর কাছে 'রাজরক্ত' এনে দিতে বলেন। এই কথায় নক্ষত্ররায় যেমন দ্বিধায়িত, তার চেয়েও বেশি সংশয়ক্লিষ্ট রঘুপতি-পালিত যুবক জয়সিংহ।— ''ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!'' জয়সিংহ তখন রঘুপতিকে প্রতিশ্রুতি দেন— ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা তিনি ঘটতে দেবেন না, 'রাজরক্ত' তিনিই এনে দেবেন। এদিকে, 'ভিখারিনী' অপর্ণা মাঝেমধ্যেই আসে

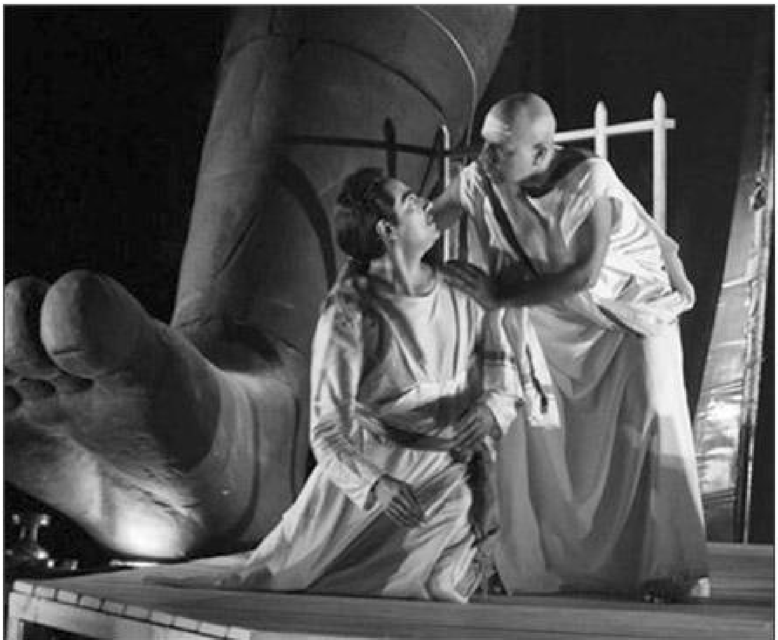

সুমন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বিসর্জন' নাটকে কৌশিক সেন এবং গৌতম হালদার

জয়সিংহের খোঁজে, জয়সিংহকে সে বারবার হিংসার মন্দির ত্যাগ করার কথা বলে, কিন্তু রঘুপতির প্রবল প্রতাপের কাছে সে-ও যেন পরাজিত; তাই অপর্ণা অভিশাপ দেয় রঘুপতিকে, তার ব্রাহ্মণত্বকে— "এ বন্ধনে জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।" প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ রঘুপতি থেমে থাকেননি, তিনি দেবীমূর্তির পশ্চাতে নিজের উচ্চারণই দেবীমুখে শুনিয়েছেন; মিথ্যাচার করেছেন। কিন্তু রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কাছে এই মিথ্যাচার ধরা পড়ে গেছে। রঘুপতির এই মিথ্যাচরণে জয়সিংহ ব্যথিত। কিন্তু রঘুপতি পালিত পুত্রের কাছ থেকেও শ্রাবণের শেষরাত্রে দেবীর চরণে রাজরক্ত এনে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা আদায় করে নিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইতিমধ্যে মায়ের পূজা দেখতে এসে বিরত ত্রিপুরার প্রজাগণ গোবিন্দমাণিক্যের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালে গোবিন্দমাণিক্য তাদের সাধ্যমতো বোঝানোর চেষ্টা করেন— জীবজননীর পূজা জীবরক্ত দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা বুঝতে চায় না— রঘুপতির চক্রান্তই আরও তাদেরকে ভুল বোঝায়। কিন্তু রঘুপতির প্রতিমামূর্তি ফিরিয়ে রেখে ভক্তের প্রতি দেবীর বিমুখতা প্রমাণ করার চক্রান্ত আবার ব্যর্থ হয়ে যায় অপর্ণার অনুপ্রবেশে। তবুও রঘুপতির ক্ষমতা অপরিসীম। প্রজাদের তিনি কুমন্ত্রণা দিয়ে রাজাকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করে দেওয়ার আদেশ দেন— এইসব সংবাদ চাঁদপালের মাধ্যমে গোবিন্দমাণিক্যের কাছে পৌঁছলে, গোবিন্দমাণিক্য মদ্যপানে অচৈতন্য রঘুপতি এবং নক্ষত্ররায়কে নির্বাসনদণ্ড দেন অষ্টবর্ষ। রঘুপতি তখন নিজেকে 'দীন', 'অভাজন' বলে ক্ষমাপ্রার্থী হন। এদিকে রাজার এক প্রধান সহচর চাঁদপালও

নির্বাসিত ব্রাহ্মণ পুরোহিত রঘুপতির গর্ব গেছে, গেছে তেজ, ব্রাহ্মণত্ব। জয়সিংহের গুরু বলেও তিনি আর নিজেকে চিহ্নিত করতে চান না। কিন্তু, জয়সিংহ গুরু রঘুপতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে— সে রাজরক্ত এনে দিয়েছে আত্মহননের মধ্য দিয়ে; কেননা— সে রাজপুত...

শেষপর্যন্ত রাজাকেই রাজ্যচ্যুত করার জন্য মোগলদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে— এই সংবাদ পূর্বসেনাপতি নয়নরায়ের কাছে পেয়ে নয়নরায়কেই পুনরায় সেনাপতির পদবরণ করে নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে রক্ষা করতে বলেন গোবিন্দমাণিক্য। এদিকে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে রাজভ্রাতা নির্বাসিত নক্ষত্ররায়ও, তিনিই গোবিন্দমাণিক্যকে পাঠানো হস্তলিপিতে জানিয়েছেন রাজার নির্বাসনের কথা। এদিকে নির্বাসিত ব্রাহ্মণ পুরোহিত রঘুপতির গর্ব গেছে, গেছে তেজ, ব্রাহ্মণত্ব। জয়সিংহের গুরু বলেও তিনি আর নিজেকে চিহ্নিত করতে চান না। কিন্তু, জয়সিংহ গুরু রঘুপতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে— সে রাজরক্ত এনে দিয়েছে আত্মহননের মধ্য দিয়ে; কেননা— সে রাজপুত; তার পূর্বপিতামহ ছিল রাজা; মাতামহ বংশ এখনও রাজত্বে আসীন। 'একমাত্রপ্রাণস্বরূপ', 'প্রাণাধিক', 'জীবন-মন্থন-করা ধন' এই জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতি শুধু পাগল নন, তিনি নবচৈতন্যবোধে জাগরিত— তাই প্রাণাধিকের প্রাণহরণকারী 'রাক্ষসী', 'পিশাচী', 'মহারাক্ষসী' মহামায়ার প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছেন তিনি। রানি গুণবতী দেবীকে দেখতে এসে তাই দেখতে পান না। দেবীর মধ্যে দেবীত্বের অস্বীকার— রঘুপতির এই মনোভাব গুণবতীর মনকে আলোড়িত করে। তাই তিনি শেষপর্যন্ত নিজস্বামী, রাজা গোবিন্দমাণিক্যকেই 'দেবতা' বলে মানেন। গোবিন্দমাণিক্যও নিজের দেবীরই মধ্যে দেবীকে খুঁজে পেলেন। 'পিতা' রঘুপতি বালিকা অপর্ণার মধ্যে দেখলেন তার পূজ্য জননী মহামায়ার প্রত্যক্ষ প্রতিমাকেই। প্রেম-প্রতাপের হিংসাত্মক দ্বন্দ্বের হল অবসান; নাট্যপরিণতিতে গোবিন্দমাণিক্য কথিত 'প্রেম'ই হল জয়যুক্ত।

অপরাজিতা রায় (আচার্য)

রেজিস্ট্রেশন অব নিউজপেপারস (সেন্ট্রাল) রুলস ১৯৫৬-এর ৮ম ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে:
১। প্রকাশস্থান: ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
২। প্রকাশকাল: মাসিক
৩। প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।
নাগরিকত্ব: ভারতীয়।
ঠিকানা: ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
৪। সম্পাদকের নাম: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
নাগরিকত্ব: ভারতীয়।
ঠিকানা: ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
৫। যেসব ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং অংশীদার অথবা যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও বেশি শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা:
(ক) মালিক: স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও বেশি শেয়ারের অধিকারী:
১। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
২। সর্বাণী চক্রবর্তী, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
৩। মহাশ্বেতা সমাজদার, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
৪। মৈত্রেয়ী নাগ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
আমি অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যাবলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।
স্বা:
প্রকাশক
১ মার্চ, ২০১৩

বি শে ষ সং ক ল ন

কেন লিখি

কমল চক্রবর্তী

দেবারতি মিত্র

বিপ্লব মাজী

কৃষ্ণা বসু

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

লীনা চাকী

সৈয়দ কওসর জামাল

নলিনী বেরা

প্রচেত গুপ্ত

রবিশঙ্কর বল

'কেন লিখি'— সমস্ত সৎ লেখকের কাছে এ এক অবশ্যম্ভাবী আত্মজিজ্ঞাসা। এই প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছিল এ সময়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকদের কাছে। তাঁরা জানিয়েছেন তাঁদের নিরপেক্ষ মতবাদ, অভিব্যক্তি। আর সেইসব লেখা নিয়েই 'জ্বলদর্চি' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 'কেন লিখি'। প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। এ সংখ্যায় লিখেছেন শক্তিপদ রাজগুরু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ মজুমদার, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, কমল চক্রবর্তী, দেবারতি মিত্র, কৃষ্ণা বসু, শ্যামলকান্তি দাশ, সন্দীপ দত্ত, জাহিরুল হাসান, জয় গোস্বামী, হর্ষ দত্ত, সুবোধ সরকার, পিনাকী ঠাকুর, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মন্দাক্রান্তা সেন, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, মউলি মিশ্র প্রমুখ।

*তাই তো! এ সময়ের লেখকরা কেমন করে ভাবছেন, কী ভাবছেন! তাঁরা কেন নিরন্তর কলম সচল রেখেছেন— এসব তো শুধুমাত্র লেখকেরই আত্মজিজ্ঞাসা নয়, একই সঙ্গে পাঠকেরও চিরন্তন কৌতূহল। 'জ্বলদর্চি'-র 'কেন লিখি' বিশেষ সংখ্যা থেকে 'কালের কষ্টিপাথর'-এর পাঠকের জন্য গত ১৬ নভেম্বর, ২০১২ ও ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সংখ্যায় তুলে দিয়েছিলাম নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, পবিত্র সরকার, সুবোধ সরকার, অনিল ঘড়াই, মনোজ মিত্র, নবনীতা দেবসেন, দিব্যেন্দু পালিত, সুভাষ ভট্টাচার্য, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, শ্যামলকান্তি দাশ, জয় গোস্বামী, অনীতা অগ্নিহোত্রী ও মন্দাক্রান্তা সেনের উত্তর। আমাদের আগ্রহে ও সম্পাদকের আন্তরিক সম্মতিতে এই সংখ্যায় আরও কয়েকজনের উত্তর ছাপা হল। —**ঋত্বিক ত্রিপাঠী** (সম্পাদক 'জ্বলদর্চি')।*

যাঁরা পুরো সংখ্যাটাই পেতে ও পড়তে চান তাঁরা সরাসরি ফোন করতে পারেন: ঋত্বিক ত্রিপাঠী, মোবাইল: ৯৭৩২৫-৩৪৪৮৪।

বিমূর্ত জাগলারি

কমল চক্রবর্তী
(১৯৪৬)

আমার রচনায় কোন অক্ষর-মালা বা বাক্যবন্ধই দ্বিতীয়বার চিনতে পারি না। লেখার জন্য কোনও তাগিদ বা বিশেষ চাপ, কখনও না। কোনও 'নির্মাণ' শুরু করার বা শেষ করারও কার্যকারণ নেই। লেখক, লেখনি, প্রয়াস, প্রকরণ নেই। ফলে লজিক, দায়বদ্ধতা, আদর্শ নেই।

আমার বাসস্থান অর্থাৎ ডাক যোগাযোগ, যেখানে বড় হয়েছি, সেখানে লেখাপত্র খুব একটা কম্মের নয়। লেখক, কবি হওয়ার স্বপ্ন, হয়ত দুএকজনই দেখেছেন, বাই ডিফল্ট তারা কৌরবের। মানে যেখানে আমার গত পঞ্চাশ ষাট বছরের দিনগুলি, রাতগুলি। সেখানে সারাদিন চিমনির ধোঁয়া আর লোহালক্করের পরিত্রাহী। কাগজ কলমের শব্দ নেই। হ্যাঁ, তার মধ্যেই আমার কলকারখানার ক্যালেণ্ডার।

ফলে, কেন লিখি, এই জাতীয় প্রশ্নে যে বোধ জাগে— না লিখে পারি না/ কেউ লেখায়/ লেখার জন্যই জেগে উঠি/ অনিবার্য লেখক কবি হতেই চেয়েছি/ কলমই আমার জীবন আমার ভাষা/ মানুষের জন্য লিখি/ সাহিত্যের অগ্রগতির জন্য লিখি/ অর্থের জন্য লিখি/ জীবন দেবতা লেখায়/ বংশের ঐতিহ্য/ একদিন কানুদা বল্লেন লেখ/ সভ্যতা ও দর্শনের শ্রীবৃদ্ধি, ইত্যাকার কোন ভাবনার শরিক, না।

তবু ১৯/২০টি উপন্যাস, এক দেড় হাজার গল্প, হাজার তিন চার কবিতা, ফ্রি গদ্য, প্রবন্ধও হাজারখানেক, কবে যে! বয়স কম হয়নি। যে বয়সে সুকুমার রায় দেহ রেখেছেন, প্রায় তার ডবল। এখনও লিখছি। যা হোক, পণ্ডশ্রম হে! এই মর্মে আমার মনে হয়, হঠাৎ হঠাৎ কিছু শব্দবন্ধ, কিছু আনতাবড়ি গল্পগাছা, হুড়ুম তাড়ুম! এর না আছে গ্রামার, না আছে কার্যকারণ, ব্যাকরণ সিং ব্যা! দুত্তোরি, এতোল বেতোল। ঠিকঠাক চেপে ধরলে, ভ্যা, কান্না ছাড়া উপায় নেই। পারফেক্ট ইডিয়ট। না হলে কেউ শারদীয় মারহাব্বা সাহিত্যপত্রর নন্দন আহা, ত্যাগ! যখন কিনা 'ঠাঁই পাবার' ইঁদুর দৌড়ে ক্লান্ত, স্প্রিন্টার, ম্যারাথন বীর অসংখ্য। বোঝা যাচ্ছে উইদড্রল সিস্টেমে অভ্যস্ত। কত্তম না থাকলে যে ভাবে, হ্যাঁ।

এই জাগলারির জন্যই, 'পাঠক', না। নেই হে! নেই।

হচ্ছিল কি, বক বক করার অভ্যেস। বস্তুত আবোল তাবোল। তাতে মাল মশলা বিশেষ, না। ঐ, চল পানসি বেলঘরিয়া। না হলে ভাবা যাক, কারখানায় বত্রিশ বছর। কারখানার লেদ, গীয়ার, চিমনি, স্ল্যাস, কবিতায়, ওঃ। গল্পগুলোও হিজড়ে, কুকুর, পাপ, পেপার কাটিং। পাক্কা গ্রুপ-ডি ওয়ার্কার। কত যে উদাহরণ দেব, বড়, ছোট, মেজ কাগজে, তলব এলো, না, না, না! এক তো সময়! আড্ডা, সেক্স, ভায়োলেন্স! এবং ইদানীং গরু, ছাগল, মুরগি, গাছপালা, ছেলেপুলে, ভিক্ষেটিক্ষে, হয় না! স্পষ্ট কথা 'লিখি না'। 'লেখা' মানে যা বোঝায়, না। তার জন্য, পরিবেশ, জানলা, গান, সুন্দরী, মদ, ভ্রমণ, বিদেশযাত্রা, পঠন-পাঠন, তোল্লা, ঘন ঘন পুরস্কার, পাঠক পরিবৃত, সুন্দর-ভুবন, একটাও নেই। আমি যে ঘরে থাকি, দুটো জানলা, গত ছ-বছর ধরে বন্ধ। রাতেও, একমাত্র দরজাটি, হ্যাঁ। ঘুলঘুলি ছিল, মেঠো ইঁদুরের তরাসে, সিমেন্ট। ৫০°/৫১°/৫২° সেলসিয়াস, যখন বিদ্যুৎহীন হঠাৎ মধ্যরাত,

মশার কামড় (মশারি ও কয়েল ব্যবহার নেই) বোধহীন অজ্ঞান-ঘুম। কারণ এসি আজও নেই।

হ্যাঁ যে সব লেখাপত্র হয়েছে, বুঝেছি, কালের পটি-গর্তে, ফ্লাশ সক্রিয়। কোন ডিমাণ্ড নেই, হতাশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই (শুধু ভাবি বাংলা ভাষা যেন বাঁচে! সন্দেহ!) কারণ, যে মর্মে 'লেখা' তা তো করিনি। পার্থসারথি চৌধুরী বলেছিলেন, 'তুমি পারবে না। তোমার দ্বারা হবে না। তুমি একটা 'রমলা' বা 'বেগম মেরী বিশ্বাস' লিখে দেখাও।' একবার 'কেন লিখি' হতে হতেও হয়নি। যেবার হাতের কাছে ঐ গ্রন্থ দুটি পাব ও রিমেক অনিবার্য প্রায়, কিংবা 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ'। নাঃ!

ফলে সকালে যেমতি, কর্পোরেশনের সাফাই কর্মী, জমে থাকা বর্জ্য বেলচায়, তেমতি আমার মগজের রাবিশ, শাদা কাগজে। এতটাই হেলাফেলা যে কলেজ স্ট্রিটের চকবাজারে মাল সওদা হয়নি। দু-তিন জন জম্পেশ ডাকসাইটের মুসাবেদায় ভবি ভোলেনি। 'কেন লিখি' গছান যায়নি। নিজের খেলা, নিজের ন লক্ষে, (অর্জিত জমান, N.S.C., F.D ভেঙে)। যা কানা, কালো, ল্যাংড়া বা বোবা মেয়েটির ক্ষেত্রে। হোল তো! আসলে, চলছি ফিরছি, দু-চারটে করে শব্দ জমছে। থাকে, চলে যায়। ঐ কখনও সময় সুযোগ এবং মুড, তবে অক্ষরে রূপান্তর। এবং এইসব অক্ষরের না আছে অর্থ না সমর্থ। টাইম পাস। এতেই দু-চারটে তা তা থৈ থৈ, বাপরে!

'কেন লিখি'র 'বিমূর্ত-ঠেক' আজ অবধি! ওঃ! বুঝে উঠতে পারিনি।

কবিতার কারণ-অকারণ

দেবারতি মিত্র
(১৯৪৬)

লাট্টু পাহাড়, ছাতু পাহাড়ের দেশ মিহিজাম— পেয়ারা গাছে, আতা গাছে ঘেরা, হলদে লাল ক্যানাফুল ফুটে থাকা বাগান। টকটকে লাল ঝুঁটি, আমার মাথায় মাথায় সমান, ছুটে আসছে লালু মোরগ আমার দিকে— তখনো ভয় পেতে শিখিনি, আমার বয়স এই দু'আড়াই বছর। আমরা মামার বাড়ির নিজের বাড়ির সবাই মিলে বেড়াতে এসেছি মিহিজামে শীতের ছুটিতে। এগারোটা মুর্গির কর্তা লালু মোরগ কেন এমন করে তেড়ে আসত আমার দিকে ছেলেবেলায়, তাই তো আমি কবিতায় লিখতে চেষ্টা করি।

ছ সাত বছর বয়সে টালিগঞ্জের ছাদ থেকে শুনেছিলাম বল হরি হরিবোল ধ্বনি। রাজরাজেশ্বরী, দুপায়ে আলতা, সিঁথিতে একরাশ সিঁদুর চলে যাচ্ছে কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে। ভয়ংকর ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম, অসম্ভব ঘৃণা করতে শিখি মৃত্যুকে, অবিশ্বাস করতে শিখি। সে একে একে সব আত্মীয়স্বজন, বন্ধু প্রিয়জন আমার ছোট বোন বেদাঙ্গলিকেও নিয়ে যাবে সেদিনই যেন বুঝতে পেরেছিলাম। অকথ্য বেদনার কথা মুখ ফুটে বলা যায় না, অব্যক্ত স্বর বেরোতে গিয়েও বেরোয় না, তবুও গোঙাই, অস্পষ্ট চিৎকার করি। কাঁদি না, তবু চোখের জলে খাতার পাতা ভিজে যায়। কবিতার মতো কিছু লিখতে ইচ্ছে করে।

সন্ধেবেলা এক আকাশ ফুটফুটে তারা, পরিষ্কার বাতাস, এই তো আমি অটুট, পূর্ণ রয়ে গেছি এখনো। মস্তিষ্কের ঘিলু যেন সবে ফোটা জুঁই ফুলের মতো শরীরে নদীর ঢেউ। এসব বলব কাকে, লিখে তবু বাঁচি।

পনের যোলো বছর বয়স, একটু একটু রবীন্দ্রনাথ, প্রায় সবটা শরৎচন্দ্র, কীটস, শেলি ইত্যাদির কবিতাগুলি পড়েছি, তারা আকাশের দিকে উড়ে যায়, হরেকরকম পাখির মতো কলস্বরে ডাকে, গান গায়, উড়ে উড়ে বেড়ায়। আমাকে বলে সুর মেলাও দেখি, আমি পারি না, বেসুরো, বেতালা ভঙ্গিতে মাথা নাড়ি, এদিকে ওদিকে হাত বাড়িয়ে দিই। তরমুজের খোসার মতো অন্ধকার কাটিয়ে ফেলি, পৃথিবী ও গ্রহজগতের লাল শাঁসের মতো সূর্য আমাকে বলে— খুকু, এই নাও আমার বাড়ির চাবি, দরজা খোল, ভেতরে এস, আলো হয়ে যাও।' আমার হাত থেকে চাবি খসে পড়ে যায়। আমি তখন খুব মোটা, ঘরের বাইরে গিয়ে স্বস্তি পাই না, স্কুল কলেজে নিয়মিত যাই না, কারো সঙ্গে মিশতে পারি না। আমাকে ঘিরে থাকে বিরস রং, বিবর্ণ স্বাদ— প্রাণের রাজ্যে আমি এক জড়ভরত। কবিতা ছাড়া আমার গত্যন্তর কি?

প্রকৃতির নিয়মে কুড়ি একুশ বছর বয়সে এক পুরুষের চাউনির সঙ্গে আমার চোখ মিলল, অকল্পনীয় উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হল। মোহ, স্বপ্ন আর কষ্ট এর অবশ্যম্ভাবী ফল। অবিশ্রান্ত মেঘ গর্জন, বিদ্যুতের চমক, ঘন ঘন বজ্রপাত, কিন্তু একফোঁটা বৃষ্টি হল না, বদলে অপমান, অশান্তি ও মরণের বাসনা— নিজের বঞ্চনার বিকারে সব অসত্য, অর্থহীন, নিষ্ফল মনে হল। ছেলেটিকে মনে হল যম, কালো মহিষে চড়ে সে আমার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। তখন কবিতা ছাড়া কে এই গ্লানি থেকে বাঁচাত?

তারপর ক্রমাগত জীবনের ওঠাপড়া, সাধু ভাষায় একে জীবনসংগ্রামও বলা যায়, যা ধরতে যাই হাত ফসকে পড়ে যায় মাটিতে, রসাতলে। কিছুই গড়ে তুলতে পারি না। বিয়ের পরে একদিন হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, মনে হল ঐ তিনতলা উঁচু বাড়িটার সমান হতে না পারলে আমি এ যাত্রা বাঁচব না। ক্রমশ লম্বা হতে লাগলাম, সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেলাম— সন্ধেবেলা এক আকাশ ফুটফুটে তারা, পরিষ্কার বাতাস, এই তো আমি অটুট, পূর্ণ রয়ে গেছি এখনো। মস্তিষ্কের ঘিলু যেন সবে ফোটা জুঁই ফুলের মতো শরীরে নদীর ঢেউ। এসব বলব কাকে, লিখে তবু বাঁচি।

অনেকদিন কেটে গেছে, পরিণত বয়সে নানারকম বই পড়ি, অন্য কবিদের কবিতা পড়ি ক্রমাগত। সেই কবি হয়ে যাই, তার সুখে রাঙা হই, কেঁপে উঠি, দুঃখে অস্থির হয়ে পড়ি। কবিতার অভিমান হয়, সে বলে— ' দেবারতি, জন্মজন্মের সাধনায় তবে আমার একটি চুলের ঘূর্ণি, পায়ের কড়ে আঙুলের একটুখানি দেখতে দিই। গাছে না উঠতেই এককাঁদি? আমাকে অগ্রাহ্য কর, এতদূর আস্পদ্দা! কবিতা বলে তোমার জীবন পুড়িয়ে ছারখার করে দাও, আত্মার অতলে অন্তহীন সময় ধরে সাঁতার কাটো, তবে যদি আমার কৃপা পাও।' আমি বলি 'তোমার কৃপা নয়, ভালোবাসা চাই'। আচ্ছা কাল থেকে আবার নতুন করে উঠেপড়ে লাগব।'

কেন লিখি?

বিপ্লব মাজী
(১৯৪৭)

কেন লিখি? লেখাটা এখন নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। লোকে যেমন পান বিড়ি সিগারেট মদ নেশা করে, লেখাটাও তাই দাঁড়িয়ে গেছে। উল্লেখিত বস্তুগুলি মানুষের দেহের পক্ষে ক্ষতিকর, বিজ্ঞাপনেও লেখা থাকে ক্ষতিকর, তবু মানুষ নেশার জিনিস ছাড়তে পারেন না। কবি, লেখকেরাও ছাড়তে পারেন না। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন তাদের শুঁড়িখানা। সম্পাদকরা এইসব শুঁড়িখানার মালিক। তাঁদের কাজ একবার নেশা ধরিয়ে দেওয়া। ব্যস, এবার লেখক ডাকে বা ইন্টারনেটে (পি ডি এফ ফাইলে) তাঁদের কাছে পৌঁছোতে থাকবে। আজকাল তো মোবাইল বা আইফোনেও কবিতা পাঠানো যায়।

আমার নেশা ধরেছিল মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র।

বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন 'আলো'য় একটি গল্প বের হল 'স্বপ্ন হলেও সত্যি'। ব্যস, স্কুলে একটি পরিচিত নাম হয়ে গেলাম। সহপাঠী ও শিক্ষকদের কাছে একটা বিশেষ আইডেনটিটি লেখক তৈরি হল। যখন বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র, আলো আবার বের হল। আবার একটি গল্প 'ওপারের মেয়ে'। গল্পটির একটি বিশেষত্ব ছিল গল্পের শেষ লাইনে এসে পাঠক বুঝতে পারল গল্পটি একটি স্বপ্ন। ১৯৬৬। মেদিনীপুর কলেজের প্রথম বর্ষ বিজ্ঞানের ছাত্র। কলেজ লাইব্রেরির দেয়াল ম্যাগাজিনে একটি কবিতা বের হল। ব্যস। কলেজে কবি আইডেনটিটি পেয়ে গেলাম। কবিতার প্রতি বান্ধবীদের মুগ্ধতা আরো নেশা ধরিয়ে দিল। কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতা পরিচিতির দিগন্ত আরো বাড়িয়ে দিল। অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী, তাদের অভিভাবক— সবার কাছে কবি পরিচিতি কম কথা নয়।

মেদিনীপুর জেলা যুব সম্মেলনে বিষয় 'শান্তি' নিয়ে কবিতা লিখে প্রথম হয়েছিলাম। পুরস্কার দিতে এসেছিলেন সে বছরের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পাওয়া কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পুরস্কার নিয়ে বাড়ি ফিরে বাবা-মার কাছে শুনলাম তিনি বাবা-মার বন্ধু। বাবা ঠিকানা দিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে তিনটে কবিতা পাঠিয়ে দিলাম। 'কি হয়?' কবিতাটি তাঁর সম্পাদিত পরিচয় পত্রিকায় ১৯৬৭তে বের হল। আরো কবিতা পাঠাতে বলে তিনি নেশা বাড়িয়ে দিলেন।

আমার শৈশব-কৈশোর-যৌবনের উষাকাল কেটেছে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির পার্টি কমিউনে। বাবা-মা তেভাগা ছাড়াও নানা কৃষক আন্দোলনের নেতানেত্রী ছিলেন। পার্টি কমিউনে পার্টির বই দোকান নতুন সাহিত্যভবন ছিল। সেখানে রুশ সাহিত্যের ছোটদের ও বড়দের নানা বই। গোগ্রাসে গিলতাম। যৌবনে পা দেওয়ার আগেই পুশকিন, তুর্গেনেভ, গোগল, দস্তয়েভ্স্কি, তলস্তয়, চেখভ, গোর্কি বাংলা অনুবাদে পড়া শেষ। লেখার নেশা আরো তীব্র হল। স্বপ্ন— গোর্কির মতো ভারতের পথে পথে ঘুরে নানা বিচিত্র মানুষের জীবন নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখব।

বিগত শতকের ছয়ের ও সাতের দশক আন্দোলন ও সন্তরের অগ্নিগর্ভ সময়। প্রথমে কবিতাকে মানুষের মুখ, পশুদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করার কথা ভেবে কবিতা লিখতে শুরু করলাম। আমি চাইলাম কবিতা হোক মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার। আমার কবিতার ক্যানভাস হল আন্তর্জাতিক। যে যৌবনে লোকে বেশি প্রেমের কবিতা লেখে সেই যৌবনে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের কবিতা লেখার মধ্যেই আমি খুঁজে পেলাম 'কেন লিখি?' এ

লেখার মাধ্যমেই দেশবিদেশের নানা লেখকের সংস্পর্শে এসেছি। লেখা পড়ে যখন কোন পাঠক ফোন করেন, বা সম্পাদক লেখার অনুরোধ করেন তখন নেশাটায় ঘোর লেগে যায়।

প্রশ্নের উত্তর। পরে বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মায়োকোভস্কি, নেরুদা, এলুয়ার, আরাগঁ, লোরকা, পাস্তেরনাক প্রমুখের কবিতা পাঠের পর আমি সরাসরি আক্রমণাত্মক কবিতার বদলে ভাববাক্যে কবিতা লেখাই বেশি পছন্দ করলাম। কবিতার নানা ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার মধ্যে আনন্দ পেলাম। সমাজমনস্ক ও বিশুদ্ধ দুরকম কবিতাই আমাকে আনন্দ দিল। কবিতা, গল্প, রিপোর্টাজ, নানা বিষয় নিয়ে গদ্য, অনেক পরে উপন্যাস লেখার মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের আনন্দ আছে এবং আমি যাদের সঙ্গে বেঁচে বর্তে আছি তাদের কাছে আমার বহুমাত্রিক আইডেনটিটি বা পরিচয় তৈরি হচ্ছে। একমাত্রিক মানুষ মানেই মৌলবাদী— তারা কি ধর্মের ক্ষেত্রে কি রাজনীতির ক্ষেত্রে মৌলবাদী হয়। একমাত্রিক আইডেনটিটি থেকেই হিংসার পরিবেশ তৈরি হয়।

কেন লিখি? এই বহুমাত্রিক আইডেনটিটির নেশা থেকেই লিখি। আর লিখতে লিখতে লেখাটা কখন জীবনে বেঁচে থাকার একটা উপায় হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। লেখার মাধ্যমেই দেশবিদেশের নানা লেখকের সংস্পর্শে এসেছি। লেখা পড়ে যখন কোন পাঠক ফোন করেন, বা সম্পাদক লেখার অনুরোধ করেন তখন নেশাটায় ঘোর লেগে যায়। যখন প্রকাশকরা বইয়ের জন্য আবদার বা আবেদন জানাতে থাকেন— তখন বুঝতে পারি আমার বহুমাত্রিক আইডেনটিটি পাঠকদের কাছে আমার এক একটা পরিচয় নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে।

কেন লিখি? লিখেই তো আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে কবিতা পড়া, বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ পাচ্ছি। ভারতের ২৪টি অকাদেমি স্বীকৃত ভাষার অন্তত ১০/১২টি ভাষায় আমার কবিতা অনুবাদ হয়ে গেছে। নানা ভাষার কবিরা ই-মেলে চিঠি দিচ্ছেন বা ইন্টারনেটে বা ফেসবুকে চ্যাট করছেন। লেখার জন্যই তো এক বান্ধবপূর্ণ জগৎ-এর হাজারদুয়ার চোখের সামনে খুলে গেছে। লেখার জন্যই তো দেশ-বিদেশ ভ্রমণ। সম্প্রতি ফেব্রুয়ারি-১ থেকে ফেব্রুয়ারি-৮ ভিয়েতনামের হ্যা-লং ও হ্যা-নয় শহরে প্রথম এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় কবিতা উৎসবে (Asia Pacific Poetry Festival First) ২৮টি দেশের ১২১ জন কবির সঙ্গে কবিতা পাঠ করলাম, কবিতা নিয়ে আলোচনা করলাম। পৃথিবীর অন্তত ২৮টি দেশের ২৮টি ভাষায় কবিতাগুচ্ছ বা কবিতাবই অনূদিত হয়ে বের হবে। এই যে কবিতার মাধ্যমে পরস্পরকে জানা, একে অন্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে জানা, একে অন্যের অনুবাদ করা— এতে শুধু নিজের জীবনটা বদলে যায় না, দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। কেন লিখি? তার একটা উত্তরও পাওয়া যায়। ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হ্যা-লং উপসাগরে যখন ক্রুইজে ২৮টি দেশের কবিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি, যখন পাঁচতারা গ্র্যান্ড হ্যা-লং হোটেলের ন-তলা থেকে সমুদ্র দেখছি তখন তো 'কেন লিখি?' তার উত্তর পেয়ে যাই। সেই সঙ্গে এ কথাও ভেবেছিলাম শুধুমাত্র কবিতা লিখে এরকম স্বপ্নের মতো দিনগুলোর ভেতর পৌঁছোনো যাবে— কোনদিন ভাবিনি।

কেউ নেশার জন্য লেখেন। কেউ পেশার জন্য, কেউ শুধুই শখে। প্রত্যেকেই লেখেন নিজেকে প্রকাশ করার জন্য, নিজের আইডেনটিটি মেলে ধরার জন্য। আর এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে যে কোনও লোকাল কবি গ্লোবাল পরিসরে পৌঁছে যেতে পারেন তার জন্য চান্স ফ্যাক্টর ও স্থান ফ্যাক্টর কাজ করে। কবিতা কতরকম হয়, কতরকমভাবে লেখা যায় তা বড় বড় আন্তর্জাতিক কবিতা সম্মেলনে না গেলে বোঝা যায় না। আর বাংলা ভাষায় যারা নিজেদের কেউকেটা ভাবতে অভ্যস্ত তাঁরা এইসব আন্তর্জাতিক পরিসরে গেলেই বুঝতে পারবেন কবি না, কবিতাই সেখানে শেষ কথা বলে। পৃথিবীর একলক্ষ ভালো কবির মধ্যে তিনি একজন। কবিতাও অনেক রকম।

কেন লিখি? সময়ের আগুন থেকে নিজেকে জ্বেলে নিতে লিখি। লেখা এক যৌনক্রিয়া। উপলব্ধির যৌনক্রিয়া— যা থেকে জন্ম নেয় কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা কোন গদ্য। প্রত্যেক মানুষই চায় নিজের মনের মতো এক বিকল্প পৃথিবীর জন্ম দিতে। যে পৃথিবীতে সে একা ঘোরাফেরা করবে, একা ঈশ্বরের মতো সৃষ্টির কাজে মগ্ন থাকবে। সেইসব সৃষ্টির শিল্প-স্থাপত্য বা নির্মাণ একমাত্র তিনিই পাঠকের সামনে আনবেন, যা থেকে পাঠক বিনির্মাণ করে নেবেন তাঁর নিজস্ব বিকল্প পৃথিবী। পাঠকের মধ্যে লেখক নতুন জন্ম নেবেন। এই নতুন

যে অনুভূতির অভিঘাত আমাকে ধাক্কা দেয়, আলোড়িত করে, তাই কিছুক্ষণ পরে লেখার চরণ হয়ে কলমের মুখে ধরা দেয়।

জন্ম বার বার ফিরে পেতেই লিখি। এই একজন্মেই যাতে অসংখ্য জাতকজন্ম নেওয়া যায়।

কেন লিখি?

কৃষ্ণা বসু
(১৯৪৭)

'কেন লিখি'—এই প্রশ্নটির সামনে আজীবন নতজানু বসে আছি। সত্যিই তো, এত রকমের কাজ থাকা সত্ত্বেও লেখার কাজটিকেই কেন পরম প্রিয় বলে মনে করেছি, তা ঠিক কি আমি নিজেও জানি! খুব ছোটবেলায় আট বছর বয়স তখন, একটি বৃষ্টির দিনে স্কুলে যাইনি, বাড়িতেই ছিলাম, বৃষ্টি বিষয়ক একটি কবিতা লিখেছিলাম, মনে আছে। সেই থেকে সূচনা, সেই প্রথম রচনা; সাহিত্য-প্রাণা আমার মা চামেলী বসু সেই আট বছরের মেয়ের লেখা পদ্য শুনে খুশি হয়ে একটি লেখবার উপযোগী ডাইরি আর একটি ঝর্ণা-কলম উপহার দিয়েছিলেন। সেই আমার ছোটবেলার পরম পাওয়া।

সেই থেকে কলম চলছে, কলম থামেনি কোনোদিন। আমি বুঝতে পারি লেখার মধ্যেই আমার পরম প্রাপ্তি, অনন্ত আনন্দ লুকিয়ে রয়েছে, টের পাই। যে অনুভূতির অভিঘাত আমাকে ধাক্কা দেয়, আলোড়িত করে, তাই কিছুক্ষণ পরে লেখার চরণ হয়ে কলমের মুখে ধরা দেয়। সেগুলিকে লিপিবদ্ধ না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই— নাছোড় সেই সব অনুভূতি আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়। প্রথম দুটি বা তিনটি লাইন কে যেন পাঠিয়ে দেয় ভিতরে ভিতরে, তারপর একটু একটু করে লেখাটি হয়ে ওঠে বৈ কি!

'কেন লিখি?' এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি— না লিখে উপায় নেই, তাই লিখি। লেখাই সবচেয়ে বড় পরিত্রাণ, তাই লিখি। আমি লেখার টেবিলে বসে পড়ি অনুভূতি-তাড়িত মানবী এবং লেখার সময় নিজেকে উপুড় করে দিই। নিজেকে উজাড় করে দিই, লেখার মধ্যে নিজেকে খানিকটা মিশিয়ে দিই আমি।

'কেন লিখি?' —এই অনিবার্য প্রশ্নটির উত্তরে একথাও বলা যায় জীবনের অনুভূতির সততার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেও লিখি। আমি একটু অনুভূতি-চালিত মানবী, অনুভূতির আবেশ আমাকে অধিকার করে আর আমি লেখবার পাতার ওপর কলম নিয়ে ঝুঁকে পড়ি। আমি 'কেন লিখি?' —এই প্রশ্নের উত্তরে নিজের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখব। প্রয় প্রতিদিন ভোরে, বেশ ভোরে আমার একটু ঘুম ভেঙে যায়। ভাঙা ঘুমের রেশ তখনও জড়িয়ে থাকে, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি মনটা খারাপ লাগছে। কেন খারাপ লাগছে তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখি, —গত দুতিন দিন তেমন কোনো লেখা লিখতে পারিনি বলেই মনখারাপ লাগছে। আবার কোনো কোনো ভোরে ঘুম ভেঙে দেখি মনটা গুন্ গুন্ করছে। কেন মনটা ভালো লাগছে, নতুন কোনো সুখবর নেই, তবু মনটা কেন গুন্ গুন্ করছে? নিজের দিকে অন্তরলোকে তাকিয়ে বুঝতে পারি গতকাল একটা যথাযথ উত্তীর্ণ লেখা লিখতে পেরেছি। তাই মনটা ভালোলাগায় ভরে যাচ্ছে। এই যে ভালোলাগা, ভালো থাকার শর্ত লিখতে পারা, লিখতেই পারা, —এটাই ঠিক উত্তর, 'কেন লিখি?' এই প্রশ্নের।

একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদিন একটি সাঁকোর উপর দিয়ে রিক্সা করে আসছিলাম, অনেক লোক ভিড় করে সাঁকোর নীচে দেখছে, নেমে দেখি একটা মহিলার মৃতদেহ ভাসছে বড় খালের জলে, মুখটা পানার দামে বেঁকে রয়েছে। ভিড়ের মধ্যে একজন বললেন, "ঐ কলোনিতে বাড়ি ছিল, খুব দুঃখী মেয়েলোক ছিল গো।" এসব দেখে শুনে বাড়ি চলে এসেছি। সন্ধে পেরিয়ে রাত্রি হয়েছে, সাংসারিক টুকটাক কাজ শেষ করে রাত্রির বালিশে ঘুমের জন্য মাথা রেখেছি, ঘুমোতে পারছি না, বারবার মৃত মহিলার ছবিটি মনে ভেসে উঠছে। অনেক রাত্রে উঠে পড়ে একটি ছোট্ট কবিতা লিখে তবে ঘুমোতে যাই। কবিতাটি এই রকম,— "সাঁকোর কিনারে এসে আটকে আছে লাশ, / মেয়ে মানুষের লাশ, আটকে আছে বেরুতে পারছে না, / তার মুখ ফেরানো রয়েছে সন্তানের দিকে, / তার মুখ ফেরানো রয়েছে সংসারের দিকে, / তার মুখ ফেরানো রয়েছে পুরুষের দিকে, / প্রহারে প্রহারে তাকে পর্যুদস্ত করে গেছে যে পুরুষ, / তার মুখ ফেরানো রয়েছে তার দিকে, / বোকা, অভিমানী, আদর-বাঙালী মুখ ফেরানো রয়েছে আজো জীবনের দিকে, / সাঁকোর কিনারে এসে আটকে আছে লাশ, মেয়ে মানুষের লাশ, / আটকে আছে, বেরুতে পারছে না।" —এই কবিতাটি বহু মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, বহু

এক জীবনে কত কত ভাবনাই তো সারাদিন উঁকি দিয়ে যায় মনে, হাতে কাগজ-কলম থাকলে লিখে রাখি এক-এক সময়। তবু সব কি লেখা সম্ভব!

মানুষ কাঁদেন এটি শুনে, —এইখানেই নিহিত আছে 'কেন লিখি'-র উত্তর। মানুষকে স্পর্শ করব বলে। প্রাণ থেকে উঠে লেখাগুলি মানুষের প্রাণে পৌঁছে যাবে বলেই লিখি।

'কেন লিখি?' প্রশ্নটির আরো একটি যথার্থ উত্তর হল আমার মধ্যে একটি প্রকাশ-ব্যাকুল মন-ও আছে, সেই মন তার আবেগ অনুভূতিকে কবিতার ভাষায় প্রকাশ করতেই চায়। গদ্য-ও লিখি প্রচুর। কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসি কবিতা-ই লিখতে। লেখার প্রতি ভালোবাসাই আমাকে দিয়ে অবিরত লেখায়, লেখায়, লেখায়।

কেন লিখি?

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৯৪৭)

কেন লিখি এই প্রশ্নের জবাব চাইলে মাত্র এক লাইনেই বলে দেওয়া যায়, আমি তো লিখি না, কেউ যেন অন্তরিক্ষে দাঁড়িয়ে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়।

উনিশশো একাত্তরে প্রকাশিত হয়েছিল আমার প্রথম কবিতার বই, তারও আগে লেখালিখির এক দীর্ঘ প্রস্তুতিকাল যে-কাহিনি লিখেছি অন্যত্র। বস্তুত যেদিন থেকে কবিতা ও গল্প পড়তে শিখেছি, কেন যেন মনে হত এরকম তো আমিও লিখতে পারি। সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার দিনগুলি থেকে এভাবেই প্রথমে চার বা ছ-লাইনের ছড়া লেখার শুরু, তারপর ছন্দ মিল দিয়ে কবিতা, একটু উঁচু ক্লাসে উঠে আধুনিক কবিতার মকশো করা, খাতার পৃষ্ঠায় ছোটো ছোটো কাহিনি লেখা, এমনকী স্কুলের শেষ ক্লাসে উঠে একটি ছোট্ট গোয়েন্দা উপন্যাসও লিখতে চেষ্টা করেছিলাম একবার, যদিও পরবর্তীকালে গোয়েন্দা উপন্যাস লিখব এরকম এখনও ভাবিওনি স্বপ্নেও।

কলেজে ওঠার পর থেকে একমাত্র লক্ষ্য ছিল কবি হওয়ার, তার ফলে সত্তরের দশকে খানতিনেক কবিতা বই প্রকাশ করেছিলাম, সম্পাদনা করি খানচারেক কবিতার সংকলন।

কিন্তু সত্তরের দশকের মাঝামাঝি মনে হয়েছিল চাকুরির সুবাদে এত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে, তাদের জীবনযাপনের কথা জেনে ফেলছি, মানুষের এত-এত সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তার সবকিছু কবিতার স্বল্প পরিসরে প্রকাশ করা যায় না। কবিতায় যা ধরা যায় তা হল অভিজ্ঞতার নির্যাস।

তখন থেকেই আমার গদ্য লেখার শুরু। তারপর এক নিরন্তর ধারাবাহিকতায় বহু গল্প-উপন্যাস লেখা হয়ে গেল দীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়ে। প্রতিদিন কত নতুন নতুন চরিত্র ভিড় করে চোখের সামনে। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, সাধারণ চেহারার একজন মানুষ আমাকে দেখলেই বলে ওঠেন, 'ভালো আছেন তো?' কিংবা মাথায় জট এমন একজন ভিখারিণী দেখা হলেই বলবে, 'গত মাসের টাকাও পাইনি, তার সাথে এ-মাসেরটাও দিন', এভাবেই সে আমার কাছে নিয়মিত মাসোহারা আদায় করে। আগে মাসে নিত এক টাকা, এখন তা বেড়ে হয়েছে দু-টাকা। তার ধারণা সবারই মাইনে বাড়ে, তারই বা কেন বাড়বে না! এরকম বহু আশ্চর্য মানুষ কোনও না কোনও ভাবে রেখাপাত করে যায় মনের ভিতর। আর এই অভিজ্ঞতা তো পৃথিবীর সব মানুষেরই।

আর এ কারণেই আমি যখনই সুযোগ পাই, আমার চেনা কিংবা অচেনা মানুষকে উদ্দেশ করে বলি, আপনার জীবনের মূল্যবান ঘটনাগুলো লিখে ফেলুন না! কত কিছুই আপনার জীবনে ঘটে, তার কিছু লিখে ফেলুন রোজ, কোনওদিন এক পৃষ্ঠা, কোনও দিন মাত্র দু-লাইন হলে তা-ই।

এখন যা মনে হয়, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান, তারা একে অপরের থেকে অন্যরকম, প্রতিটি অনুভূতি ভিন্ন ধরনের, সেই মুহূর্তগুলি লিখে ফেলতে পারলে বেশ হত। যদিও সব অনুভূতি লেখার যোগ্য হয় না, তবু এক জীবনে কত কত ভাবনাই তো সারাদিন উঁকি দিয়ে যায় মনে, হাতে কাগজ-কলম থাকলে লিখে রাখি এক-এক সময়। তবু সব কি লেখা সম্ভব! এত লেখার সময় তো পাওয়া যায় না। তাই যতটুকু সম্ভব সেটুকুই লিখে ফেলি, ফলে সারাক্ষণ একটা অতৃপ্তি ঘিরে থাকে, যা লিখতে চেয়েছিলাম তার অনেক কিছুই লেখা হল না এ জীবনে।

তবু যতটুকু পারি, এভাবেই জীবনের মুহূর্তগুলি ও নানা অনুভূতি ধরে রাখি সাদা পৃষ্ঠায়, কখনও তা ছোটোগল্পের আকারে, কখনও উপন্যাসের আকারে, কখনও কবিতায়, কখনওবা আত্মজীবনীমূলক কোনও লেখায়। যা লিখেছি, লিখিনি তার চেয়ে ঢের বেশি। একজন মানুষ সব লেখা লিখে যেতেও পারেন না। আরও অনেক কিছুই তো লিখতে চাই, হয়তো তার এক-খণ্ডাংশ লেখা হবে কোনও দিন।

আমার বিশ্বাস একজন লেখকের সৎ সমাজচিন্তা যদি পাঠককে একটুও উদ্বুদ্ধ করতে পারে, সেটাই কোনও না কোনও ভাবে সমাজের কাজে লেগে যায়।

পাঠকের কাছে পৌঁছোতে চাই

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

(১৯৪৯)

কেন লিখি?

লিখতে ভালো লাগে, তাই লিখি। লিখে আনন্দ পাই, তাই লিখি। অথবা লিখতে পারি, তাই লিখি।

আসলে সব মানুষেরই নিজস্ব কিছু উপলব্ধি থাকে। কম বেশি অভিজ্ঞতার পুঁজি থাকে। অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির মিশেলে মানুষের মধ্যে তৈরি হয় বোধ। এই বোধ বা চেতনাকে কেউ কেউ সাজিয়ে গুছিয়ে ভাষায় বর্ণনা করে ফেলতে পারে, কেউ পারে না। যাঁরা পারেন তাঁরাই লেখক।

যে কোনও লেখকের কাছে লেখার প্রক্রিয়াটা অনেকটা সন্তানের জন্ম দেওয়ার মতো। অভিজ্ঞতা আবেগ আর অনুভূতির মিলনে ভ্রূণ ক্রমে বিকশিত হয়ে একটা আকার পেল, তারপর অনেক যন্ত্রণার স্তর পার হয়ে লেখকের মনোভূমিতে ভূমিষ্ঠ হল। নিজের প্রতিটি রচনাই লেখকের কাছে সন্তানসম। লেখক তাকে অতি যত্নে লালন পালন করেন, পরিণত করে তোলেন। লেখার সঙ্গে লেখকের এই যে সম্পর্ক, এটা অবশ্য একেবারেই ব্যক্তিগত। এই সম্পর্কে একটা আলাদা সুখ থাকে। সৃষ্টির সুখ।

সাহিত্য রচনা করতে বসে কোনও লেখকের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকতেই হবে, এ কথা আমি মানি না। আমার মনে হয়, আমি যখন লিখি তখন আমি একমাত্র আমার নিজের কাছেই দায়বদ্ধ। আমার বোধ, আমার বিশ্বাস, আমার ধর্ম, আমার দৃষ্টি, এরাই আমায় লেখায়। আমার প্রতিটি লেখাতেই তো কোনও না কোনও ভাবে আমি আছি। আমি যেভাবে দেখি, যেভাবে ভাবি, তাকেই নানান ভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। যদি আমার অনুভব একজন পাঠকেরও হৃদয় স্পর্শ করতে পারে আমি ধন্য হই। আমার বিশ্বাস একজন লেখকের সৎ সমাজচিন্তা যদি পাঠককে একটুও উদ্বুদ্ধ করতে পারে, সেটাই কোনও না কোনও ভাবে সমাজের কাজে লেগে যায়। সমস্যার সমাধান বাতলে দেওয়া লেখকের কাজ নয়, লেখক সমস্যার দিকে আঙুল দেখাতে পারেন মাত্র, সংস্কারের কাজটা সমাজকেই করতে হয়। সমাজ বদলানোর ভাবনা নিয়ে সচেতন ভাবে কলম ধরলে বোধহয় সাহিত্যের ওপর সব সময়ে সুবিচার করা যায় না।

যে কোনও লেখকেরই লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য পাঠকের কাছে নিজেকে পৌঁছে দেওয়া।

কেন লিখি

লীনা চাকী

(১৯৪৯)

কেন লিখি? সম্পাদকের তরফ থেকে এইরকমই একটা প্রশ্ন ছিল। শুরুতেই বলে নিই লেখালেখি যাঁরা করেন তাঁদের দু'টি প্রধান দায়বদ্ধতা থাকে— সাহিত্য ও সমাজ। এর অনুষঙ্গ আরও কিছু থাকে। তবে যাঁরা গল্প-কবিতা-উপন্যাসে হাত মকশো করেছেন শুধু লিখে আনন্দ পাওয়ার জন্য পরবর্তীকালে তাঁরা পরিচিত হয়ে ওঠার পর সাহিত্যের সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে একটা দায়বদ্ধতা তাঁদের তৈরি হয়েছে।

আমার প্রথম লেখালেখি শুরু গল্প দিয়ে। তখন গল্পকার হওয়ার স্বপ্ন ছিল, নানা পত্রপত্রিকায় লিখতাম। প্রথম দিকে একটা আচ্ছন্নতা ছিল, পরিচিত হওয়ার পরে সাহিত্যের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা তৈরি হতে থাকে। তেমন সময়েই আমার পথ বদলে যায়। একটা অজানা জগৎ সামনে দ্বারা খুলে এসে দাঁড়ায়। এই যে সম্পাদক আমাকে প্রশ্ন করছেন 'আমি কেন লিখি' আমি এককথায় বলে দিতে পারি 'আমি লিখি সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে।' বিশদে বলি।

প্রথমে কেন্দুলির জয়দেব মেলা তারপর গহন বাউল আশ্রমে দেখা মিলেছিল বাউল সঙ্গিনীদের। এই মহিলারা বাউল গবেষকদের কাছে কোনওদিনই ধর্তব্যের মধ্যে আসেননি। তাঁদের অবস্থান, সাধনার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রাপ্তি ও বাউল সংসর্গে আসার প্রেক্ষাপট জানার কৌতূহল পর্যন্ত কারও হয়নি। বলা যায় মানুষ হিসেবে তাঁদের চিহ্নিতকরণ করার কাজটি হয়নি। হয়ত সেই গবেষকদের কাছে এই দিকটি জানা দরকার মনে হয়নি, তাঁদের গবেষণার লক্ষ্য ছিল বাউল ধর্ম ও সাধনা। বাউলের সঙ্গিনী, সেবাদাসী ও গায়িকাদের সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরে তাঁদের অবস্থান আমার সামনে উন্মোচিত হতে থাকল। নারী হিসেবে সেই মহিলাদের কিছুটা স্পর্শ করতে পারলাম। তখনই আমার মনে হল বাউলের মতোই এই বাউলানিদের পরিচয় জানানো দরকার। শৌখিন সাহিত্যচর্চা নয়, আমাকে একটা

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
  'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

সামাজিক দায় পালন করতে হবে। আমার হাতে একটা কলম আছে, সে-ই আমাকে সাহায্য করতে পারে। আমি বাউলানিদের কথা লিখতে শুরু করলাম। নির্মোহ দৃষ্টিতে তাঁদের জীবনচর্যা দেখার ফলে আমার সামনে প্রকট হয়ে গেলেন সাধনসঙ্গিনী ও সেবাদাসীরা। তাঁদের বাউলসঙ্গে আসা, পূর্বজীবন, বর্তমান অবস্থান ও সাধনায় ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি আমার লেখার উপাদান হল। এখানে বলা দরকার এই বাউলানিদের নিয়ে যা কিছু লেখালেখি তার সঙ্গে খ্যাতি পাওয়ার কোনও বাসনা আমার ছিল না। আমি শুধু বাউল সমাজের নারীদের মূল স্রোতের মানুষের সামনে উপস্থিত করতে চেয়েছি। তাঁদের নিয়ে লেখাটা জরুরি মনে হয়েছিল বলে আজও সেই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। ছাপার অক্ষরে তাঁরা থাকুন।

বাংলার বাউলানি আমার লেখার মূল বিষয়, কিন্তু তা বাদে আছে বাউল মেলা, মহোৎসব, লোকসংস্কৃতির নানা আঙ্গিক। এখানে একটু ব্যক্তিগত অনুভবের কথা বলি, যখনই যা কিছু লিখি বা লেখার কথা ভাবি, তখন একটা প্রশ্ন আমার সামনে এসে দাঁড়ায়— আমি কি নতুন কিছু বলতে পারছি? যা আরও কেউ বলেছেন বা লিখেছেন, তার বাইরে নতুন কোনও বার্তা কি দিতে পারছি? যদি সেটা না দিতে পারি তাহলে কেন লিখব?

এটাই আমার কাছে একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বারবার মনে হয় আমি কেন লিখছি, যদি না নতুন কিছু বলতে পারি। যে কথা আগে বলা হয়ে গেছে সেকথা আমি কেনই বা অনুকরণ করব। ফলে কলম হাতে নেওয়ার আগে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়। নিজের মতো করে অনুসন্ধান শুরু করতে হয়। বিষয় নতুন নয়, কিন্তু তার মধ্যেই যেন আমার ভাবনাচিন্তা বা অনুসন্ধানের চিহ্ন থাকে যা পাঠকের কাছে নতুন বলে মনে হবে। সেটা না পারলে সে লেখা আমার কাছে অর্থহীন বা অহেতুক। এটা আমার বিশ্বাস।

কেন লিখি

সৈয়দ কওসর জামাল

(১৯৫০)

কার কথা মনে নেই, কিন্তু লাইনটি মনে থেকে গেছে— 'পোয়েট্রি ইজ অলওয়েজ ক্লোজ কিন টু দ্য ইমপসিব্‌ল।।' এমন একটি অসম্ভবের দিকে হাত বাড়ানোর কোনো আয়োজন কি সত্যিই ছিল? অথচ বাস্তবে সেটাই করে চলেছি এত এত দিন ধরে। বাঙালি কবি যদিও বলেছেন— 'কবিতার জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি,' অনেকেই কিন্তু এই অমরত্বের লোভেই লিখে যান বলে জানিয়েছেন। হয়তো এই ভাবে বলেননি, বলেছেন— বিস্মৃত হতে চান না বলেই লেখেন কিংবা নিজের স্মৃতি রক্ষা করে যেতে

> প্রতিদিন বিপর্যস্ত আমি নিজেকে গুছিয়ে নিই কবিতায়।

চান বলেই লেখেন। আমার নিজের কখনও মনে হয়নি, আমি লিখি 'বিকজ আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অফ বিয়িং ফরগটেন'। একথা সত্যি যে এই পৃথিবীতে সাধারণ ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্বের তেমন কোনও তাৎপর্য নেই। তেমন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে এই পৃথিবীতেই দেখা হয়েছে আমাদের অসংখ্যবার। তবু কবিতা লেখার মতো অসম্ভবের দিকে হাত বাড়ানো যেখানে স্থির, সেখানে হারিয়ে যেতে চাই না বলার মধ্যে একটা কৌতুক খুঁজে পাই। বরং দীর্ঘদিন আগে উপন্যাসিক জর্জ অরওয়েল যা বলেছিলেন তার সঙ্গে সহমত পোষণ করি— 'সব লেখকরাই ফাঁপা স্বার্থপর ও অলস আর তাদের অভিপ্রায়গুলোর অন্তঃস্থলে থাকে একটা রহস্যময়তা।'

মনে হয় অরওয়েলের এই কথা যেন আমার উদ্দেশেই বলা। লেখালেখির সব অভিপ্রায়ই রহস্যময়তায় পরিবৃত। অথচ কবিতা রচনা আমার সচেতন প্রয়াস। কোনও প্রেরণায়, কোনো দুরতিক্রম্য আবেগের বশে এই 'অসম্ভব'-এর দিকে হেঁটে যাওয়া নয়। নিজের জন্য নিজেই তৈরি করেছি এই অন্ধকার গুহাপথ, জটিল পরিপার্শ্বময় এক ফাঁদ, যেখানে কবিতাগুলো আলোকবৃত্ত হয়ে দূরে সরে সরে যায়। ব্যক্তি, ব্যষ্টি ও সমাজের বাস্তবতা যেখানে আরো জটিল, আরো রহস্যময় হয়ে প্রতিফলিত হয়। কবিতার মধ্যে এইসব বিষয়ের অর্থ বা অর্থহীনতা ধরতে চাওয়া খুবই কঠিন বলে কবির কাজও এখন বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে। শূন্যতার অন্ধকার, পরিপার্শ্বের জটিলতা বা অর্থহীনতা কবিকে এখনও ত্যাগ করে না বলেই কবিকে এইসব কথা সাদা কাগজে লিখে রাখার চেষ্টা করে যেতে হয় মৃত্যু অবধি। সফলতা বা ব্যর্থতার কথা নয়, এই প্রয়াসই তার অস্তিত্বের সারাৎসার। কবিতায় 'কিছু' ঘটে না, অনর্থের সম্ভাবনা শুধু। এর পেছনে ছুটে যাওয়াও যেন একটা খেলা। এই খেলা শুরু করলে এর কোনো শেষ নেই। শুরুটা আমার হাতে ছিল, সমাপ্তি জানি না। খেলার জন্য প্রাণশক্তি সঞ্চালিত করি, অথচ সব অনর্থের কাছে পৌঁছনো সম্ভব নয়। দ্রুতগতিতে তারা চলে যায় বিস্মৃতির দিকে। অনর্থকে ধরা যাবে তাদের অর্থময়তা সহ এই আশায় ছিপ ফেলে বসে থাকি।

অথচ পৃথিবী ও বিশ্বের কিছুই স্থির নেই। বেঁচে আছি এক-একটা মুহূর্তমাত্র স্পর্শ করে। এই হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলোকে যদি ধরে রাখা যেত কবিতায়, এই অসম্ভবের কল্পনায় রাত কাটে। ডায়ারিতে পাতার পর পাতা শুধু সাদাই থেকে যায়। তার ওপর সময়ের হলুদ ছাপ পড়ে। তবু তো বিশ্বাস করি একটা নতুন কবিতা এইবার লেখা হবে। 'নতুন', মানে নতুনই, যা কখনও লেখা হয়নি। আমি লিখি, কেননা আমি বিশ্বাস করি যা লেখা হয়েছে, তা পুনরায় লেখার চেয়ে নতুন লেখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া অনেক বেশি কাম্য। লেখার জন্য আমি পৃথিবীতে এতদিন ধরে যা লেখা হয়েছে তা পড়তে চাই। না হলে 'নতুন' লিখব কী করে। আসলে কবিমাত্রই নতুনত্বের সন্ধান চায়। বোদল্যের বলেছিলেন না যে, আমরা সেইসবই খুঁজি এখনও পর্যন্ত যার কোনো অস্তিত্বই নেই?

চারপাশে ধ্বস্ত পৃথিবী, ক্ষতবিক্ষত মানুষের সৃষ্টির উপাদান সব, অথচ এর মধ্যেও এই নষ্ট অরণ্যের ভিতরেও তো কখন ইউক্যালিপটাসের মতো মাথা তুলে দাঁড়ায় শিল্পের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা! এ কথাই লিখতে চেয়েছিলাম প্রথম কাব্যগ্রন্থে। পারিনি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর যে 'অন্য এক উপত্যকা'-র কথা বলতে চেয়েছি, সে তো নিজস্ব অন্টোলজিজাত অদৃশ্য পৃথিবী, যে পৃথিবী আমার কল্পনার, আমার নির্মাণের। যে পৃথিবী আমার নিজস্ব নির্মাণ, তাকে দেখানোর দায়িত্বও কি আমার ওপর পড়ে না, সে দায় আমার কবিতার, আমার কবিতা কি জানাতে পারল সেই 'নক্ষত্রপেরেক'-এর কথা, যেখানে বিশ্বজুড়ে এত ভাঙাগড়া প্রতি মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে মানুষ ও পৃথিবীর অস্তিত্ব, সেখানে 'পুঞ্চ' নামক যে মরূদ্যানটি গড়ে তুলতে চেয়েছি, তার কথা কেউ জানল কি? কবিতা রচনার মতো অসম্ভবের পথে যখন বেরিয়েছি, তখন এ প্রশ্নও বৃথা। লিখেছি বলেই জেনেছি মৃত্যু এমনকিছু ভয়ের নয়। প্রতিদিন বিপর্যস্ত আমি নিজেকে গুছিয়ে নিই কবিতায়। 'অনুপস্থিতির আড়াল থেকে' সব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, শুধু কবিতা লিখি বলে। কবিতা লিখি বলেই আলো ও অন্ধকার থেকে, অর্থ ও অনর্থ থেকে সমান দূরত্বে চলে যেতে পারি। হেঁটে যেতে পারি সেই প্রস্তরীভূত অঞ্চলে, যার নীচে গুপ্ত লাভাস্রোত বয়ে যায়। কবিতা লিখি বলে রাজনীতির ভাষায় কথা বলি না। কবিতা লেখার জন্যই বিশ্বাস জন্মেছে ভাষায়, শব্দে, ধ্বনিতে। ভাষা আমার সব বৈসাদৃশ্য ঢেকে দ্যায়। শব্দ একটি একটি করে গেঁথে আমাকে ঋজু করে রাখে, আমি আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকাতে পারি। চোখের সামনে যা কিছু ঘটছে, যা কিছু ঘটছে চোখের আড়ালে, সব লিখে যেতে চাই। কবিতা না লিখলে আমি জানতাম না আমার মন এই বিশ্ব থেকে কোন কোন উপাদান সংগ্রহ করে

রাখছে ভিতরে ভিতরে। কবিতা লেখার সূত্রেই আমি জানি সেসবের অর্থ কী, তাদের অর্থহীনতাই বা কী—

> খণ্ডগুলো মনে করো সময়সারণি
> রক্তের দাগগুলো থাক কাচের ওপরে
> ভাঙা টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে অনন্ত
> ফেরাই ঘরে
> গৃহমুখে...

আমার যেটুকু লেখালেখি

নলিনী বেরা

(১৯৫২)

যে জায়গায় জন্মেছি, তার ভূগোল ভূ-প্রকৃতি আবহাওয়া জলবায়ু মানুষজন, সবই কেমন যেন অদ্ভুতুড়ে। অন্তত আমার কাছে। সেখানকার নদনদী পাহাড়-টিলা বন-ডুংরি বট-অশ্বত্থ-ধ-আসন-চল্লা-চু রচু-শাল-পিয়াশাল গাছেরা আমার সঙ্গে কথা বলে, হাঁটে। এমনকী, ভাদু-মহুল-কুচলা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ গাছে যে-সমস্ত ভূত থাকে, সেই সমস্ত ভূতেরাও কতদিন বাঁশের বনে আমার সঙ্গে পা ছড়িয়ে বসে ছুরি দিয়ে বাঁশের কলম চাঁছতে সাহায্য করেছে। উপদেশ দিয়েছে, এই করো সেই করো, তবেই কলমের ডগাল খুব ছুঁচালো হবে। তারা আমার সঙ্গে 'দাঁড়িয়া' 'বাঘবন্দী' 'হাডুডু' 'কিত্‌কিত্' 'কাতি', কতরকম খেলা খেলেছে। খেলতে খেলতে হাত-পা কেটে গেলে টিনচার আয়োডিন ডেটল না হোক তাদের ক্ষতস্থানে গাঁদা চাকুন্দার রস তো লাগিয়ে দিয়েছি। প্রচণ্ড খুশি হয়ে তারা আমাকে বরদান করেছে। আর সেই বরে আমি এখনো মাঝে মাঝেই দেখে ফেলি, মানুষগুলো স্থির, স্ট্যাচু। তাদের চারধারের গাছপালা বাড়িঘরদোর, সব কেমন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। সেখানে মানুষ শখের ভূত পোষে। আর সে-ভূত বাঁদরের মতো ঘাড়ে মাথায় করে রাস্তাঘাটে ঘুরেও বেড়ায়। পোষাভূত অলক্ষ্যে অন্যের খামার থেকে ধান চুরি করে এনে ভূতের মালিককে বড়লোক বানায়। ধরা পড়লে আবার সভাস্থ পাঁচগ্রামের দশজন বিচারকের সামনে 'গ্রামফাণ্ডে' জরিমানাও দেয়। এখানে অভাবী কন্যাদায়গ্রস্ত মেয়ের বাপ গলবস্ত্র হয়ে, নদীর দহের দিকে চেয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানস্থ বসে থাকে, দহের ভূত কখন হুস করে নদীজলে ভেসে উঠবে তার মেয়ের বিয়ের যৌতুকের দানসামগ্রী হাতে নিয়ে। এখানকার কামারপাড়ায়, কামারশালে, গভীর রাতে হাতুড়ির ঠুকঠুক আওয়াজ করে জলাশয়ের ভূতের জন্য ঝিজরি গড়ে দেয় কামারের কামার রাজাকামার, যে-ঝিজরি বা শেকল মানুষের পায়ের আঙুলে শ্যাওলার মতো জড়িয়ে জলাশয়ের ভূত অমোঘ টান দেয়। এখানকারই যুবতী বধূ বনডুংরির ধারে গভীর রাতে ধনুকের মতো শরীর উলটে, চার হাত-পায়ে জন্তুর মতো হেঁটে, কপালে জ্বলন্ত প্রদীপ রেখে চরে বেড়ায়। ঘাস নয়, গু খায়। ফাঁকা মাঠে মরা মানুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা সেনির বা আঁশ-পাল্‌নার ভাত-মাংস খিদের জ্বালায় খেয়ে ফেলেছে ছেলে, তার বাপ তাই গালে হাত দিয়ে ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছে না, মরা মানুষের ভাত জ্যান্ত মানুষের পেটে গেলে সে-মানুষ বাঁচে কি বাঁচে না? মেয়েরা হাটে-বাজারে গ্রামে-গঞ্জে "কুরকুট পটম" অর্থাৎ ডিমওয়ালা লাল পিঁপড়ের চাক বিক্রি করে। তেল-নুন মাখিয়ে শিলে বেটে, পাতায় মুড়ে, পোস্ত-পোড়ার মতো পুড়িয়ে খায়। খেতেও বেশ টকটক ঝালঝাল। শহর থেকে আসা দিদিমণি নাকে রুমাল চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "এসব পোকামাকড়, পিঁপড়ে— তোমরা খাও?" "হঁ খাই, হামরা যে লদ্ধা বঠিন।"

তো, এরা সবাই আমার আত্মীয়, বড় আপনার জন। এদের ছেড়ে, শহরে এসে, মাঝে-মাঝেই মনে হত, তারা সব কোথায় পড়ে আছে একলা, একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। লেখার ভিতর দিয়ে সেই দ্বীপের সঙ্গে, সেইসব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি, দেখা হয়, একটু-আধটু কথাও বলি। মানুষ তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কথা বলে, সেই আর কী। তবে এ-লেখা ছাপা হয়, যৎসামান্য অর্থ আসে, ছিটেফোঁটা খ্যাতিও। মন্দ কী। কেউ বলেন, আমার লেখায়, সতীনাথ ভাদুড়ীকে খুঁজে পান। কেউ বলেন, এ-লেখক বিভূতিভূষণেরই উত্তরসূরি। যাঁরা বলেন, তাঁরাও আমার কাছের মানুষ। সবার সব মন্তব্যই শিরোধার্য করে বলি, আমার লেখায় যেই থাকুন, সবার উপরে থাকে সেইসব মানুষ। সেই মানুষকে লেখার ফ্রেমে ধরে রাখি, অন্তত চেষ্টা করি, ফ্রেমে না ধরলে ফ্রেম ভেঙে ফেলি। কখনো আমি ভাঙি, কখনো তারা নিজেরাই।

কেউ বলেন, আমার লেখায়, সতীনাথ ভাদুড়ীকে খুঁজে পান। কেউ বলেন, এ-লেখক বিভূতিভূষণেরই উত্তরসূরি।

কেন লিখি

প্রচেত গুপ্ত

(১৯৬২)

কেন লিখি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত সময় এখনও আমার আসেনি। আমার সিরিয়াস লেখালিখির বয়স বেশি নয়। মেরে কেটে এগারো বারো বছর বা তার একটু বেশি হতে পারে। এই অল্প কটা দিন আমার মত সাধারণ মাপের একজন লেখকের কাছে কিছুই নয়। কেন লিখি, লিখে কী হয়, লেখার মধ্যে কী পাই— এই জাতীয় গুরুগম্ভীর বিষয়ে কথা বলার জন্য অনেক পথ চলতে হয়। না হলে দুম করে মারাত্মক কিছু লিখে ফেলতে হয়। মারাত্মক কিছু লেখার প্রতিভা আমার নেই। তার ওপর আমার বয়স খুব কম নয়, পঞ্চাশ হয়ে গেল। অনেক পথ চলবার মত সময়ও কি পাওয়া যাবে? মনে হয় না।

যাই হোক, তবু কিছু বলার চেষ্টা করছি। চেষ্টা করছি সত্যি বলতে। যোগ্যতা নেই, প্রতিভা নেই, সময়ও নেই। অন্তত সততাটুকু থাকুক।

শুনেছি, লেখকরা অনেক বড় বড় কারণে লেখেন। লেখার মধ্য দিয়ে তাঁরা জীবনের জটিলতাকে অনুভব করেন। বেঁচে থাকার রহস্য সন্ধানে মেতে ওঠেন। বিষণ্ণতা ও একাকিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করেন, আমি কে? কোথা থেকে এসেছি আমি? কোথায় যাব? তারা লেখেন কখনো গম্ভীর আনন্দে, কখনো গোপন অভিমানে। আমি এত কিছু জানি না। আমি জানি, এককেটা বয়েসে একেক কারণে লিখেছি। বাল্য এবং কৈশোরে বড় বড় লেখকদের মত নাম করব বলে লিখতাম। খ্যাতির লোভ ছাড়া অন্য কোন কারণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মত লিখব, বিভূতিভূষণের মত লিখব, শরৎচন্দ্রের মত লিখব— এই ছিল লেখার কারণ। বিশ্বাস করতাম, এদের মত লেখা কঠিন কিছু ব্যাপার নয়। সমস্যা হল কাগজ। বড় বড় উপন্যাস লিখতে অনেক দিস্তে কাগজ লাগবে। সেই কাগজ কে দেবে? কোথা থেকে কাগজ পাব? সুতরাং রিস্কে গিয়ে লাভ নেই। আমার উপন্যাস হবে সংক্ষিপ্ত। ক্লাস সেভেনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি'র মত একটা উপন্যাস লিখে ফেলি। লম্বা সাদা খাতার আট পাতা। ওরিজিনাল 'পথের পাঁচালি'র থেকে আমার উপন্যাস অনেক বেশি করুণ হয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস। গ্রামের নামটা আজও মনে আছে। দুঃখীপুর। অপুর বদলে দীপু। দুর্গার বদলে কী নাম সেটা আর মনে পড়ছে না। ক্লাস টেনে লিখি শরৎচন্দ্রের দেবদাসের ঢঙে 'সে চলে গেল'। এটা লিখেছিলাম তিন বা চার পাতা। খুব ভাল এগোচ্ছিল। আপশোসের কথা, আমার 'দেবদাস' শেষ হয়নি। কারণ আমি মাঝপথে হাত দিলাম প্রেমের উপন্যাসে। মডেল রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'। অনেকেই হয়তো ভাবছেন, অল্প বয়সে এত পাকা পাকা বই আমি কেমন করে পড়লাম! আমাদের বাড়িতে বই পড়ার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা

এই বুড়ো বয়েসে, আমার লেখার একমাত্র কারণ হল অর্থ। লিখলে কিছু টাকা পাই।

ছিল না। এখন মনে হয়, কাজটা ঠিক হয়নি। 'মানুষ' হতে গেলে বই পড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত। সিলেবাস এবং কেরিয়ারের বাইরে কিছু পড়লেই বেত্রাঘাত। এখন অনেক বাবা-মাই তাই করেন। ঠিকই করেন।

এরপর আমি সিরিয়াস ধরনের লেখা শুরু করলাম বেকারত্বের কারণে। আজ থেকে বারো তেরো বছর আগের কথা। হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়েছি। পকেটে পয়সা নেই, শুধু অফুরন্ত সময় আছে। সময় পকেট থেকে উপচে উপচে পড়ছে। সময় দিয়ে ছেলের স্কুলের বেতন, সংসারের বাজার, বাড়ির ইলেকট্রিক বিল হয় না। একমাত্র লেখা হয়। তাই লিখতে বসলাম। সকালে কাজ খোঁজো ও দুপুরে গল্প উপন্যাস লেখো। সবথেকে সুবিধে হল, বেশি বয়েসের বেকার বলে আশপাশ থেকে প্রায় সবাই চম্পট দিল (ব্যতিক্রমদের কথা বলছি না)। ভাবল, দেখা হলেই ধার চাইবে। বুড়ো বয়েসে আর কাজ জুটবে না। ধারও শোধ হবে না। একমাত্র নিজের লেখা গল্প উপন্যাসের চরিত্ররাই পালালো না। তাদের সঙ্গেই সময় কাটাতে লাগলাম। পরে এইসব লেখা নামীদামি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন সকলে বলল, আর বেকার টেঁকার বলার দরকার নেই। তুই বলবি জীবনের উপলব্ধি, মননের তাড়না, সৃষ্টির উল্লাসে লিখেছি। আমি এখন সেসবই বলি। বলতে লজ্জা করছে তবু বলি, এখন, এই বুড়ো বয়েসে, আমার লেখার একমাত্র কারণ হল অর্থ। লিখলে কিছু টাকা পাই। অন্য কিছু করে যদি টাকা পেতাম তাহলে লেখা ছেড়ে দিতাম। একথা শুনে অনেকেই বলবে, 'ছি ছি, লেখার মত মহৎ কাজ তুমি অর্থের জন্য কর! তুমি অর্বাচীন। তুমি পাষণ্ড! তুমি ঘৃণ্য।' আমি মাথা পেতে সব গাল মেনে নিচ্ছি এবং বিনীত ভাবে বলছি, হ্যাঁ, আমি উপার্জনের জন্যই লিখি। আমাকে ক্ষমা করবেন।

পুঃ কেন লিখি তার দুটো ছোটো উপ-কারণ আছে। ১) লিখতে বসে দেখেছি, কোনো কোনো লেখার সময় আনন্দে চোখে জল এসেছে। আনন্দে কাঁদার লোভ সামলাতে পারি না। ২) আমার যমজ ভাই পুষ্কর গুপ্ত অধ্যাপনার কাজ করত। কিছুদিন আগে দুম করে ক্যানসারে মরে গেল। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল খুবই ঝগড়ার। তার এত সাহস ছিল যে ধেড়ে বয়েসে আমাকে একবার বলেছিল, 'তুই আর কিছু করিস না। শুধু লেখ। বাকিটা আমি সামলাব।' এখন লিখে চলার সেটাও একটা তুচ্ছ কারণ। বেটা নইলে আবার ঝগড়া শুরু করবে।

কেন লিখি

রবিশংকর বল
(১৯৬২)

।। ১ ।।

লিখতে পারছি না। এই অবস্থাটা কি কোনো লেখার বিষয় হতে পারে? কেন নয়? লেখা ও না-লেখার মধ্যে দূরত্ব কতটা? জানি না। মনে পড়ে, কমলকুমার একদা লিখেছিলেন, 'গ্রন্থসকল নীরবতার সন্তান।' লিখতে না-পারার অবস্থার মধ্যে মিশে আছে অনেক অনেক রচনা, যা লেখা হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে লেখা হয়ে চলেছে, পরে লেখা হবে। যেমন উৎপলকুমার বসুর কাব্যসংগ্রহের ভূমিকাটি: পাবে আমাকেও। বাদার জঙ্গলে/এক পর্তুগিজ অশ্বতর তোমাকে দেখাবে/আমি ও হেঁতাল কাঁটা ও-পশুর মাংসে বিঁধে আছি।/লৌহকণার গান শুনে যাও। শ্বেত কণিকার ক্ষিপ্ত নৃশংসতা শোনো/বিষ— যার চোখ নেই, বৃদ্ধি আছে, খসে পড়া আছে,/ নেই ত্বক, শুধু ঝুলন্ত প্রদর আছে, পুঁজ আছে,/—এঁকে নমস্কার করো।

পৃথিবীর সব প্ররোচক রচনাগুলি আবার ফিরে লিখতে ইচ্ছে করে। কেন যে!

ভালো লেখা বলে কিছু নেই
খারাপ লেখা বলে কিছু নেই

।। ২ ।।

আছে একমাত্র প্ররোচক লেখা
কাকে বলে প্ররোচক লেখা

যা আবার আমাকে শূন্য সংখ্যাটির হৃৎস্পন্দনের কাছে নিয়ে আসে।

সেই শূন্যের ভিতরে লুকিয়ে থাকে একটি পদ্ম

এসো, আমরা সেই পদ্মের পাঁপড়িগুলি উন্মোচিত করি।

না-লিখতে পারার সময়গুলি আমার এখন ভালো লাগে। একমাত্র তখনই এমন কিছু লেখা যায় যা কেউ না পড়লেও চলবে। সেই ভাবনাখণ্ডগুলির আকাঙ্ক্ষা কেবল নিজেদের শুদ্ধতা। সেই শুদ্ধতা ও চন্দ্রালোক যা খুনের মুহূর্তে খুনির ভিতরে জেগে ওঠে।

এখন আমি পাথরের কাছে যেতে পারি, ও পাথর, এই লেখাটিকে আস্বাদন করো।

এখন আমি নদীর কাছে যেতে পারি, ও নদী, এই শব্দদের গর্ভে ধারণ করো।

এখন আমি অগ্নির কাছে যেতে পারি, ও অগ্নি, এই যতিগুলি পরিপাক করো।

লিখতে না-পারার অবস্থার মধ্যে মিশে আছে অনেক অনেক রচনা, যা লেখা হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে লেখা হয়ে চলেছে, পরে লেখা হবে।

এখন আমি বায়ুর কাছে যেতে পারি, ও বায়ু, এই রচিত নশ্বরতাকে তুমি অনেকানেক মৃত্যুর ভিতরে ব্যাপ্ত করো।

তারপর লেখাটি তার পাঠিকার হাত ধরে পাহাড়ের দিকে দৌড়াতে লাগল। দেখে মনে হবে, একে অপরকে যেন ধাওয়া করেছে। অনেক পথ দৌড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে তারা দাঁড়াল। দম নেওয়া স্বাভাবিক হলে লেখাটি পাঠিকাকে জড়িয়ে ধরে; খুব চুমু খেল। পাঠিকাও লেখাটিকে খুব চুমু খেল। তারপর লেখাটি পকেট থেকে রিভলবার বার করে পাঠিকার বুকে ঠেকাল। পাঠিকাও স্কার্টের পকেট থেকে রিভলবার বার করে লেখাটির বুকে ঠেকাল। তাদের চোখ বুজে এল। শোনা গেল একটা আওয়াজ, যা আসলে দুটো, অথবা প্রতিধ্বনিময় অনন্ত। দুজনেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পড়ে থাকে শুধু মৃত্যু।
একটি লেখার সম্ভাবনা।
গ্রন্থসকল নীরবতার সন্তান।
নীরবতার সঙ্গে সময়ের সঙ্গমে জাত এই অনন্ত শব্দসমুদ্র।

(বানান অপরিবর্তিত)

ভ্রম সংশোধন

পুনর্মুদ্রিত 'কেন লিখি' পর্যায়ে গত সংখ্যায় অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখায় প্রথম ১৪ লাইনে একটি ভুল ছিল। অংশটি এইরকম পড়তে হবে:

কেন লিখি, না কেন লেখা? জীবনের একটা বড় সময় জুড়ে লিখতে লিখতে যে দেশে যে কালে যে ভাষায় কেউ লেখেন, সেই দেশের দুরারোগ্য দুঃখের ক্রমবর্ধমান আঁধারের দিকে, ভাষার যথেচ্ছ ভ্রষ্টতার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁকে হয়তো কখনও ভাবলেও ভাবতে হতে পারে— কেন লেখা!

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা
গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে
জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়

সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সংগীত ও পরিচালনা: **দীপক চৌধুরী**
অভিনয়: **সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে**
ভাষ্যপাঠ: **অনসূয়া মজুমদার**
গান: **স্বপন বসু ও আরও অনেকে**

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি

Buy Online ▸ www.swarnakshar.in

তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী

শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী

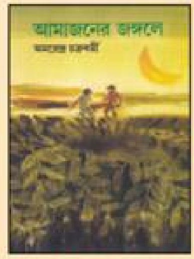

আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

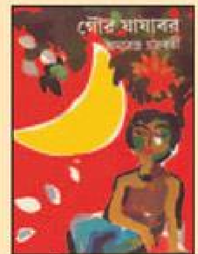

গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার

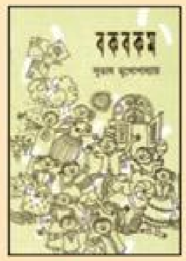

বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সেরাভ্রমণকাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

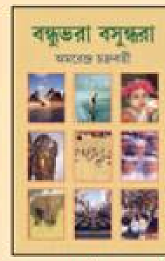

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

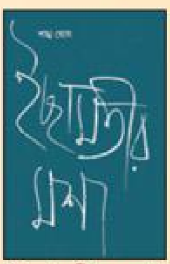
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

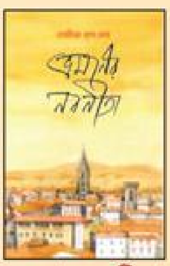
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

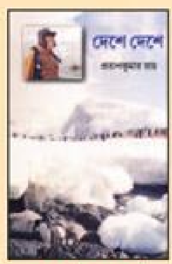

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

Read / Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in

ভ্রমণ

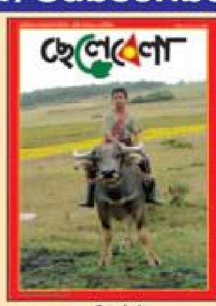

ছেলেবেলা

To be launched shortly

পেশাপ্রবেশ

কর্মক্ষেত্র

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com

আরও অনেক
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

KALER KASHTIPATHAR ◻ Vol. 1 No. 11 ◻ 1 March 2013 ◻ Rs. 30 Title Code: WBBEN 14529/25/1/2012-TC ◻ Declaration No. 185 dt. 05/09/12

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd.
Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd.,
Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com

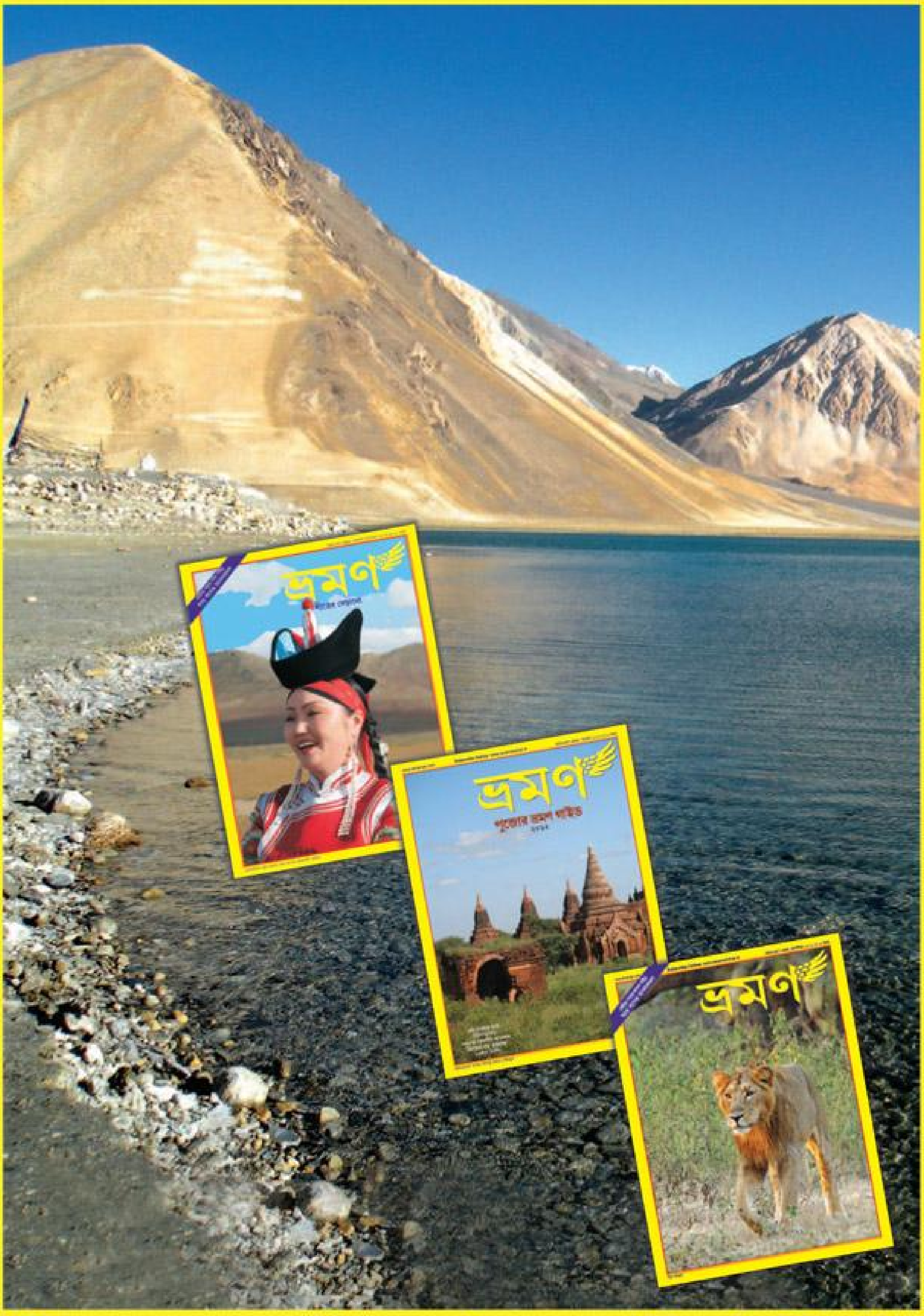

The most read travel magazine in India*

**Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q3*